নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মতো
একদিন এসেছিলে,
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত।

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই—

শেষের খুব কাছে
কলিকাল
জালবন্দী
গল্পসমগ্র
বুনো হাঁসের পালক
কলকাতা
অনুরাগ
জীবন যৌবন
গর্ভধারিণী
উত্তরাধিকার
লক্ষ্মীর পাঁচালী
তিনসঙ্গী
ভিক্টোরিয়ার বাগান

এখনও
সময়
আছে

এই সমুদ্রের গায়ে আমি বেশ কয়েকমাস ধরে রয়েছি। আমার জানলা দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ যেন হাত বাড়ালেই ধরা যায়। এটা অবশ্য কথার কথা। দরজার বাইরে ব্যালকনিতে বসলে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত শুধুই সমুদ্র। উড়িষ্যার এদিকটা সমুদ্র তেমন রাগী নয়। ছোট ছোট ঢেউ খুব শান্তভঙ্গীতে বালিতে মুখ নামিয়ে ফিরে যায়।

আমার বাড়িটা টিলার ওপরে। দুটো বেডরুম, একটা ড্রইং, কিচেন, ডাইনিং স্পেস আর দুটো টয়লেট। ছোট্ট জেনারেটার আছে হাতের কাছে। সরকারি আলো অবশ্য এখানে কলকাতার মত হুটহাট চলে যায় না। জমিটা কিনেছিলাম বছর চারেক আগে। আমার এক প্রকাশক এই জায়গাটার কথা একদিন বলছিলেন। উৎসাহিত হয়ে দেখে গিয়েছিলাম। মাত্র দেড় হাজার টাকা কাঠায় দশ কাঠা কিনে ফেলেছিলাম। বালেশ্বরে গিয়ে রেজেস্ট্রি করতে হয়েছিল।

আমি মানুষটা চিরদিনই অলস প্রকৃতির। নিজের উদ্যোগে বাড়ি বানানো কখনই সম্ভব হত না। ঝোঁকের মাথায় জমিটা কিনে ফেলে রেখেছিলাম। এ নিয়ে কিছু কথা শুনতেও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যখন এখানে বাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তখন একজন প্রকাশক এগিয়ে এসেছিলেন। তিনিই দৌড়-ঝাঁপ করে এই বাড়িটা তৈরী করে দিয়েছেন। বাড়িটা টিলার ওপরে বলেই আগামী পঞ্চাশ বছরে সমুদ্রের গ্রাস থেকে বেঁচে থাকবে। পঞ্চাশ বছর তো আমিও বাঁচবো না। ভদ্রলোককে এই বাড়ি তৈরী করে দেবার জন্যে একটা কুড়ি ফর্মার উপন্যাস ছাপতে দিতে হয়েছিল। কথা ছিল ওঁর খরচ করা টাকা বই থেকে আমার প্রাপ্যর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা হবে। ক্রমশ আমি বাসযোগ্য করে নিয়েছি নতুন বাড়িটিকে। ফ্রিজ, স্টিরিও, টিভি এনেছি।

যে মেয়েটি আমার সংসারের কাজ করে দেয় তার নাম ফাল্গুনী। ওকে যোগাড় করে দিয়েছেন উড়িষ্যা ট্যুরিজমের শরৎ রথ। এখানে ঘরবাড়ি বলতে আমারটা ছাড়া ওই ট্যুরিজমের বাংলো। এই বিস্তৃত সমুদ্রতীরে আর কোন পাকা বাড়ি নেই। আধ-মাইল পেছনে জেলেদের একটা বস্তি আছে। তার গায়ে গ্রাম। গ্রামের মানুষেরা সমুদ্রের দিকে বড় একটা আসে না। একটা পিচের রাস্তা চলে গিয়েছে বাংলোর সামনে দিয়ে। সারাদিনে আপাতত গোটা চারেক বাস ওই রাস্তায় যাওয়া আসা করে। ওরা আসে বালেশ্বর থেকে। দোকান বলতে একটা মুদি কাম অল পারপাস দোকান আছে ট্যুরিস্ট বাংলোর পাশে। তার লাগোয়া বাঁশের বেঞ্চি মাটিতে পুঁতে চায়ের দোকানও হয়েছে সম্প্রতি। বিশেষ কিছুর দরকার হলে মুদিওয়ালা বালেশ্বর থেকে আনিয়ে দেয়। গ্রামের দিকে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। তরিতরকারি শহরের মত না হলেও পাওয়া যায়।

এই অপূর্ব নির্জন সমুদ্রসৈকতে শুধু হাওয়া আর জলের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। বাতাস পরিষ্কার। নিঃশ্বাস জোরে নিলে বুক যেন নির্মল হয়ে যায়।

শুধু কথা বলতে গেলে আমাকে ট্যুরিস্ট বাংলোর শরৎবাবুর কাছে যেতে হয়। ভদ্রলোক খুব শান্ত। মাঝে মাঝে দু'তিনজন ট্যুরিস্ট বাস থেকে নামলে যেন দিশেহারা হয়ে যান। কিভাবে তাঁদের যত্ন করলে সরকারের সুনাম বাড়বে তাই তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা।

এইরকম একটা সমুদ্রের তীরে আমি এখন একলা আছি। আমার সঙ্গে বই বলতে গীতবিতান, দুটো অভিধান। প্রচুর ক্যাসেট রয়েছে। দিনভর সুর বাজে আমার ঘরে। আগে হিন্দী গান শুনতাম না, এখানে এসে জানলাম কিশোরকুমার চমৎকার দুঃখের গান গাইতে পারতেন।

কলকাতায় থাকতে আমি কিছুতেই ভোরবেলায় উঠতে পারতাম না। আমার ডাক্তার নিরূপ মিত্র পরামর্শ দিত মর্নিং ওয়াক করার। সাড়ে সাতটার পর সেটা করতে লজ্জা লাগত। এখানে আমার ঘুম ভাঙ্গে চারটের কিছু পরে। তখনও অন্ধকার লেগে থাকে পৃথিবীর গায়ে। স্টোভ জ্বালিয়ে জল বসিয়ে দিয়ে টয়লেটে যাই। ফিরে এসে অল্প গরম জলে মধু আর পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খেয়ে নিই। তারপর বাইরের দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। পা বাড়ালেই সমুদ্র। তার ধার দিয়ে ভেজা বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই অনেকটা দূর। খালি পায়ে ভেজা বালি অদ্ভুত আরাম দেয়। রাতের সমুদ্র যেসব ঝিনুক উগরে দিয়েছে তাদের সামলে, লাল কাঁকড়াদের সংসার বাঁচিয়ে হাঁটতে দারুণ লাগে। জেলেবস্তির সামনে পৌঁছাতেই সূর্য উঠে পড়ে টুপ করে। আহা, পৃথিবীটা এই মুহূর্তে স্বর্গের চেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে। খানিক বাদে জেলেরা নৌকো নিয়ে ফিরে আসে মাছ ধ'রে। অনেক অজানা মাছের স্তূপ দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। বড় চিংড়ি অথবা ভেটকি পেলে কিনে নিই জেলেদের কাছ থেকে। ফেরার সময় রোদ চড়ে যায়। ঘাম হয়। ফিরে দেখি বারান্দায় ফাল্গুনী বসে আছে চুপচাপ। ওর হাতে মাছ দিয়ে দরজা খুলে চলে যাই স্নানের ঘরে। ফিরে এসে স্টিরিওতে সুচিত্রা মিত্র চাপিয়ে দিই। মনটা কী ভাল হয়ে যায়। ফাল্গুনী চা নিয়ে আসে। চা আর বিস্কুট। আমি খবরের কাগজ পড়ি না। এখানে কাগজ আসে বাসি হয়ে। তাছাড়া কলকাতা কেন, পৃথিবীর কোন খবর রাখতে একটুও ভাল লাগে না আমার। টিভিতেও খবর শুনি না কখনও।

চা শেষ করে গান শুনতে শুনতে আমি লিখতে বসি। ফাল্গুনী জানে তাকে কি কি কাজ করতে হবে। আগাম টাকা দেওয়া থাকে ওর কাছে। ফুরিয়ে গেলে চেয়ে নেয়। হিসেব দেবার বালাই নেই। আমি জানি চুরি করার বিন্দুমাত্র বাসনা ওর নেই।

কলকাতা থেকে এতদূরে চলে এলেও আমাকে কিছু দায় মেটাতেই হয়। শুধু জীবন-ধারণের জন্যেই নয়, মানুষ হিসেবে নিজের মনের দায় তো কম নয়। আমি চাই বা না চাই, কলকাতায় থাকতে আমাকে বছরে গোটা পাঁচেক উপন্যাস লিখতে হত। সেটা যেন নিয়মের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। লিখতে ইচ্ছে না করলেও লিখতে হবেই। আমি নিজের চারপাশে একটার পর একটা হাঁ-মুখ তৈরী করেছিলাম। সেই

মুখগুলো বন্ধ করার জন্যে না লিখে উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত সব ছেড়েছুড়ে যখন এখানে চলে এলাম তখন মনে হল নিষ্কৃতি পেলাম। এখানে কেউ লেখার জন্যে তাগাদা দেবে না; নিত্য ভোরবেলায় লেখার টেবিলে উপুড় হয়ে বসতে হবে না।

প্রথম কদিন বেশ ছিলাম। সমুদ্র দেখে দেখে আর গান শুনে বেশ চলে যাচ্ছিল দিনগুলো। ফাল্গুনী রান্না করে চলনসই। কোন আধুনিক কায়দা নেই, সাদাসাপটা। সেগুলো খেতে মন্দ লাগে না।

এখন সকাল। চা খেয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ মনে হল জলের ভেতর কিছু নড়ছে। তীর থেকে অন্তত পঞ্চাশ ফুট ভেতরে একটা লম্বা কালচে ছায়াকে যেন নড়তে দেখলাম। এখন আকাশে মেঘও নেই যে তার ছায়া পড়বে জলে। সমুদ্র নিয়ে কার না কৌতূহল থাকে, আমারও আছে। বই-পত্তরে অবশ্য প্রায়ই জানা যায় যে নাবিকরা বলছেন সমুদ্র নাকি তার রহস্যময় চরিত্র হারিয়ে ফেলছে। দিনের পর দিন জলে ভেসেও কোন নাবিক আর উত্তেজিত হবার মত কোন উপলক্ষ্য খুঁজে পাচ্ছেন না। পড়ে মন খারাপ হত। এই কদিন এখানে থেকে কিছু নতুন ধরনের মাছ আর ঝিনুক ছাড়া আমি অবাক হবার মত কিছুই দেখতে পাইনি। এখন জলের মধ্যে ছায়াটাকে নড়তে দেখে বেশ উত্তেজিত অবস্থায় বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। বোঝাই যাচ্ছে ওটা একটা প্রাণী, ঢেউ-এর সঙ্গে দুলছে, আবার শরীর বেঁকিয়ে জলের নিচে নেমে গেল। খানিক বাদেই কয়েক হাত দূরে আবার উঠে এল ওটা। কিন্তু কিছুতেই জলের ওপর মাথা বা শরীর তুলছে না যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাব। লম্বায় অন্তত ফুট দশেক হবে। অবশ্য এটা আমার ভুলও হতে পারে। জলের নিচে থাকায় সঠিক বুঝতে পারছি না। প্রাণীটা এগিয়েও আসছে না যে ভাল করে বুঝব। ওটা একটা তিমির বাচ্চা হতে পারে অথবা একটা শার্ক। যদিও এসব প্রাণীর কথা এদিকের সমুদ্রে কেউ কখনও শোনেনি। তবে শোনেনি বলে যে ওরা জল বেয়ে চলে আসতে পারে না তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই। সারাদিন সমুদ্র এখানে দোলে। তা দেখতে খারাপ না লাগলেও ওই প্রাণীটির ছায়া আমাকে বেশ উত্তেজিত করছিল আজ।

চারপাশে কোন মানুষ নেই, সামনে সমুদ্র আর সমুদ্র। ওই জলজন্তুটি যেন সেটা বুঝতে পেরেই আমাকে দেখিয়ে জলের নিচে খেলা করে যাচ্ছে। আমি নেমে এলাম জলের কাছে। এর আগে আমি হাঁটতে হাঁটতে প্রায় বুক-জল পর্যন্ত অনেকবার গিয়েছি। ঢেউগুলো যখন গড়িয়ে গড়িয়ে আসে তখন একটা ডুব দিয়ে নিলে কোন অসুবিধে হয় না। সেই মুহূর্তে মাথা তুললে পৃথিবীটা অন্যরকম দেখায়। চারপাশে শুধু জল আর জল আর আমি একা, একেবারে একা।

আজ ওই ছায়াটার জন্যে আমার জলে নামতে সাহস হল না। ছায়াটা যদি কোন শার্কের হয়, তাহলে জলে নামা মানে আত্মহত্যা করা। 'জস' নামক ছবিটি আমি দেখেছি। মার্কিন সরকারের ব্যবস্থাপনায় ওদেশে গিয়ে ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে সেই

শার্কের রূপটিও দেখে এসেছি। মুশকিল হল, জলের কাছাকাছি এসে আমি আর ওই ছায়াটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আশেপাশে অনেক খুঁজলাম, সমুদ্র অন্যদিনের মত স্বাভাবিক। অতএব আবার আমার বাড়ির বারান্দায় উঠে এলাম। ছায়াটা যেখানে ছিল সেখানে নেই। তাকিয়ে তাকিয়ে যখন আমার চোখ টাটিয়ে যাচ্ছে তখন ডানদিকের পঞ্চাশ গজ দূরে একটা জায়গায় জলে আলোড়ন হল এবং তারপরেই ছায়াটাকে দেখতে পেলাম সেখানে। অন্তত হাত-আটেক লম্বা বলে মনে হচ্ছিল। জলের নিচে জন্তুটা রয়েছে আড়াআড়ি। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হচ্ছিল ও আমাকে লক্ষ্য করছে। একটা সময় ও বিরক্ত হয়ে পাক খেয়ে বোধহয় মাঝসমুদ্রে চলে গেল। আমার খারাপ লাগল ওইভাবে চলে যাওয়াটা।

ফাল্গুনী এল চা নিয়ে। এর মধ্যে বেলা গড়িয়েছে। এই চা খেয়ে আমি বাথরুমে ঢুকব। সমুদ্র থেকে হু-হু করে হাওয়া ছুটে আসছে। চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হল, এমন সুখের সময় আমার জীবনে কখনও আসেনি। দুপাশে যতদূর নজর যায় ততদূর ধরে শুধু সমুদ্রের ঢেউ বালির ওপর গড়িয়ে আসছে। সমস্যাবিহীন এমন শান্ত জীবন আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিল—দুবছর আগেও আমি ভাবতে পারতাম না।

ফাল্গুনী এল কাপ ফিরিয়ে নিতে। তাকে আমি ছায়াটার কথা বললাম। দেখলাম সে খুব অবাক হয়ে জলের দিকে তাকাচ্ছে। শান্ত সমুদ্রে এখন কোথাও সেই প্রাণীটির ছায়া নেই। দৃষ্টি বুলিয়ে কিছুই দেখতে না পেয়ে ফাল্গুনী এমন চোখে আমার দিকে তাকাল যে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমার সুস্থতা সম্পর্কে সে সন্দেহ করছে।

বললাম, 'সারা সকাল, একটু আগে পর্যন্ত ওটা ওখানে ছিল।'

মেয়েটা হাসল। হেসে ভেতরে চলে গেল।

ফাল্গুনী বেশী কথা বলে না। ওকে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন শরৎবাবু। বেচারার স্বামী শহরে চলে যাওয়ার পর সেখানকার মোহে পড়ে আর ফেরেনি। লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছে যে ফাল্গুনীর মত গ্রাম্য মেয়েকে আর স্ত্রী বলে ভাবতে পারছে না। সে ওকে ত্যাগ করল। কোন আইন-আদালত নয়, পুরুষটি যখন ত্যাগ করছে তখন বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ফাল্গুনী চলে এল বাপের বাড়িতে। যেভাবে অবাঞ্ছিতরা সংসারে থাকে সেভাবেই ছিল। শরৎবাবুর প্রস্তাব শুনে ওর দাদা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গিয়েছিল। আমার রান্না করে দেবে, ঘর পরিষ্কার করবে আর বিকেল শেষ হলেই গ্রামে ফিরে যাবে। এই কালো শীর্ণ মেয়েটিকে ঈশ্বর কোন সম্পদ প্রাণ-খুলে দিতে পারেননি। তার মুখেও লাবণ্য নেই। কিন্তু চোখ দুটো আর হাসি ঈশ্বরের চেয়েও পবিত্র। কিন্তু সেটুকুতে খুশী থাকার কোন কারণ ওর স্বামী খুঁজে পায়নি। মেয়েটা যখন কাজে এল তখন আমি একটু বিপাকে পড়েছিলাম। ভাষা নিয়ে তো সামান্য সমস্যা ছিলই, তার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল রান্নার ধরন। কলকাতায় আমি যে ধরনের রান্না খেতে অভ্যস্ত তার কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম, ওরা যে রান্না জানে তাই মুখে দিতে প্রাণান্তকর অবস্থা হল। আমি কখনও রান্নাঘরে ঢুকিনি

আগের জীবনে, ও ব্যাপারে জ্ঞান দেবার ক্ষমতাও নেই। শরৎবাবু বলেছিলেন ট্যুরিস্ট লজ থেকে রান্না করা ভাত তরকারি পাঠিয়ে দেবেন রোজ, কিন্তু সেটাও আমার পছন্দ হয়নি। আমি আমার পছন্দের কথা রোজ বলতে লাগলাম। ভাত, আলুসেদ্ধ, মাছভাজা, ডাল আর মাছের ঝোল। বলতে বলতে ফাল্গুনীকেও বুঝিয়ে দিতে পারলাম একসময়। চা বা কফি বানানো শিখতে ওর একটুও অসুবিধে হল না। গ্যাস জ্বালানো নেভানো একদিনেই রপ্ত করতে পারল।

এখন ওর সাহায্যে আমার জীবনযাপন ভালই চলছে। গত রবিবার শরৎবাবু এসেছিলেন। ওর হাতের কফি খেয়ে বলে গেলেন, 'আপনি তো মানুষ করে ফেললেন মেয়েটাকে।'

শুনে ফাল্গুনী বিড় বিড় করেছিল, 'আমি কি মানুষ ছিলাম না!'

শরৎবাবু খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলেন।

মেয়েদের যেমন হয়, আমি বুঝি ফাল্গুনীরও আমার সম্পর্কে কৌতূহল আছে। এই কৌতূহল ওর গ্রামের মানুষদেরও। একটা বাঙালী পঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ সমুদ্রের ধারে এমন একটা বাড়ি তৈরী করে কেন একা থাকবে এটা ওরা বুঝতে পারে না। লোকটা যে চোর-ডাকাত নয় তার প্রমাণ ওরা পেয়েছে। বালাসোরের পুলিশের বড়কর্তা একদিন এদিকে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা করে চা-বিস্কুট খেয়ে গেছেন। অপরাধী হলে নিশ্চয়ই এমন কাজ করতেন না। ফাল্গুনী কম কথা বলে বলেই ইচ্ছে থাকলেও জানতে পারে না। আর গায়ে পড়ে নিজের কথা বলার অভ্যেস আমার নেই। এখন আমি বেশ আছি।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সমুদ্র আমাকে আবার টানতে লাগল। বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসলাম। রোদ জমেছে জলে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমি আবার উত্তেজিত হলাম। ছায়াটা দেখতে পাচ্ছি। আচমকা যেন এসে পড়েছে প্রাণীটা। এখন মনে হচ্ছে হাত-দশেক লম্বা। চোখের ভুলও হতে পারে। জলের তলায় থাকায় দৈর্ঘ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রাণীটি রয়েছে স্থির হয়ে। ওর ওপর দিয়ে নরম ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে এদিকে। এত বড় সমুদ্রের কোথাও না গিয়ে ও কেন এখানে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে আমি বুঝতে পারছিলাম না। কথাটা মনে আসতেই হাসি পেল। এত বড় পৃথিবীর কোথাও না গিয়ে আমি কেন এই সমুদ্রের ধারে থাকতে এলাম তারই বা ব্যাখ্যা কি?

সারাটা দুপুর আমি ছায়াটাকে লক্ষ্য করে গেলাম। মাঝে একবার ও কোথাও চলে গিয়েছিল, কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাধ্য ছাত্রের মত ফিরে এসেছে নিজের জায়গায়। আমি সমস্ত দুপুর এভাবে বাইরে বসে কখনই কাটাই না বলে ফাল্গুনী হয়তো অবাক হয়েছিল। বিকেলের চা নিয়ে বাইরে এসে সে যেভাবে তাকাল তাতে প্রশ্নটা ছিল। কাপ হাতে নিয়ে বললাম, 'ওই দ্যাখো, ওইদিকে, জলের মধ্যে ছায়াটা নড়ছে।'

ফাল্গুনী তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেল না সে। আমি তাকে দেখাবার জন্যে

মরীয়া হয়ে উঠলাম। আমাদের চেঁচামেচির কারণেই হয়তো প্রাণীটি বিরক্ত হয়ে জলে হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু ও আর ফিরে এল না। ইতিমধ্যে সূর্যদেব পশ্চিমে ঢলে পড়েছেন। সমুদ্রে ছায়া নামছে। সেই ছায়া আর প্রাণীটির ছায়া আলাদা করে চেনা সম্ভব নয়। কাজ শেষ করে ফাল্গুনী চলে যেতে আমি দরজায় চাবি দিয়ে বালিতে পা দিলাম।

আমার পরণে এখন পাজামা পাঞ্জাবি আর পায়ে রবারের জুতো। জলের ধার দিয়ে ভেজা বালিতে পা ফেলে চলেছি। ফুরফুরে বাতাস বইছে। আঃ, কী আরাম। নানান রঙের ঝিনুক পড়ে আছে বালির ওপর। প্রথম প্রথম খুব কুড়োতাম, এখন আর আগ্রহ নেই। এই বালি, ঝিনুক, সমুদ্র—এ সবই তো আমার। আমি ছাড়া আর কোন মানুষ নেই এখানে।

ট্যুরিস্ট লজটা উড়িষ্যা সরকারের। যে কর্তার ইচ্ছায় এখানে তৈরী হয়েছিল তাঁর মনমেজাজ নিশ্চয়ই আলাদা ছিল। এমন একটা সুন্দর নির্জন জায়গা বেছে নেওয়া কম কথা নয়। যদিও ঠিক প্রচারের অভাবে এখানে মানুষ তেমন আসে না। ট্যুরিস্ট লজটা একতলা। সমুদ্র থেকে বেশ কিছুটা ওপরে। তার গায়ে কয়েকটা দিশি দোকান। শরৎবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন সেইসব দোকানের সামনে। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন, 'শরীর ভাল আছে?'

'এখানে আসার পরে তো আমার শরীরের কোন কমপ্লেন নেই।'

'এখানকার আবহাওয়া সত্যি ভাল। তবে—।'

'বলে ফেলুন।'

'আপনি যেরকম একা আছেন তা সচরাচর কেউ থাকে না।'

'আমার তো একা থাকতে খুব ভাল লাগছে। তাছাড়া ঠিক একাও তো নেই। ফাল্গুনী এসে ওর মত কাজ করে গেলেও একজন সঙ্গী তো হয়ে যায়। তার ওপর আজ থেকে আর একজন সঙ্গী হয়েছে।'

শরৎবাবু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তাঁকে আমি প্রাণীটির কথা বললাম। সব শুনে ভদ্রলোক হতভম্ব। বললেন, 'এরকম তো কখনও শুনিনি। এই সমুদ্রে অতবড় মাছের কথা কেউ কখনও বলেনি। আপনি ঠিক দেখেছেন তো?'

'এক-আধবার দেখলে মনে করতাম ভুল দেখেছি, কিন্তু আজ সারাদিন ধরে ওকে দেখলাম। মাঝে মাঝে সম্ভবত খাওয়াদাওয়া করতে গভীর জলে ঘুরে এসেছে।'

'যতক্ষণ দেখেছেন একই জায়গায় স্থির হয়ে থেকেছে?'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস ও আমাকে লক্ষ্য করছিল।'

শরৎবাবু অবাক হয়ে তাকালেন, 'ওটাকে কি জলের ওপর উঠে আসতে দেখেছেন?'

মাথা নাড়লাম, 'না। একবারের জন্যেও মাথা তোলেনি।'

'তাহলে জলের ভেতর থেকে পাড়ে দাঁড়ানো আপনাকে কি ও দেখতে পাবে?'

'সেটা আমি বলতে পারব না। তবে আমার তো সেইরকম মনে হচ্ছিল।'

আমরা এই নিয়ে আর একটু সময় কথা বললাম। দোকানদারদের একজন গায়ে পড়ে আলোচনায় যোগ দিল। লোকটা আগে মাছ ধরতে সমুদ্রে যেত। এখন বয়স হয়ে যাওয়ায় দোকানে বসে। সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলছিল। এই সমুদ্র নাকি বড় মাছেদের খুব অপছন্দ। তিন-চার হাতের বেশী মাছ এখানে কখনও ধরা পড়েনি অথবা কেউ দ্যাখেনি। সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বড় মাছের পাল্লায় কোন জেলে কখনও পড়েওনি। আমার মুখে ছায়ার কথা শুনে ওদের অভিব্যক্তি ওরা চেপে রাখল না। ওরা আমাকে অবিশ্বাস করছে।

আমরা যখন কথা বলছি তখন ট্যুরিস্ট লজ থেকে এক সুবেশ ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ম্যানেজারবাবু, এখানে সোডা পাওয়া যাবে?'

'না স্যার। তবে খবর দিলে বালেশ্বর থেকে আনানো যায়।'

'সেটা তো আজ সম্ভব নয়, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার। আজ বাস চলে গিয়েছে।'

ভদ্রলোককে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। শরৎবাবু আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। সম্ভবত তিনি নিষ্কৃতি পেতে চাইছিলেন। ভদ্রলোক উড়িয্যা সরকারের পর্যটন দপ্তরের একজন বড়কর্তা। সমুদ্র এবং মন্দির উড়িয্যার সম্পদ—যার টানে ট্যুরিস্টরা এই রাজ্যে বারংবার আসেন। ইনি আমাদের এই জায়গায় এসেছেন, কারণ এখানকার আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যে উড়িয্যা সরকারের অনেক পরিকল্পনা আছে। উনি জিপ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ওঁর সহযোগী সেই জিপ নিয়ে কাছাকাছি চলে গিয়েছেন বলে সোডার ব্যাপারে ওঁকে এমন হতাশ হতে হচ্ছে। ভদ্রলোকের নাম প্রফুল্ল রায়।

প্রফুল্লবাবু আমাকে একজন ট্যুরিস্ট বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু শরৎবাবু গায়ে পড়ে পরিচয় দিতেই ভদ্রলোকের মুখের চেহারা পাল্টালো। প্রফুল্লবাবু বললেন, 'সেকি? আপনার নাম আমি শুনেছি। আমাদের ভাষায় আপনার কিছু লেখার অনুবাদ হয়েছে। আপনার মত নামী লেখক এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পড়ে আছেন কেন?'

বললাম, 'মাঝে মাঝে কেউ কেউ তো ব্যতিক্রম হন।'

'উহুঁ। আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন।'

সচরাচর আমি কাউকে নিজের পরিচয় দিই না। এতে সম্পর্ক সহজ থাকে। আমার যে পাবলিশার্স আস্তানাটি তৈরী করে দিয়েছেন তিনিই শরৎবাবুকে আমার সম্পর্কে বিশদ বলে গিয়েছেন। তারপর থেকেই শরৎবাবু আমার সম্পর্কে খুবই শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু তিনি তাঁর অফিসারকে সেসব কথা বলে আমাকে বিপাকে ফেললেন। প্রফুল্লবাবু আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে খোঁচাতে লাগলেন সত্য জানবার জন্যে। দূর থেকে আমার বাড়ি সন্ধ্যের আধা-অন্ধকারে দেখে ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত। বললেন, 'ওই বাড়িতে আপনি কি একা থাকেন? আশ্চর্য ব্যাপার!'

বললাম, 'অবাক হচ্ছেন কেন?'

'অবাক হব না? কাছাকাছি কোন মানুষ নেই, আপনার ভয় করে না?'

'কিসের ভয়?'

'একা থাকার ভয় হয় না ? চোর-ডাকাতের কথা ছেড়ে দিন, হঠাৎ শরীর খারাপ হল, আমি বলছি না তবু হার্ট গোলমাল করতে পারে, স্ট্রোক হতে পারে, তখন ? কোন হেল্পই তো এখানে পাবেন না ! তাও যদি ট্যুরিস্ট লজের পাশে বাড়ি করতেন তাহলে শরৎ খোঁজ খবর নিতে পারত। না, না, আপনি খুবই অবিবেচকের মত কাজ করেছেন।' প্রফুল্লবাবু সত্যি আমার হিতৈষী হয়ে উঠলেন।

বললাম, 'কেউ কেউ সেরকম করে।'

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রফুল্লবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো বিবাহিত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে ?'

এবার হেসে ফেললাম। ভদ্রলোকের কৌতূহল না মেটানো পর্যন্ত নিস্তার পাব না বুঝতে পারছি। ওঁকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। দরজা খুলে দুটো বেতের চেয়ার ব্যালকনিতে এনে বললাম, 'এখানে বসুন, সমুদ্র দেখতে ভাল লাগবে। কফি খাবেন ?'

'কফি ?' মাথা নাড়লেন প্রফুল্লবাবু, 'না মশাই, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

'আপনি কি সন্ধ্যে হলেই মদ্যপান করেন ?'

প্রফুল্ল সামান্য সঙ্কুচিত হলেন, 'না। ঠিক সন্ধ্যে থেকে নয়। তাছাড়া বিকেলে আমার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে।' মাথা ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বিউটিফুল ! কী চমৎকার বাতাস !'

'তাহলে এখানে বাড়ি করে আমি ভুল করিনি বলছেন ?'

'তা নয়। আপনি স্ত্রী-সংসার ছেড়ে এখানে একা বাস করছেন, এটাও ঠিক নয়।'

অনেককাল একা থাকলে মানুষ একটু খোঁচা পেলে নিজেকে বেশীক্ষণ আড়ালে রাখতে পারে না। প্রফুল্লবাবু উড়িষ্যা সরকারের বড়কর্তা। আমার সঙ্গে কোন সংযোগ নেই। ভবিষ্যতে উনি যদি এখানে আসেন তবেই দেখা হবে। আমার কথা শুনে উনি নিশ্চয়ই খবরের কাগজে বিবৃতি দিতে যাবেন না। তাছাড়া আমার সঙ্গে ওঁর কোনরকম স্বার্থের সম্পর্ক নেই যে শুনে দুঃখ পাবেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হুইস্কি খান ?'

তখন রাত নেমে গেছে। সমুদ্র অন্ধকারে। শুধু জলের আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রফুল্লবাবুর মুখ আমি ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। গলা শুনলাম, 'আপত্তি নেই।'

ভেতরে গিয়ে আলো জ্বাললাম। সেলার থেকে হুইস্কির বোতল বের করে দুটো গ্লাসে খানিকটা ঢেলে জলবরফ মিলিয়ে বাইরে এসে ওঁকে একটা গ্লাস দিলাম, 'আমি সোডা খাই না।'

মুখে এখন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে। আঃ, আরাম।

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'আপনার মনে আছে দেখছি। হ্যাঁ, বলুন।'

এক চুমুক গলায় চালান করে দিয়ে চুপচাপ আকাশের দিকে তাকালাম। প্রচুর

তারার ভিড় সেখানে। চট করে কলকাতার কথা মনে আসে। এত মানুষ! আর মানুষে মানুষে তীব্র সংঘর্ষ। কখনও চাপা আস্তিন গোটানো। স্বার্থে আঘাত লাগলেই বীভৎস দাঁত বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেসব নিয়েই তো আমি কলকাতায় দিব্যি ছিলাম।

'আমার লেখক হবার কথা ছিল না। আজকাল ছাত্রাবস্থায় মানুষের ভবিষ্যৎ স্থির করে দেওয়া হয়। কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবার লক্ষ্যে এগোয়। আমাদের সময় সেসব ভাবনা অভিভাবকদের ছিল না। বিয়ে-থা করেছিলাম সামান্য চাকরির ওপর নির্ভর করে। অত অল্প রোজগার করে কি করে তখন অমন ভাল থাকতাম, এখন আর ভেবে পাই না। লেখালেখি শুরু করি হঠাৎই। আর সেটা চালিয়ে যেতে দেখলাম আমি লেখক হয়ে গেছি। অর্থ আসতে লাগল, সেইসঙ্গে সম্মান। পুরস্কার-টুরস্কারও জুটে গেল। আমার তখন বিপুল চাহিদা। বছর পনেরো আগে যে প্রতিষ্ঠানের কাগজগুলোতে একটা ছোট গল্প ছাপাতে হিমসিম খেয়ে যেতাম তাদের প্রত্যেকটা পূজোসংখ্যায় আমাকে উপন্যাস লিখতে হচ্ছে। লিখলেই টাকা। বই বিক্রী হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে বই-এর জন্যে তাগাদা আসছে। একটা সময় এল যখন দেখলাম না লিখে উপায় নেই। আমি প্রফেসনাল লেখক হয়ে গেছি। বছরে দেড় লক্ষ টাকার ওপর আয়কর দিচ্ছি। মার্চ মাস থেকে পূজোর পাঁচটা উপন্যাস লিখতে বসতে হয়, অথচ কোন উপন্যাসের ভাবনাই মাথায় থাকে না। এ যে কি অসহ্য যন্ত্রণা তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। একজন লেখক কলকাতায় বসেই পূজোয় লিখব না বলে ঘোষণা করেছেন, আমার সেই মনের জোর নেই। কিছুদিন থেকেই মনের মধ্যে আর-একটা যে মন আছে সে বলছিল, অনেক লিখেছ এবার থামো। চাপের লেখা না লিখে ইচ্ছেমত কলম ধরো। আমার সম্পাদক এবং প্রকাশকদের মুখোমুখি হয়ে বসে সেই উপদেশ মান্য করতে পারতাম না। তাই কেবলই মনে হত কোথাও চলে যাই। হয় পাহাড়ে নয় সমুদ্রের ধারে। আমার এক প্রকাশক উড়িষ্যায় অন্যরকম ব্যবসাও করেন। আমার ইচ্ছার কথা জেনে তিনি চাঁদিপুরে বাড়ি তৈরী করে দেবেন বলেছিলেন। ওঁর কাছে ভাল অর্থ পাই আমি। কিন্তু চাঁদিপুরে তো কলকাতার মানুষের মিছিল লেগেই আছে। আমার পছন্দ হল না। আমি আরও নির্জন জায়গা চাইছিলাম। শেষমেষ এখানেই বাড়ি তৈরী হল। চলে এলাম। খুব ভাল আছি এখানে। ইচ্ছে হলে মাঝে-মধ্যে দুই এক পাতা লিখি। কেউ আমার ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলে না যে রোজ নিয়ম করে সাত-আট পাতা লিখতেই হবে।' আমি গ্লাসে চুমুক দিলাম।

প্রফুল্লবাবুর গ্লাস অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন সভ্য মানুষকে আমি খুব দ্রুত মদ খেতে দেখেছি। ব্যাপারটা আমার একদম ভাল লাগে না। মদ খেয়ে যারা মাতলামি করে তাদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বসার প্রবৃত্তি আমার হয় না।

আবার ওঁর গ্লাস ভরে দিলাম। আজকাল একা থাকলে দু-পেগের বেশী খাই না। কিন্তু সঙ্গী থাকলে এক পেগ। যিনি হোস্ট তাঁর সবসময় পরিমিত খাওয়া উচিত

যাতে অতিথিরা অসুস্থ হলে বিপদে না পড়তে হয়। এখন অন্ধকার চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউ-এ ফসফরাস জ্বলতে দেখছি। প্রফুল্লবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি নেবেন না?'

'একটু বাদে।'

'এখানে হুইস্কি পান কি করে?'

'আনিয়ে নিই। এখানে সমুদ্র যা দেয় তাতে তো আমরা সন্তুষ্ট নই, তাই এসব আনাতে হয়।' হেসেই বললাম।

'সমুদ্র মদ দেবে কি করে?'

'দিয়েছিল। মন্থনের সময় লক্ষ্মীর সঙ্গে মদিরাও উঠেছিল।'

কথা শুনে প্রফুল্লবাবু হাসলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্ত্রীর আপত্তি ছিল না এভাবে এখানে একা চলে আসতে?'

'এখনও সেটা ভাল বুঝতে পারি না।'

প্রফুল্লবাবু সম্ভবত গল্পের গন্ধ পেয়েই বললেন, 'তার মানে?'

'আমার বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। ভালই ছিলাম। যেভাবে বাঙালি নবদম্পতি ভাল থাকে সেইভাবে চলে যাচ্ছিল। ছেলেমেয়ে এল। তাদের সঙ্গে যেমনটি সম্পর্ক হওয়া উচিত তাই ছিল। লেখালেখি শুরু করার পর আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নাম এবং অর্থ এল। নামটা নিজের কাছে রেখে অর্থগুলো স্ত্রীকে দিয়ে যেতে লাগলাম। এবং ক্রমশ আমি আবিষ্কার করলাম, একই বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও আমি একটা আলাদা দ্বীপ তৈরী করে ফেলেছি। আমাদের মধ্যে ঝগড়া অথবা প্রকাশ্য মনান্তর হচ্ছে না, অথচ কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারছি না। শুধু স্ত্রী নয়, ছেলেমেয়ের সঙ্গেও ক্রমশ আমার দূরত্ব বাড়তে লাগল। প্রকৃতির নিয়মে আমার সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায় ওরা মায়ের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। পঁচিশ বছর একসঙ্গে বাস করার পর মনের গঠন আমাদের এমন হয়ে গেল যে আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম কেউ কারও সম্পর্কে কোন আগ্রহ বোধ করছি না। আমার স্ত্রী হয়তো সুন্দরী নয় কিন্তু তিনি তাঁর শরীরটিকে স্বাভাবিক রেখেছেন। চাকরি করেন বলেই তাঁর একটা বাইরের জগৎ আছে। সেইসঙ্গে জেদ লালন করেন। অযথা এ্যাডজাস্ট করা ওঁর ধাতে নেই। দীর্ঘ কাল আমি আমার মত ওই বাড়িতে ছিলাম। ছেলেমেয়ের কোন ব্যাপার আমার পছন্দ না হলে আপত্তি জানাতে গিয়ে দেখতাম ওদের যুক্তির কাছে আমি হেরে যাচ্ছি।' কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম প্রফুল্লবাবুর গ্লাস শেষ হয়ে গেছে। ভদ্রলোককে কি আর দেওয়া উচিত?

'আর একটা দিই?' হাত বাড়ালাম।

ভদ্রলোক আপত্তি না করে গ্লাসটা ফেরৎ দিলেন। তিন পেগ মদ খেলে কিছুই হয় না মানুষের। অনেককে সাত-আট পেগও হজম করতে দেখেছি। কিন্তু অত খাওয়ার দরকার কি? আমার মেয়ে অবশ্য বলে, আমি যত আধুনিক ঠিক ততটাই কনজারভেটিভ। মদ খেতে আপত্তি নেই, কিন্তু পরিমিত খেতে হবে। যেন জলে

নামব অথচ বেণী ভেজাবো না। এ কি চলে সবসময়? আমার মেয়েকে বলেছিলাম, কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় অথবা রেস্টুরেন্টে গিয়ে আড্ডা মেরো না, কথা বলতে হলে বাড়িতে নিয়ে এসে কথা বলবে। এটা নাকি আমার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ। আবার বাড়ি ঢুকে যখন দেখি মেয়ের বন্ধুদের সিগারেটের ধোঁয়ায় বাইরের ঘরে নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না তখন খেপে যাই আচমকা। ওই ছেলেদের এত কথা কি থাকে যে আমার মেয়েকে এসে বলতে হবে? এখানে নাকি আমি আচমকা কনজারভেটিভ হয়ে যাই।

প্রফুল্লবাবু নতুন পেগে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আপনি যা বলছেন বেশীর ভাগ পুরুষের জীবনে একই রকম ঘটে থাকে। এই ধরুন আমি, কুড়ি বছর বিয়ে করেছি, বড় ছেলের বয়স আঠারো, সে আর তার মা একদিকে আমি আর একদিকে। যত বয়স বাড়ছিল তত দুজনের মতামত দুইরকম হয়ে যাচ্ছিল। উনি আলাদা ঘরে শোন, আমি আলাদা ঘরে। কিন্তু বাইরের লোক বাড়িতে এলে আমাদের দেখে কখনও ব্যাপারটা টের পাবে না। ডিভোর্স বা সেপারেশন দূরের কথা, আমরা কাউকে জানতেও দিই না কি অবস্থায় বাস করছি।'

'আপনারা হয়তো ঠিকই করছেন কিন্তু আমি পারিনি। শেষের দিকে কেবলই মনে হচ্ছিল, নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছি। যে মুহূর্ত থেকে বুঝে গেলাম ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর জীবনে আমার কোন ভূমিকা নেই সেই মুহূর্ত থেকে ওইভাবে সবার মধ্যে একা না থেকে সত্যি সত্যি একা থাকার বাসনা তীব্রতর হল।'

'কোন মহিলার কারণ— ?'

'না মশাই। কোন মহিলা এর কারণ হননি। আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট মহিলারা এমন প্রেম করতে স্বচ্ছন্দে পারেন যাতে অন্যের ঘর না ভাঙ্গে আবার নিজেরটাও ঠিক থাকে। যারা নিতান্তই অল্পবয়সী, লেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লেখক সম্পর্কে আগ্রহী হয় তারা নিছকই ভালবাসে, প্রেমে পড়ে না। এই ভালবাসা আর প্রেমের সংজ্ঞা যে এখন আলাদা তা শুধু ওরাই বুঝতে পারে। যাই হোক, কেউ সংসার ছেড়ে আলাদা বাস করলেই আমরা তৃতীয় কোন মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কারণ কল্পনা করলে জিভ মশলার স্বাদ পায়। আমার ক্ষেত্রে সেরকম কিছুই হয়নি। আগেকার দিনে লোকে সংসার ভাসিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেত। আমি সন্ন্যাসী হইনি। আমি সবাইকে বলেই এখানে এসেছি। বই বাবদ যে টাকা প্রকাশকরা ওদের দেবেন তাতে কিছু না করেও তিনজনের জীবন ভালভাবে চলে যাবে। অর্থাৎ ভাসিয়ে আসিনি। অনেক করলাম, একটাই তো জীবন, এখন আমি একটু একা থাকতে চাই। সবার মধ্যে একা হয়ে না থেকে সত্যিকারের একা থাকলে নিজেকে ঢের বেশী ভাল বোঝা যায়। এই আর কি!'

প্রফুল্লবাবু নীরবে গ্লাসটি শেষ করলেন, 'এখানে বসে আপনি ওই মাছটাকে দেখেছেন?'

প্রসঙ্গ আচমকা পাল্টানোয় আমি সমুদ্রের দিকে তাকালাম। সমুদ্রের ওপর এখন

কালো চাদর বিছিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি। কত লক্ষ লক্ষ নানান সাইজের মাছ জলজন্তু ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে যাদের এখন দেখার কোন উপায় নেই। অবশ্য দিনের বেলায় জেলেনৌকোয় ধরে আনা নানান ধরনের ছোট মাছ ঝিনুক অথবা শাঁখ ছাড়া বাকিদের দর্শন কখনই পাওয়া যায় না। এই মাছটি তার ছায়া নিয়ে যে কেন আজ এসেছিল তা আমার জানা নেই। আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, এখান থেকেই দেখেছি। সারাদিন ছিল ওটা।'

'তাহলে দলছুট মাছ!'

'হতে পারে।'

'হাতিদের মধ্যে কেউ কেউ দলছুট হয় জানি, মাছেদের মধ্যে এই প্রথম শুনলাম—অথচ ওটা জলের ওপর ওঠেনি। সাইজটা স্পষ্ট দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। তবে জলের মধ্যে বলে এক-এক সময় এক-এক রকম মনে হচ্ছিল।'

প্রফুল্লবাবু উঠলেন। তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম খানিকটা। বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোকেরা যেসব কথা বলেন আমরা তাই বললাম। তখন জানতাম না দু'তিনদিনের মধ্যে উৎপাত এসে জুটবে।

বাড়ি ফিরে এসে আলো জ্বেলে গ্লাস দুটো পরিষ্কার করলাম। এখানে জানলা খোলার একটা বিপদ আছে। হাওয়া বইলেই ধুলো আসে ঘরে। ধুলো না বলে বালি বলাই ভাল। রোজ দুবেলা পরিষ্কার করেও ফাল্গুনী তাদের দূর করতে পারে না। অথচ জানলা না খুললে সামুদ্রিক বাতাস থেকে বঞ্চিত হই আমি। জীবনের কোন কিছুই একতরফা পাওয়া যায় না। এখানেও সেই নিয়মটা চালু রয়েছে।

এখন রাত বেশী হয়নি। আজ আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। অনেকদিন বাদে বেশী কথা বলেছি আজ। না বললেও চলত কিন্তু বলে ফেললাম। একটু পড়াশুনা করলে কেমন হয়। সিরিয়াস কিছু নয়, বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদাকে নিয়ে ঘরে বসলাম। বেশ লাগছিল। একসময় তন্ময় হলাম। হঠাৎ কানে জলের আওয়াজ ঢুকল। এই আওয়াজ একটু অন্যরকম। বালির ওপর ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ নয়। বই রেখে দ্রুত দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। আওয়াজটা এখন হচ্ছে না এবং সমুদ্র শান্ত। অথচ দু-দুবার ওটা আমার কানে এসেছে। এবং তখনই দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। তীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে জল ছিটকে উঠছে। যেন কেউ পাগলের মত ঘাই মারছে সেখানে। যে মারছে তার শরীর বিশাল। আর তাতেই আওয়াজ হচ্ছে জলে। খুব রাগী এবং বিশাল জলজন্তুটি, যে দিনের বেলায় ছায়া হয়ে ছিল, তাতে আমার আর একটুও সন্দেহ রইল না। আধা-অন্ধকারে তার চেহারা দেখাই যাচ্ছিল না। কিন্তু যেভাবে জল ছিটকে উঠছিল তাতে আন্দাজ করা মুস্কিল হচ্ছিল না। কিন্তু দু-বারের পরেই সে স্থির হয়ে গেল। প্রায় ঘণ্টা খানেক চেয়ে থাকলাম আমি, জলের কোথাও সেই আলোড়ন নেই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। জলো বাতাস ছুটে আসছে গহন সমুদ্র থেকে। একটু শীত-শীত করছিল। পৃথিবীর কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই শুধু

আমার ঘরটি ছাড়া। বালির ওপর পা রাখলাম। এই নির্জনতম রাতে আমি কি খুব একা বোধ করছি ? না, সেরকম কোন অনুভূতি হচ্ছে না, কারও জন্যে মনে একটুও পিছুটান নেই। বরং এ এক আলাদা প্রশান্তি। এই রাতের সমুদ্রসৈকতে পায়চারি করতে করতে মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা আমার। হঠাৎই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। ওই মাছটা, যদি সেটা মাছ হয়, তার বিশাল চেহারা নিয়ে কেন ভাবতে পারছে না এই সমুদ্রটা ওর। ভেতর ভেতর এত রাত্রেও তার কিসের ছটফটানি যে শব্দ করে জল ছুঁড়তে হচ্ছে ওপরে ? এতদিন ওর কি ছটফটানি ছিল না ? হঠাৎ কি ঘটেছে যে ও সারাদিন স্থির হয়ে থাকে ধারে এসে আর রাত বাড়লেই লেজ নাড়ে সজোরে ? কি জানি !

॥ ২ ॥

সকালে ফাল্গুনী যখন চা দিতে এল তখনও আমি বিছানায়। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ও এলে দরজা খুলে দিয়েই বিছানায় গিয়েছি এবং এখনও শরীর ঘুম চাইছে। বাসি চোখে ফাল্গুনীর দিকে তাকিয়ে বেশ অবাক হলাম। শীর্ণ চেহারার এই কালো মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু নেই যা কোন পুরুষকে দুবার তাকাতে বাধ্য করবে। কিন্তু আজ ওকে অন্যরকম লাগল। ফাল্গুনীর পরণে নতুন শাড়ি, কপালে টিপ। খুবই সাধারণ দুটো জিনিস কিন্তু তাতেই মেয়েটির চেহারা একদম অন্যরকম হয়ে গেছে। আমাকে চায়ের কাপ হাতে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে সে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা অস্বস্তিতে।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ভেবেছিলাম সে চলে যাবে। কিন্তু গেল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি কিছু বলবে?'

সে নীরবে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

আমি তাকালাম। আমার কাছে কাজে আসার পর থেকে এতদিন পর্যন্ত সে নিজে থেকে কোন কথা বলেনি। এমন কি মাইনের টাকা নেবার সময়ও না।

'চিঠি এসেছে।' মিনমিনে গলায় বলল ফাল্গুনী।

'চিঠি? কার?'

'ওর।' বলে আর দাঁড়াল না মেয়েটা। ওর ভাষায় অনেক অস্পষ্টতা কিন্তু এই শব্দগুলো বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হল না। আমি বুঝতে পারলাম, এতদিন পরে ফাল্গুনীর স্বামী শহর থেকে চিঠি লিখেছে। সেই চিঠিতে কি লেখা হয়েছে তা আমি জানি না। কিন্তু যে স্ত্রীকে লোকটা ত্যাগ করে গিয়েছিল অনেককাল আগে তাকে আবার চিঠি লিখেছে। এবং সেই চিঠি পেয়ে নতুন শাড়ি এবং টিপ পরেছে ফাল্গুনী। মানসম্মান, অপমান-বোধ কোনরকম দেওয়াল হয়ে সামনে দাঁড়ায়নি। চিঠি পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে ও।

বস্তুত ওর নতুন শাড়ি এবং টিপ আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। যে মেয়েটি দিনের পর দিন একই রকম বিবর্ণ শাড়ি পরে আসে তার এই হঠাৎ পরিবর্তন আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। যে পুরুষ তাকে প্রচণ্ড অপমান করে ছেড়ে গিয়েছিল তার চিঠি পেয়ে এমন পুলকিত হবার যে কোন কারণ নেই একথা যদি ও নিজে না বুঝতে পারে তাহলে কারও উচিত ওকে বুঝিয়ে দেওয়া। ব্যাপারটা হয়তো আমিই করতাম কিন্তু আচমকাই আমি নিজের কথা ভাবতে পারলাম। এই যে চিঠি আসার ফলে মেয়েটির পরিবর্তন আমি সহ্য করতে পারছি না তা ওর জন্যে যতটা নয় তার চেয়ে অনেক বেশী নিজের জন্যে নয় কি? ওর এই পরিবর্তন দেখে আমার মস্তিষ্ক মৃদু সংকেত দিতে শুরু করেছে যে বিপদ আসছে। এইভাবে চিঠির পর এবং শেষতক স্বামীর আহ্বান এলে ফাল্গুনী এক পলকেই আমাকে ছেড়ে চলে

যাবে। আমার এই বাড়ি, খাওয়াদাওয়া সবই বিপন্ন হয়ে উঠবে তখন। নিরাপত্তাহীনতায় আমি আক্রান্ত হব। ফাল্গুনীর পরিবর্তন আমি চাইছি না সম্পূর্ণ নিজের কারণে। অথচ সেটা প্রকাশ করতে রুচিতে বাধছে বলে ওর মান-অপমানের প্রসঙ্গ বড় করে ভাবছি!

এমন যদি হয়, ফাল্গুনী তার স্বামীর কাছে যাওয়ার জন্যে আমার বাড়িতে কাজ করা ছেড়ে দেয়, তাহলে আমি কি করব? অনেক কষ্টে শরৎবাবু ওকে যোগাড় করে দিয়েছিলেন। আর একটি বিশ্বাসী কাজের মেয়েকে চট করে পাওয়া মুশকিল হবে।

পাজামা পাঞ্জাবি পরে যখন বালিতে পা দিলাম তখন কিছু সামুদ্রিক পাখি জলের ওপর উড়ছে। ভারি সুন্দর ওদের দেখতে। হঠাৎ খেয়াল হল। জলের কিছুটা ভেতরে লক্ষ্য করতে লাগলাম। না, কোন ছায়া নেই। গতকাল প্রাণীটি যে জায়গায় ছিল সেখানে ছায়া কাঁপছে না।

বেলা বেশ হয়ে গেছে। রোদ উঠেছে চড়চড়িয়ে। আমি একটা টোকা মাথায় দিয়েছি। এতে রোদের সময় বেশ আরাম হয়। যারা ভোরে মাছ ধরে ফিরেছে তারা যে যার বাড়ি চলে গিয়েছে। এখন সমুদ্রের ধারে বাতিল মাছেদের শরীর ঘিরে কাক-শকুনের ভিড়। প্রফুল্লবাবুকে বলা উচিত ছিল, এতে পরিবেশ দুষ্ট হয়। জেলেরা যদি বাতিল মাছগুলো এক জায়গায় রেখে বালিতে পুঁতে দেয় তাহলে সমস্যাটা মেটে।

ট্যুরিস্ট লজ পর্যন্ত আসতেই প্রাণ জেরবার হয়ে গেল আজ। হয়তো রাতে ঘুম না হওয়াও এর কারণ। রোদও খুব কড়া। শরৎবাবু আমাকে আপ্যায়ন করলেন, 'আসুন আসুন। আজ দেখছি অসময়ে!'

'চলে এলাম। প্রফুল্লবাবু কোথায়?'

'তিনি তো ভোরেই চলে গেছেন। সাহেবরা আসেন আসতে হয় বলে।' শরৎবাবু হাসলেন, 'কাল তো আপনারা অনেকক্ষণ গল্পগুজব করেছেন।'

'হ্যাঁ। উনি আজই চলে যাবেন বলে জানতাম না।' আমি বললাম, 'শরৎবাবু, আপনাকে আমার বিরক্ত করতে খারাপ লাগে, কিন্তু—।'

শরৎবাবু মাথা দোলালেন, 'ছি ছি ছি! আপনার জন্যে কিছু করতে পারলে ধন্য হব আমি। আপনার মত বিখ্যাত মানুষ যে এমন অজ সমুদ্রের ধারে আমাদের সঙ্গে আছেন এটাই ভাবতে পারবে না অনেকে। বলুন, কি করতে হবে?'

শরৎবাবু স্তুতি করছেন না। আমার মনে হল, কথাগুলো উনি বিশ্বাস করেন। বললাম, 'ফাল্গুনী, যে মেয়েটি আমার এখানে কাজ করে, তাকে বোধহয় এবার ছেড়ে দিতে হবে।'

'ছেড়ে দিতে হবে? কেন? কোন অন্যায় করেছে?'

'না না।' বলতে গিয়ে নিজের কাছেই অস্বস্তি লাগছিল, 'আপনি তো জানেন বেচারার স্বামী থেকেও ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি ওর স্বামী চিঠিপত্র দিয়েছে। হয়তো

ওকে নিয়ে যাবে।'

'নিয়ে যাবে বলেছে ফাল্গুনী?'

'না, তা বলেনি। তবে সদ্ভাব হয়ে গেলে সেইটেই স্বাভাবিক।'

শরৎবাবু হাসলেন, 'তাই বলুন, শুধু স্বামী চিঠি দিয়েছে! ওরকম চিঠি এর আগে অনেকবার এসেছে। একবার যে শহরের জল খেয়ে পেটখারাপ করেছে তাকে কি বিশ্বাস আছে? আপনি চিন্তা করবেন না, ও কোথাও যাবে না।'

'ভাল, কিন্তু বিকল্প কারো কথা ভেবে রাখুন।'

'বেশ। কিন্তু আপনি তো এদের জানেন। ফাল্গুনীর কোন অবলম্বন ছিল না বলে ওকে রাজী করানো গেছে। এখানকার মেয়েরা সহজে রাজী হতে চায় না। দেখি। ওহো, আপনার একটা চিঠি এসেছে।' শরৎবাবু আমাকে একটা খাম এনে দিলেন।

কলকাতার একজন বিখ্যাত প্রকাশক বাৎসরিক স্টেটমেন্ট এবং চিঠি পাঠিয়েছেন। এখানে আসার আগে আমি প্রত্যেককে নির্দেশ দিয়েছিলাম আমার প্রাপ্য টাকা থেকে আয়কর কেটে জমা দেবার পর তা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিতে। এতে অনেক ঝামেলা বাঁচে। এখানে আমাকে হাজার চারেক টাকা মাসে খরচ করতে হিমসিম খেতে হয়। অতএব প্রচুর পরিমাণে ব্যাঙ্কে জমছে। সেই টাকাও একসময় ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী পাবে। প্রকাশক লিখেছেন, 'আপনার এমনভাবে লেখা থামানো এবং শহর থেকে চলে যাওয়া আমরা মেনে নিতে পারছি না এখনও। পাঠক-পাঠিকারা এবারের বইমেলাতেও আপনার নতুন বই খোঁজ করেছেন। আমি মনে করি আপনি ওখানে চুপচাপ বসে নেই। নিশ্চয়ই কিছু না কিছু লিখছেন। সেই লেখা আমাকে দিলে আমি যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে ছাপতে পারলে বাধিত হব।'

হ্যাঁ, আমি লিখছি। আগে যেমন রোজ পাতার পর পাতা লিখতাম তেমন নয়। কখনও দু-এক পাতা কখনও তিন-চার লাইন। আর এই লেখাও যে কালজয়ী হবে তেমন মনে করার মত গর্দভ আমি নই। কতদিন একটা পাতা কোনমতে লিখে পড়ার পর ছিঁড়ে ফেলেছি। সত্যি কথা, সারাবছরে একটি মাত্র লেখা লিখলেই সেটা ভাল হবে এমন বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। আবার পাঁচটা লিখে দেখা যাবে একটা বেশ ভাল হয়েছে। অতএব এই যেটা লিখছি সেটা যদি না ওৎরায় তাহলে আমি কিছুতেই ছাপতে দেব না। সম্পাদকের কাছে সময় রাখার দায়িত্ব যখন আর আমার নেই তখন অপছন্দের বেলা বাতিল করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।

রোদ মাথায় নিয়ে ফিরে এলাম। কথাটা বলা ঠিক হল না। মাথায় টোকা ছিল কিন্তু রোদ যেন আরও কড়া হয়েছে এরই মধ্যে। ব্যালকনিতে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। জল যেন পুড়ছে। হঠাৎ সেই ছায়াটাকে দেখতে পেলাম। কালকের জায়গাতেই ওটা স্থির হয়ে আছে। আজ যেন ছায়াটাকে বেশ ছোট দেখাচ্ছে। আমি ব্যালকনিতে দাঁড়ানো মাত্র প্রাণীটা খুশী হল। খুশী হল বললাম এই কারণে, ওকে

জলের মধ্যে নাচের ভঙ্গীতে পাক খেতে দেখলাম একবার। আজ ওকে হাত-ছয়েকের বেশী বলে মনে হচ্ছে না। ফাল্গুনী বেরিয়ে এসেছিল। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি তো এখানকার মেয়ে, ওটা কি মাছ?'

ফাল্গুনী তাকাল। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আমি বিরক্ত হলাম। কোন কোন মানুষ এরকম হয়। গাছে বসে থাকা সবুজ পাখি কাছ থেকেও দেখতে পায় না। হঠাৎ খেয়াল হল, ছেলেবেলায় দেখেছি পুকুরে মাছের খাবার হিসেবে ময়দা অথবা ভাতের বল ছুঁড়ে দেওয়া হত। প্রাণীটা রোজ আমার কাছে আসছে। হয়তো ওর বয়স হয়েছে, খাবার ধরতে পারে না তেমন। আমি ফাল্গুনীকে বললাম ময়দা মেখে আমাকে গোটাচারেক বড় বল তৈরী করে দিতে। শুনে সে রীতিমত অবাক হল। ও যে অবাক হতে পারে তা এতদিন আমার জানা ছিল না। ওই চিঠিটা দেখছি অনেক পরিবর্তন আনছে।

ফাল্গুনী ময়দার বল একটা থালায় তৈরী করে আনলে সেগুলো নিয়ে আমি জলের কাছে গেলাম। প্রায় টেনিস বলের সাইজ হয়েছে ওগুলো। বেশ জোরে জলের গভীরে ছুঁড়ে মারলাম চারটেকে। জলের ওপর কোন আলোড়ন নেই। হঠাৎ ব্যালকনির ওপর দাঁড়ানো ফাল্গুনী তার নিজের ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল। যেটুকু বুঝতে পারলাম তাতে মনে হল সে প্রাণীটিকে ময়দার বল খেতে দেখেছে। জলের গায়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ব্যালকনিতে গিয়ে ছুঁড়লে আমি বলগুলোকে প্রাণীটির কাছে পৌঁছে দিতে পারব না। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। দৃশ্যটি আমি কোনদিন দেখতে পারব না।

ওপরে উঠে এলে ফাল্গুনী জানাল সে প্রাণীটিকে ভাল দেখতে পায়নি তবে বল জলে তলিয়ে যাওয়ার সময় ছায়াটা সেটাকে গিলে ফেলেছে। ফাল্গুনী ছায়া দেখেছে এবং তার মতে প্রাণীটি আড়াই হাতের বেশী নয়। কথাটা আমার ভাল লাগল না। আমি যা দেখি এরা যেন সেটা ইচ্ছে করেই দেখতে চায় না। আমি আবার জলের দিকে তাকালাম। প্রাণীটা স্থির হয়ে আছে। জলের মধ্যে আছে বলে ওর চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। একটা গভীর কালো ছায়া। সমুদ্র ওখানে স্থির।

॥ ৩ ॥

এখন আমার সময় দিব্যি কেটে যাচ্ছে। একটু আধটু লিখছি। ভোরবেলায় হাঁটতে বের হই। জেলেদের ধরে আনা মাছের দঙ্গলে যদি লোভনীয় কিছু থাকে কিনে আনি। বাকি সময়টা হয় আমার ব্যালকনিতে বসে ছায়াটার দিকে তাকিয়ে থাকি, নয় ঘরে গিয়ে গান বাজাই। রবীন্দ্রনাথের গানগুলো অনেকবার শোনা গান, এখন আমার কাছে আলাদা অর্থ তৈরী করছে। এই যেমন, কাল রাতে শুনলাম, 'কে দিল আবার আঘাত।' অনেকবার শুনেছি কলকাতায় বসে কিন্তু কাল হঠাৎই মনে হল কবি যখন 'আবার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তখন আগেও কেউ নিশ্চয়ই আঘাত দিয়েছে। তার পরেই মনে হল আমি কেন মাত্র একজন আঘাত দিয়েছে বলে ভাবছি ? এমনও হতে পারে একাধিকবার কবি আঘাত পেয়েছেন তাঁর দরজায় এবং তার পরেও 'আবার' শব্দটি ব্যবহার করা হতে পারে। এই আগের মানুষ বা মানুষেরা কে অথবা কারা ? তারা কি কবির সাড়া পায়নি ?

এরকম ভাবনা মাথায় এলে দেখছি সময়টা দিব্যি কেটে যায়। কাল রাত্রে গান বাজিয়ে ব্যালকনিতে বসে মদ্যপান করেছিলাম। সমুদ্রের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছিল এমন ভাবে যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সঙ্গতের কাজ সেরে নিচ্ছিল। চারপাশে নির্জন অন্ধকার আর আমার কানে গান এবং প্রাকৃতিক শব্দ—এক জীবনে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে ? শুধু ফাল্গুনীর দিকে তাকাতে ইদানীং অস্বস্তি হচ্ছে। মেয়েটির সাজের বহর বেড়েছে। মানুষ নিজের জন্যে সব কিছু ক্ষমা করে দিতে পারে।

দুপুরবেলায় কাণ্ডটি ঘটল। সবে খাওয়া শেষ করে চোখ বন্ধ করার কথা ভাবছি, এইসময় গাড়ির আওয়াজ হল। এই অঞ্চলে ওই যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। আর এখানে শব্দ হওয়া মানে নিশ্চয়ই আমার কাছে কেউ আসছে! বিরক্ত হওয়া উচিত আমার কিন্তু হলাম না। ইদানীং ঠিক করেছি যে কোন ব্যাপারেই নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করব।

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। একটা জিপ এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা থেকে তিনজন পুরুষ নামলেন। ওঁদের মধ্যে শরৎবাবুও আছেন। সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, 'একটু বিরক্ত করতে এসেছি। এঁরা ভারত সরকারের বড় অফিসার। আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'নিয়ে আসুন ওঁদের।'

সরকারী আমলাদের সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা কখনই ছিল না। আর এত লোক থাকতে এঁরা আমার সঙ্গে কি কথা বলতে কষ্ট করে এসেছেন তা জানতে কৌতূহল হচ্ছিল। শরৎবাবুর ওঁদের ওপরে নিয়ে এলেন। বাইরের ঘরে বসার পর পরিচয় জানলাম। এঁরা, খুব সংক্ষেপে বলা যায়, সমুদ্রের প্রাণীবিশারদ। প্রফুল্লবাবু

ভুবনেশ্বরে ফিরে গিয়ে আমার দেখা ছায়ার কথা জানিয়েছেন তাঁর দপ্তরে। সেখান থেকে খবর গেছে এঁদের কাছে। দুজনের একজন বঙ্গ-সন্তান নাম অরুণ মুখার্জী, অন্যজন মিস্টার নায়ার।

অরুণবাবু বললেন, 'আপনার মত একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক সামুদ্রিক প্রাণী দেখেছেন শুনে আমরা আগ্রহী হয়েছি। অন্য কেউ বললে বিশ্বাস করতে পারতাম না। সমুদ্র নিয়ে অনেকেই মনগড়া গল্প তৈরী করে।'

মিস্টার নায়ার বললেন, 'এরকম নির্জন জায়গায় আপনি এখন বাড়ি বানিয়ে একা আছেন দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনার অসুবিধে হয় না ?'

বললাম, 'দুটো প্রশ্ন সম্পূর্ণ আলাদা। কোন্‌টার জবাব দেব ?'

মুখার্জী বললেন, 'প্রথমটার সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করছি, সত্যি আপনি কিছু দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ। আমি জলের মধ্যে একটা প্রাণীর ছায়াকে স্থির হয়ে থাকতে দেখেছি।'

'স্থির হয়ে থাকতে ? সেটা প্রাণী নাও হতে পারে !'

'ওটার প্রাণ আছে, কারণ মাঝে মাঝে পাক খেয়ে সরে যায়।'

'আচ্ছা ! ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন ?'

'না। কারণ পাড় থেকে যে দূরত্বে ও থাকে তাতে স্পষ্ট দেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া কখনও জলের ওপরে ওঠে না প্রাণীটা।'

'আপনি কবার দেখেছেন এখন পর্যন্ত ?'

'অনেক—অনেকবার।'

'ওর আয়তন একরকম হবে ?'

'এইটে আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছে দশ-বারো হাত, কখনও ছয়-সাত, আবার আমার কাজের মেয়েটির মতে আড়াই-এর বেশী নয়।'

'তাহলে আপনার কাজের মেয়েও দেখেছে ?'

'হ্যাঁ।'

মিস্টার নায়ার বললেন, 'আমরা খুবই অবাক হচ্ছি। বঙ্গোপসাগরের এই অঞ্চলে কখনও কোন বড় প্রাণীকে দেখা যায়নি। হাত-তিনেক লম্বা প্রাণী হয়তো পথ ভুল করে চলে এসেছে কিন্তু তীরের এত কাছে বিশাল প্রাণীরা কখনও আসে না।'

বললাম, 'এসব আপনাদের ব্যাপার।'

মুখার্জী বললেন, 'আপনি শেষবার কখন দেখেছেন ?'

'আজ দুপুরের খাওয়ার আগে।'

শোনামাত্র দুজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। মুখার্জী বললেন, 'এখন ওটাকে কি দেখা যেতে পারে ? প্লিজ !'

বললাম, 'এ ব্যাপারে তো আমার কোন হাত নেই। সে থাকলে দেখা যাবে, চলে গেলে দেখতে পাবেন না। আসুন।'

আমি ওঁদের নিয়ে বাইরে এলাম। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের নির্দিষ্ট জায়গাটি

লক্ষ্য করতে লাগলাম। না, ছায়া নেই ওখানে। নায়ার ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখতে পাচ্ছেন স্যার?'

আমি সেই কালো ছায়াটাকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না। মিনিটখানেক বাদে নিজেকে খুব অসহায় মনে হল। এঁরা নিশ্চয়ই আমাকে এবার অবিশ্বাস করবেন।

ভেতরে গেলাম। ফাল্গুনীর বানানো তিনটে ময়দার বল তখনও রাখা ছিল, নিয়ে এলাম বাইরে। ওঁরা সেগুলোর চেহারা দেখে অবাক। আমি সমস্ত শক্তি এক করে ছুঁড়ে দিলাম জলে। প্রথমটা জলে পড়ে তলিয়ে গেল। ওখানে জল গভীর নয়। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে হলে আমাকে ব্যালকনি থেকে নেমে জলের ধারে যেতে হবে। তাই গেলাম। বাকি দুটো ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রার্থনা করতে লাগলাম, প্রাণীটা যেন এখন কাছেপিঠে থাকে। হঠাৎ ওপর থেকে শরৎবাবুর গলা ভেসে এল, 'ওই তো, ওই তো!'

আমি ফিরে দেখলাম। তিনটে মানুষের মুখ কিছু দেখতে পাওয়ার আনন্দে চকচক করছে। আমি দ্রুত ফিরে এলাম। মুখার্জী বললেন, 'হ্যাঁ বেশ বড়, তবে হাততিনেকের বেশী নয়।'

নায়ার বললেন, 'তিন হাত মানে সাড়ে চার ফুট। প্রাণীটা কি হতে পারে?'

মুখার্জী মাথা নাড়লেন, 'বোঝা যাচ্ছে না। শার্ক বা ওই জাতীয় কিছু নয়। সামুদ্রিক আড় বা ওই জাতীয় কিছু হবে। এই প্রাণীটাকেই কি আপনি রোজ দ্যাখেন?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'আজ একটু ছোট লাগছে বটে তবে আমার মনে হচ্ছে ওটা তিন হাতের ঢের বেশী। আর ওই একটা প্রাণী যে রোজ আসে, তা এতদূর থেকে বলা সম্ভব নয়।'

শরৎবাবু বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে ওটা হাতপাঁচেক এবং আড় জাতীয় মাছ নয়।'

নায়ার শরৎবাবুর দিকে তাকালেন, 'ওটা যদি পাঁচ হাতের বেশী হয়, তাহলে ব্যাপারটা একটা খবরের মত খবর হবে। সমুদ্র পুকুর নয়। অবিরত ঢেউ আসছে। অথচ প্রাণীটা সেই ঢেউ-এর নিচে এসে শান্ত হয়ে আপনাদের দর্শন দিচ্ছে। এ কি প্রাণী?'

মুখার্জী বললেন, 'ঠিক আছে। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। ঘুমপাড়ানো গুলি ভরা বন্দুক। মাছটাকে তুলে নিয়ে এসে দেখলেই হবে। ও যেভাবে স্থির হয়ে আছে তাতে গুলি করতে অসুবিধে হবে না। আপনি দুজন লোক যোগাড় করুন যারা জলে নেমে তুলতে পারবে।'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'সেকি? শুধু দেখার জন্যে আপনারা ওকে গুলি করবেন?'

মুখার্জী হাসলেন, 'চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিয়ে নেওয়া ভাল নয়? তাছাড়া প্রাণীটি মরবে না। ঘুমিয়ে পড়বে মাত্র। তারপর না হয় আবার জলে ছেড়ে দেওয়া যাবে।'

'অসম্ভব। আমাদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে ওকে আক্রমণ করা অমানবিক।'

আমি প্রতিবাদ করলাম, 'ওটা আমাদের কোনরকম বিরক্ত করছে না।'

কিন্তু ওঁরা আমার কথা শুনলেন না। মুখার্জী ঘুমপাড়ানি বুলেট ভরা বন্দুক আনতে জিপে গেলেন। অবশ্য ওঁর সঙ্গে শরৎবাবুও আছেন। ওঁরা প্রথমে জেলেদের গ্রামে গিয়ে দুজন সাঁতারুকে ধরে আনবেন এখানে, তারপর শিকার করা হবে।

আমি ছায়াটার দিকে তাকালাম। একটা আস্ত গাধা ওটা। জলের তলায় রোজকার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নায়ার বললেন, 'এরকম জায়গায় একা থাকতে আপনার দেখছি কোন অসুবিধে হয় না?'

'এতদিন হত না, এবার মনে হচ্ছে হবে।'

'কেন?' নায়ার অবাক।

'আমার শান্তিভঙ্গ করছেন আপনারা। প্রফুল্লবাবুকে প্রাণীটার কথা বলা আমার অন্যায় হয়েছিল।'

আমি খুব রেগে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কিছু করার যে উপায় নেই তাও বুঝতে পারছিলাম।

নায়ার হাসল, 'আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন। ডিফেন্স থেকে সমুদ্রে প্রচুর বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করে। তাতে কত সামুদ্রিক প্রাণী মারা যায়। কিন্তু ওগুলো মরে যাচ্ছে বলে পরীক্ষা বন্ধ রাখলে দেশ আক্রান্ত হলে আমরা অসহায় হয়ে পড়ব। তাই না?'

'সেটার সঙ্গে এটার কি সম্পর্ক?'

'ধরুন প্রাণীটিকে তুলে দেখা গেল কোন বিরল প্রজাতির মাছ। এই সমুদ্রে সম্পূর্ণ নতুন। একটা যখন আছে তখন আরও অনেক থাকা স্বাভাবিক। সেই মাছের তেল বা মাংস মানুষের প্রয়োজনে লাগতে পারে।' নায়ার আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ব্যাপারটা বিরক্তিকর। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ভেতরে ঢুকে ফাল্গুনীকে আরও কয়েকটা ময়দার বল তৈরী করতে বললাম। সে চটপট গোটাচারেক বানিয়ে দিলে আমার ওযুধের বাক্স থেকে গোটা কুড়ি কুইনিনের ট্যাবলেট বের করে গুঁড়ো করে তাতে মিশিয়ে দিলাম। আমার মত মানুষ দুটো কুইনিন মুখে তুলতে পারবে না। প্রাণীটির শরীরের মাপ অনুযায়ী কুড়িটা নিশ্চয়ই কম হচ্ছে না।

বল হাতে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে নায়ার হাসল, 'আপনার ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে এ্যাকুরিয়ামের মাছকে খাওয়াচ্ছেন। এ অভিজ্ঞতা আগে হয়নি।'

আমি জবাব দিলাম না। চুপচাপ জলের ধারে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম বলগুলো। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খাচ্ছে?'

নায়ার সাগ্রহে দেখছিলেন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। হাত নাড়লেন, 'মনে হচ্ছে খেয়েছে।'

আমি উঠে এলাম। হঠাৎ ওখানকার জল অন্যরকম হয়ে গেল। প্রাণীটা যেন বেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। নায়ার দেখছিলেন পাশে দাঁড়িয়ে। জল শান্ত হলে তিনি হতাশ গলায় বললেন, 'মাই গড! প্রাণীটা কোথায় গেল?'

কুইনিনের ট্যাবলেট যে এমন কাজ দেবে আমিও কল্পনা করিনি। কিছু হাতের কাছে না পেয়ে আমি ওই দিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম প্রাণীটাকে বিরক্ত করতে। সেটা সম্ভব হয়েছে। ওকে আর ধারে-কাছে দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ নায়ার বললেন, 'এর আগেরবার যখন খাওয়ালেন তখন ওটা খেতে এল। এবার খেয়েই পালিয়ে গেল! তাজ্জব ব্যাপার!'

মুখার্জীরা জিপ নিয়ে ফিরে এলেন, সঙ্গে দুজন সাঁতারু। ওরা এসে শুনলেন ঘটনাটা। ঘুমপাড়ানি বন্দুক হাতে জলের ধারে অনেকক্ষণ ঘুরলেন। প্রায় বিকেল পর্যন্ত আমার ব্যালকনিতে বসে থাকলেন। প্রাণীটা ফিরে এল না। ভদ্রলোকদের ফাল্গুনী চা খাওয়ালো। হঠাৎ মুখার্জী বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে দু'হাতের বেশী হবে না।'

'দু'হাত?' নায়ার বিভ্রান্ত।

'জলের মধ্যে ছিল, এখান থেকে ভাল বোঝা যাবে কি করে? তাছাড়া জেলেরাও বলল ওরা তিনহাতের চেয়ে বড় কোন মাছ কখনও দ্যাখেনি।' মুখার্জী জিপের দিকে এগোলেন।

নায়ার বললেন, 'ওইভাবেই রিপোর্ট লিখব?'

'হ্যাঁ। বেশী বড় লিখলে আবার তাগাদা আসবে খুঁজে বের করতে। বুঝলে?'

ওঁরা চলে যাওয়ার পর আমার একই সঙ্গে স্বস্তি এবং খারাপ লাগছিল। স্বস্তি এই কারণে যে প্রাণীটাকে গুলি খেতে হল না। একবার জলের প্রাণীকে ডাঙ্গায় তুলে পরীক্ষা করার পর বাঁচানো সম্ভব হত কিনা সে ব্যাপারে আমার রীতিমত সন্দেহ আছে। আর তাহলে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হত। প্রাণীটাকে ওই আবছা-দেখাও এর আগে কেউ দ্যাখেনি, আমিই প্রথম দেখেছি। আমি জানিয়েছি বলেই ওর মরণ এসে গিয়েছিল। যাহোক, ঘটনাটা ঘটেনি বলে আমার বেশ স্বস্তি হল। সরকারী অফিসাররা আর ওর সন্ধানে আসবেন না বলে মনে হচ্ছে। প্রফুল্লবাবু যে ফিরে গিয়েই এর কথা কর্তৃপক্ষকে বলবেন তা তো আমি জানতাম না।

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। শেষ বিকেলের রোদ পড়েছে সমুদ্রে। প্রাণীটাকে যেখানে অপেক্ষা করতে দেখা যায় সেখানে সে নেই। অকারণে ওষুধ খেলে শুনেছি সুস্থ শরীর অসুস্থ হয়। কুড়িখানা কুইনিন আলাদা ভাবে পেটে গেলে কি ওই বিশাল জলজ প্রাণীর বিপত্তি ঘটবে? কুইনিনের তিক্ত স্বাদ ও নিশ্চয়ই টের পেয়েছে এবং তা থেকে ক্ষতি? আমার মন খারাপ হয়ে গেল। একদম ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলেছি আমি। এবং এই কারণে যদি প্রাণীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে ওর উপকারের বদলে তো অপকারই করা হল।

ফাল্গুনী এল। তার কাজ হয়ে গেছে। মিনমিনে গলায় বলল, 'যাই।'

আমি মাথা নাড়লাম। মেয়েটা বালি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ওর গ্রামের দিকে ফিরে গেল।

যখন সাগরে ছায়া নামল তখন আমি আশা ছেড়ে দিলাম। না, বেঁচে থাকলেও আজ আর ওকে দেখা যাবে না। সমস্ত শরীরে কুইনিনের তেতো নিয়ে প্রাণীটা

হয়তো মাঝসমুদ্রে ঝট-ফট করছে। সাগরের নোনাজল সেই তেতো কাটাতে কি সাহায্য করবে না? কুড়িটা কুইনিন ট্যাবলেট তো ওর কাছে এক চিমটে নস্যির মত! অবশ্য এক চিমটে নস্যি অনভ্যস্ত মানুষকে সাময়িক বিপর্যস্ত করে ফেলে। সেরকম হয়ে থাকলে কাল নিশ্চয়ই ওর দেখা পাওয়া যাবে। এইভাবে ভাবলে মন কিছুটা ভাল হয়ে যায়।

ঘরে ঢুকে মানবেন্দ্র মুখার্জীর একটা ক্যাসেট রেকর্ডারে চাপালাম। এই নীল নির্জন সাগরে। গানটি আমার খুব প্রিয়। তার ওপর এই পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার মিলে যায়। ব্যালকনিতে চেয়ার টেনে বসে সমুদ্র দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গান শুনছিলাম। আমাদের যৌবনের এবং কিশোরবেলার অনেক গান আছে যেগুলো শুধু গান নয়, তার সঙ্গে অনেক ছোট ছোট ঘটনা জড়িয়ে আছে। এখন শুনলে সেই স্মৃতি ঝলকে ওঠে। কিছু বোকা বোকা ব্যাপার তবু ভাল লাগছে।

সন্ধ্যে নামল। আজ শুধু গান আর গান। রবীন্দ্রনাথ নয়, আজ পুরোনো দিনের আধুনিক গান বাজিয়ে চলেছি। রাত যখন নটা, সমুদ্র ছাড়া সমস্ত পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে তখন আমি দ্বিতীয় পেগ শেষ করছি আর আমার ক্যাসেটে বাজছে, 'কবে আছি কবে নেই জীবনের খেলাঘরে'। এ এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। অখিলবন্ধু ঘোষ এই মুহূর্তে আমার ঈশ্বর।

॥ ৪ ॥

কাল রাতে আমি অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ছিলাম। কখন খেয়েছি কখন শুয়েছি খেয়াল নেই। ভুল হয়ে গিয়েছিল বাইরের দরজাটা বন্ধ করতে। না, মদ আমি দু-পেগের বেশী খাইনি। আসলে পুরোনো গানগুলো অদ্ভুত নেশা তৈরী করেছিল। একটা গান ইদানীং আমি শুনতে চাই না, কিন্তু সেটাও বাজিয়েছিলাম শেষদিকে। সুধীরলালের 'স্মৃতি তুমি বেদনার'। আর তারপরে যে কি হল—আমার এখন মনে হয়, মানুষের বুকের কান্না একবার যদি মাথা চাড়া দেয় তাহলে তার চেয়ে বড় নেশা আর কিছুতেই হয় না। ড্রাগ খাইনি কখনও, মদে তো নয়ই।

ঘুম ভাঙ্গার পর দেখলাম বেশ রোদ উঠেছে। ঘরের দেওয়ালে যেখানে রোদ পৌঁছেছে সেখানে যাওয়ার অনেক আগেই ফাল্গুনী আমাকে চা দিয়ে দেয়। ঘড়ি দেখলাম। এখন আটটা বাজে। সর্বনাশ! দ্রুত খাট থেকে নেমে এগোতেই বাইরের দরজা নজরে এল। ফাল্গুনীকে দরজা খুলে দিল কে? ওকে ডাকলাম কিন্তু সাড়া এল না। ফাল্গুনী নেই মানে সে আজ আসেনি। এমন তো কখনও হয় না। এবং তখনই আবিষ্কার করলাম, রাতের বেলা যখন গান এসেছিল মনে তখন দরজা বন্ধ করার কথা খেয়ালে আসেনি। সঙ্গে সঙ্গে মন সজাগ হল। ঘুরেফিরে যা দেখলাম তাতে স্পষ্ট হল চোর ঢোকেনি। কিছুই চুরি যায়নি এই বাড়ি থেকে। সম্ভবত এত দূরের নির্জনে এসে চুরি করার কথা কাল রাতে কেউ ভাবেনি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে গ্যাস জ্বালিয়ে চায়ের জল বসালাম। ফাল্গুনী কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে? ওর আজ পর্যন্ত শরীর খারাপ হয়নি—মানুষ মাত্রে যেটা হওয়া সম্ভব। কিন্তু কেউ একজন এসে খবরটা দিতে পারত! আমার পক্ষে সংসারের সব কাজ করা সম্ভব নয়। ঠিক করলাম চা খেয়ে ওকে দেখতে যাব। সেই প্রথমদিন শরৎবাবুর সঙ্গে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম। ওর দাদার সঙ্গে কথা বলেছিলাম তখন। কিন্তু তারপর আর সেখানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয়নি। চা বানিয়ে চুমুক দিলাম। খুব পাতলা লাগছে। অন্য কেউ এমন চা বানিয়ে দিলে অত্যন্ত বিরক্ত হতাম। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে লাভ কি?

চা খেয়ে ঘরদোর গোছাবার চেষ্টা করলাম। নিজেকে বললাম, স্বাবলম্বী হওয়া ভাল। যেগুলো পারব না সেগুলো করব না, যা পারছি তা করে নেওয়া ভাল। গত রাতের ডিশ গ্লাস ধুলাম না। ওটা ফাল্গুনীর জন্যে রেখে দেওয়া যাক।

ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। গভীর সমুদ্র থেকে ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে তীরের দিকে। সামুদ্রিক পাখীরা ছন্দ নিয়ে উড়ছে সামনে। এখানে স্রোত বেশী নেই, বরং সমুদ্র মশারির মত দোলে। ফলে জলের অনেকটা নিচ পর্যন্ত দেখা যায়। আমি সেই প্রাণীটির সন্ধানে চোখ ঘোরালাম। না, এখনও সেটা আসেনি!

পাঞ্জাবি পরে বেরুনোর জন্যে যখন আমি তৈরী হচ্ছি তখন দরজায় শব্দ হল।

ফাল্গুনী দাঁড়িয়ে আছে। ও যেভাবে ভেতরে ঢুকে যায় সেই ভাবটা মোটেই নেই, বরং বেশ জড়সড় অবস্থা। আমি অবাক ওর সাজের বহর দেখে। গরীব জেলে বস্তির মেয়ে যা সঙ্গতি ছিল তাই দিয়ে নিজেকে সাজিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত দেরি হল ?'

সে জবাব দিল না। মাথা নিচু করল।

বললাম, 'চা খাওয়া হয়ে গেছে। এখন চা করতে হবে না।'

সে ভেতরে গেল। জলের আওয়াজ হচ্ছে। অর্থাৎ ডিশ ধুয়ে রাখছে। কিন্তু তার একটু পরেই বেরিয়ে এল, 'বাবু!'

'কি ব্যাপার ?' পাঞ্জাবির বোতামে হাত দিয়েছিলাম খুলে ফেলার জন্যে।

'আমাকে চলে যেতে হবে!' পরিষ্কার গলায় বলল ফাল্গুনী।

'চলে যেতে হবে মানে ?'

'ও এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে!' ওর কালো মুখ জুড়ে অপূর্ব অভিব্যক্তি।

'তাই নাকি ? খুব ভাল কথা। দাদা কি বলছে ?'

সে জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে রইল।'

অর্থাৎ কেউ আপত্তি করছে না। নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল। একবার ভাবলাম ওকে বোঝাই। এইভাবে ফিরে যাওয়াটা ওর পক্ষে কত বড় অসম্মান সেটা মেয়েটা বুঝতে পারছে না। কিন্তু বলতে পারলাম না। মনে হল ওকে যেতে না দেওয়ার পেছনে আমার নিজের স্বার্থও যেন কাজ করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কবে যাবে ?'

'আজই।'

'আজই ?' এটা বড্ড বাড়াবাড়ি। কোনরকম নোটিশ না দিয়ে চাকরি ছাড়া খুব অন্যায়। ও চলে গেলে আমি বিপাকে পড়ব সেটা মেয়েটা ভাল করেই জানে।

'আজই যেতে হবে কেন ?'

'ও নিয়ে যেতে এসেছে।'

'ঠিক আছে। তোমার ভাল হোক আমি চাই।' আমি মানিব্যাগ বের করে ওর এমাসের মাইনেটা টেবিলের ওপর রেখে দিলাম, 'পুরো মাসের মাইনে রইল।'

'বাবু!'

'আবার কি বলার আছে ?'

'আপনি রাগ করলেন ?'

হেসে ফেললাম, 'না, রাগ নয়। আমার অসুবিধে হবে—এই আর কি!'

'আপনি বললে আমার দাদার মেয়ে আসতে পারে। ও চা বানাবে, ভাত আর মাছ করতে পারে। শিখিয়ে দিলে আস্তে আস্তে সব পারবে। মোটে তেরো বছর বয়স।'

'ঠিক আছে। আমি শরৎবাবুর সঙ্গে কথা বলব।'

ফাল্গুনী টাকাটা তুলে নিল কিন্তু গেল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু বলবে?'

'ও এসেছে।'

অবাক হলাম। এখানে ফাল্গুনী স্বামীকে নিয়ে এসেছে?

ফাল্গুনী বলল, 'জোর করে এল। এখন ও যা বলবে, তাই তো শুনতে হবে।'

'ভালই তো। তোমার স্বামী আমার এখানে এসেছে এতে আপত্তি হবে কেন? কোথায় সে?' আমি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতেই জলের উপরে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

শুঁটকো চেহারার লোকটার পরণে শার্ট-প্যান্ট, মুখে বসন্তের দাগ, গায়ের রঙ ফাল্গুনীর মত। চুলের কায়দা শহরের মানুষের আদলে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে তাকে কাছে ডাকলাম, 'এসো ভাই, তুমি ফাল্গুনীর স্বামী?'

'আজ্ঞে।' লোকটা খুব পান খায়।

'কোথায় থাকা হয়?'

'আজ্ঞে কলকাতায়।'

'তাই নাকি? সেখানে কি কর?'

'রান্নার কাজ করি। বিয়েবাড়িতে আমার খুব ডিম্যাণ্ড।'

'বাঃ, তাহলে তো তোমার রোজগার ভালই!'

'সিজন এলে তবে তো। আজকাল যা দাম বেড়েছে!' পানের পিক ফেলল সে বালির ওপরে, 'আমার বউ আপনার এখানে কাজ করত?'

'হ্যাঁ।' উত্তরটা নিজের কাছেই বোকা-বোকা শোনালো।

'আমার মায়ের মাজা ভেঙ্গে গেছে। এখন বউ-বউ করছে। তাই নিয়ে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'আমাদের গ্রামে—বালেশ্বর।'

'কলকাতায় নিয়ে যাবে না।'

'পাগল! সেখানে একঘরে দশজন শুই। সব ব্যাটাছেলে। মেয়েছেলে নিয়ে গিয়ে সেখানে রাখা যায়?' লোকটা হাসল।

'কি নাম তোমার?'

'আজ্ঞে, দীনবন্ধু।'

'ঠিক আছে। ওকে এ-মাসের মাইনেটা দিয়ে দিয়েছি।'

'আপনার খুব অসুবিধে হবে।'

'তা তো হবেই।'

'এখানকার গ্রামে খোঁজ করলে লোক পেয়ে যাবেন। রাধা নামে একজন—।'

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ফাল্গুনীর গলা ভেসে এল, 'না, তাকে না।'

দীনবন্ধু মুখ ফিরিয়ে ধমকালো, 'এ্যাই, তুই চুপ কর!'

ফাল্গুনী বিড়বিড় করল, 'মন্দ মেয়েছেলে!'

দীনবন্ধু হাসল, 'শুনুন কথা! মেয়েছেলে হল নদীর মত। যতদিন জল ততদিন

নদী। তা নদীর আবার ভাল-মন্দ! কলকাতায় লোকে গঙ্গাস্নান করে। সেখানে তো মড়া ভাসে, লোকে পায়খানা করে। তা বলে গঙ্গা মন্দ হয়ে গেলেন? বলুন বাবু!'

'তুমি তো এ গ্রামের জামাই। অনেকদিন পরে এলে। তুমি মেয়েটাকে জানলে কি করে?'

'দ্বিরাগমনের সময় দেখে গিয়েছি। কাল বিকেলেও দেখলাম। বিধবা মেয়েছেলে, কিন্তু শরীর নষ্ট হয়নি। শ্বশুর-শাশুড়ীকে তো দুবেলা ভাত দিচ্ছে! নৌকো ভাড়া দিয়ে মাছের ভাগ পায় তো! যাকগে, আপনার ব্যাপার আপনি ভাল বুঝবেন।'

'তোমরা কি আজই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ, আর টাইম নেই থাকার।'

'বেশ এসো।'

'আয় রে।' দীনবন্ধু ফাল্গুনীকে ডেকে হাঁটতে লাগল। পাশ দিয়ে যেতে যেতে টিপ করে একটা প্রণাম করল ফাল্গুনী। আমাকে কিছু বলার সময় না দিয়ে স্বামীর পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। আমার মন বলছিল ফাল্গুনী ভাল থাকবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কিছুই করার নেই।

খানিকটা যাওয়ার পর দীনবন্ধুকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখলাম। ফাল্গুনী তার পাশে পৌঁছালে সে কিছু বলে আবার একাই ফিরে আসছিল আমার দিকে। একেবারে সামনে পৌঁছে দীনবন্ধু বলল, 'বাবু, একটা আবেদন ছিল।'

'কি বিষয়ে?'

'কিছু টাকা দিন।'

'কেন?'

'না, মানে, ফাল্গুনী তো আপনার এখানে অনেকদিন ছিল—।'

'হ্যাঁ, ও চাকরি করেছে—মাইনে মিটিয়ে দিয়েছি প্রতি মাসে।'

'তা দিয়েছেন। কিন্তু সেটা তো মাইনে।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'আসলে আপনি পুরুষমানুষ। এখনো শক্তসমর্থ আছেন। ফাল্গুনী রোজ ভোরবেলায় আপনার কাছে এসে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে যেত। এখানে কি করত তা তো সমাজের লোক দেখতে আসত না। এই নিয়ে কথা উঠবেই। আর জানেন তো, কথা বাতাসের আগে ওড়ে। বালেশ্বরে পৌঁছালে আমাদের সম্মান নষ্ট হবে।' দীনবন্ধুল হাসল।

'ছি ছি ছি! তুমি এসব কি বলছ?'

'আমি কিছু বলছি না বাবু। লোকে বলবে।'

'কোন্ লোক একথা বলবে তাকে নিয়ে এসো আমার কাছে!' আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি।

'আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন।'

'তুমি আমাকে অপমান করছ আর আমি মেনে নেব?'

'আমি আপনাকে অপমান করছি? এ কি বলছেন?'
'তুমি তো অদ্ভুত মানুষ!'
'আপনাকে অপমান করলে তো আমার স্ত্রীকেও অপমান করা হয়, তাই না?'
'সেটা তোমার মাথায় আছে?'
'বিলক্ষণ। কিন্তু আমি নেই, সে সারাদিন আপনার কাছে আছে। চেহারা যাই হোক, বয়সটা তো যুবতীর—লোকে যদি গল্প বানায়, আপনি আমি কি করব?'
'তার মানে তুমি তোমার বউকে সন্দেহ কর?'
'তা যদি বলেন তাহলে বলব করি। কে না করে? বউ হল সন্দেহের জিনিস।'
'আমি তোমাকে একটাও পয়সা দেব না।'
'তাহলে কাজটা ঠিক করবেন না।'
'তুমি আমাকে শাসাচ্ছ?'
'ছি ছি! আমার ক্ষমতা কতটুকু! আমি আপনার আমার ভালর জন্যে বলছিলাম!'
'তোমাকে টাকা দিলে আমার ভাল হবে?'
'হ্যাঁ, ভাল তো হবেই। আপনার আমার ওর সবার ভাল হবে।'
লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।
লোকটা হাসল, 'আমি সবাইকে বলব যে আপনি ওকে মেয়ের মত দ্যাখেন। মেয়ে এখন শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছে বলে আপনি সবাইকে খাওয়াতে কিছু টাকা দিয়েছেন। পেটে পড়লে মানুষের মুখ বন্ধ হয়ে যাবেই। বুঝলেন না?'
'যদি টাকা না দিই?'
'আজ্ঞে?'
'তুমি মিছিমিছি আমার নামে বদনাম দিচ্ছ, আমি সেটা মেনে নেব কেন?'
'কোন উপায় নেই তো! বলুন, আছে উপায়?' মাথা নাড়ল দীনবন্ধু, 'আপনি আর সে ওই বাড়ির ভেতরে দরজা বন্ধ করে কি করেছেন তার তো সাক্ষী নেই কেউ!'
'তুমি একটা ইতর।'
'হতে পারে। কিন্তু আপনাকে সত্যি কথা বলছি।' দীনবন্ধু হাসল, 'আপনি কিছুই করেননি, বাবার মত ওকে দেখেছেন। কিন্তু বাইরের পাবলিক সেটা জানবে কি করে? তাই লোকে যাতে কোনরকম কল্পনা না করতে পারে—তাই কিছু যদি দেন!'
আমি অসহায় হয়ে পড়লাম। দূরে দাঁড়ানো ফাল্গুনীকে দেখলাম। মেয়েটা চুপচাপ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি এখনও বিশ্বাস করি, ও এসবের কিছুই জানে না।
ওর ভবিষ্যতের দিনগুলো যে কি বিভীষিকাময় হয়ে উঠবে ভাবতেই ভয় করছিল। আমার এখন কি করা উচিত? ওকে যদি একটাও পয়সা না দিই, তাহলে ও কি করতে পারে? দীনবন্ধু বোধহয় আমার চিন্তা পড়তে পারল। সে হাসল, 'আপনি

আমাকে খারাপ লোক ভাবতেই পারেন। আমি কি করব বলুন। কাল রাতে এখানে এসে আমি দু-একজনের কথায় খারাপ গন্ধ পেয়েছি। এখনই যদি মুখ বন্ধ না করি! তাহলে কে বলতে পারে সবাই দল বেঁধে আপনার কাছে হাজির হবে না!'

আমার শরীর এবার কেঁপে উঠল। লোকটা আস্ত শয়তান। স্রেফ চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতে চাইছে। শরৎবাবুর সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন। ফাল্গুনীকে জড়িয়ে এমন একটা বীভৎস অভিযোগ যে কখনও উঠতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে। হঠাৎ মনে হল, শরৎবাবু যদি অস্বস্তিতে পড়েন? যদি তাঁর মনে হয়, অভিযোগে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে। তাহলে? নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল।

দীনবন্ধু বলল, 'আপনার কাছে বেশী চাইছি না, শ'তিনেক টাকা হলেই হবে।'

আমি আর দাঁড়ালাম না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসে টাকা বের করলাম। মনে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি লোকটার ছায়া এখান থেকে সরে যায় তত মঙ্গল। নিচে নেমে আসতেই দীনবন্ধু এগিয়ে এল।

গলা তুলে বললাম, 'তোমাকে একটা পয়সাও না দেওয়া উচিত ছিল। তোমার বউকে আমি মেয়ের মতই দেখতাম। আমি কেন যে দিচ্ছি তা জানি না— নাও, নিয়ে দূর হও।'

দীনবন্ধু টাকাটা গুনে দিয়ে বলল, 'আসি বাবু, নমস্কার।'

ওর উৎফুল্ল শরীরটাকে চলে যেতে দেখলাম ফাল্গুনীর কাছে। মেয়েটা দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এসব কথাবার্তার কিছুই কি ও জানে না? ওরা চলে গেল।

সমুদ্রের ধারে বসে পড়লাম। খুব খারাপ লাগছে। জীবনে কেউ এভাবে আমার কাছে টাকা নেয়নি। কোন অন্যায় না করেও আমি শিকার হলাম। একথা ঠিক, ফাল্গুনীর সঙ্গে আমার কি আচরণ ছিল তা সে ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু বলবার আগে মানুষ কি আমাদের দিকে তাকাবে না? আমাকে এবং ফাল্গুনীকে দেখে ওসব ভাবনা কি মানুষের মনে আসবে? এই মুহূর্তে ফাল্গুনী যে আমার স্তরের মেয়ে নয় তা আমি কাকে বোঝাবো? আর কোন কোন মানুষ কি প্রাকৃতিক তাড়নায় নিজের স্তর বিস্মরিত হয় না?

আমি দীনবন্ধুকে বললাম ফাল্গুনীকে মেয়ের মত দেখতাম। মেয়ের মত। সত্যি কি ওকে মেয়ের মত দেখতাম? আমার ওরকম একটা মেয়ে আছে তা আমি ভাবতেই পারি না। বাড়ির যে কোন আসবাবের মত ফাল্গুনী এখানে থাকত। ওর দিকে মুখ তুলে তাকাবার কথাও খেয়ালে আসত না। একটি সচল আসবাব বলা যেতে পারে। অথচ বলার সময় আমি বললাম মেয়ের মত। ওটা বললে নিজেকে অনেক বড় করা যায়। আমার বলা উচিত ছিল, মেয়েমানুষ হিসেবে ফাল্গুনীকে আমি কোন গুরুত্বই দিইনি। কিন্তু সেটা বলতে গিয়ে আমার শিক্ষায় লেগেছিল বলে আমি মেয়ের প্রলেপ দিয়েছিলাম। এটাও তো এক চাতুরী।

এই চাতুরী অসাড়ে করে ফেললাম আমি।

ক্রমশ টাকা দেবার জন্যে একটা বিচ্ছিরি অনুভূতিতে আক্রান্ত হলাম। সভ্যজগৎ, চেনাজানা মানুষের জঙ্গল থেকে এতদূরে ছিটকে এসেও আমি আবার শিকার হলাম। কলকাতায় থাকতে আমি নিয়তই কোন না কোন ভাবাবেগের কারণে ব্ল্যাকমেইল্‌ড হয়েছি। ক্রমশ সেই কারণেও ক্লান্তি এসে গিয়েছিল ওই জীবনে। এখন এখানেও তো আর এক ধরনের নির্মম আক্রমণ। আমার উচিত ছিল দীনবন্ধুকে একটা পয়সাও না দেওয়া। ওকে শরৎবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া। দরকার হলে ওর গ্রামে গিয়ে সবার সামনে ফাল্গুনীকে জিজ্ঞাসা করা—ওই অভিযোগ সম্পর্কে তার বক্তব্য কি? এইটে ভাবতেই আমি যেন মিইয়ে পড়লাম।

ফাল্গুনী এতদিন আমার কাছে ছিল। তার ওপর আমি কখনই কোন চাপ দিইনি। অথচ স্বামীর চিঠি আসামাত্র মেয়েটা বদলে গেল। প্রথমে সাজপোশাকে, পরে আচরণে। মেয়েটা আজ চলে যাওয়ার সময় একবারও ভাবল না দুপুরে আমি কি খাব? এটুকু দায়িত্ববোধ যে ওর মধ্যে নেই তা কি আমি আগে জানতাম? আমার কিভাবে চলবে সেটা ও চিন্তাও করল না। অথচ দীনবন্ধু যখন রাধা নামের একজনের নাম বলেছিল তখন সে প্রতিবাদ করেছিল। অর্থাৎ আমার ক্ষতি রাধা করতে পারে বলে তার ধারণা হয়েছিল। কিন্তু সে নিজেই যে ক্ষতি করে যাচ্ছে তা চিন্তাও করল না। স্বামীকে পেয়ে, নতুনভাবে সংসারের জন্যে লোভী হয়ে ফাল্গুনী যদি জনতার সামনে আমার প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে থাকে, যদি আমার সঙ্গে একমত না হয়, তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে? এখন তো মনে হচ্ছে স্বামী বিরূপ হবে এমন কোন কাজ মেয়েটা করবেই না, তাতে কলঙ্ক লাগলেও না।

ক্রমশ আমার মনে হচ্ছিল, খুব ভুল হয়ে গেছে। আমি কলকাতা ছেড়ে এখানে একা থাকতে এসেছিলাম। আমার একাই থাকা উচিত ছিল। একেবারে একা। যা কিছু নির্জনতা এবং একাকীত্ব নিয়ে একা। অন্য কারো ওপর নির্ভর করলে এই জায়গাটাও কলকাতা হয়ে যাবে একথা আমি আগে ভাবিনি। শহরের জীবনে প্রচুর কাজ আমাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে করতে হয়েছে। যে লেখা লেখা উচিত বলে তাগিদ অনুভব করেছি, তা সাহিত্যের শর্ত অথবা পারিপার্শ্বিকের নিরাপত্তার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত লিখতে পারিনি। সন্তানের কোন ব্যবহার বা আচরণে মর্মাহত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে হজম করতে হয়েছে, কারণ আমি তাদের পিতা। আমার সম্পর্কে কোন এক উত্তেজনার মুহূর্তে লেখা স্ত্রীর চিঠির বিষয় যখন জানতে পেরেছি তখন মুষড়ে পড়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। সেই চিঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাদ করতে গেলে পরিবার ভেঙ্গে যেত। আমাকে হজম করতে হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানে আমি চিরকাল লিখে এসেছি এবং আমার জনপ্রিয়তার কথা তারা স্বীকার করলেও, বিশেষ সুবিধে অন্য লেখককে যখন দিয়েছে তখন এমন হাসিমুখ দেখাতে হয়েছে যেন আমার ওপর কোন অবিচার হয়নি। এই যে নিয়ত হজম করে যাওয়া এসব থেকে মুক্তি পেতেও তো এখানে আসা। অথচ একটা বাজে লোক আমার ভালমানুষির

সুযোগ নিয়ে আমকে এখানেও ব্ল্যাকমেইল করে গেল।

রোদ যখন সহ্যের সীমা ছাড়াল তখন ব্যালকনিতে উঠে এলাম। সমুদ্র এখন অনেকটা স্থির। লক্ষ্য করলাম সেই প্রাণীটি নেই। এখন এই মুহূর্তে ওকে আমার খুব দরকার। কিন্তু কুড়িটা কুইনিনের ট্যাবলেট ওর এমন কি ক্ষতি করতে পারে যাতে এখানে আসতে পারছে না আর ?

ঘরে ঢুকলাম। দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা দরকার। ফ্রিজে যা আছে তা গরম করলে আজ চলে যাবে। কলকাতায় থাকতে কিছু খাবার খেতে ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন। যেমন ডিম, রেড মিট। মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল তখন। রেড মিট এখানে ফাল্গুনী রাঁধতো না। মাছ ভাল লাগে আমার ঢের বেশী। তবে ডিম খাই মাঝে মাঝে। কোন অসুবিধে হয়নি সে কারণে। আমি পেঁয়াজ কেটে একটা বড় ওমলেট বানালাম। ভাজতে গিয়ে একটু ধরে গেলেও ওটা যে মন্দ হয়নি তা অনুমান করলাম। চায়ের কথা মনে ছিল না। ওমলেট খেয়ে সেটা খেয়াল হল। আবার গ্যাস জ্বালাতে ইচ্ছে করছিল না। সুচিত্রা মিত্রের ক্যাসেট চালিয়ে দিয়ে একটা বিয়ার খুললাম। দিনের বেলায় মদ খাওয়া আমার মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু আজ খারাপ লাগছিল না। গল্প-উপন্যাসে লেখা হত—মানুষ দুঃখ পেলে মদ্যপান করে, এখনকার লেখকরা সেরকম লিখতে চান না। জীবনে সেই বোকামি সচরাচর এখন কেউ করে না। মদ এখন সভ্যমানুষ নিয়ন্ত্রণে রেখে খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমি দীনবন্ধুর আচরণে দুঃখ পাইনি। কিন্তু অপমানিত হয়েছি। নিজের ওপর ঘেন্না জন্মে গেল তখন থেকে। মেজাজটাও বিশ্রী।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। আজ দাড়ি কামানো স্নান করা হয়নি। কলকাতায় থাকলে এমনটা ভাবতেই পারতাম না। চারটে নাগাদ ঘুম ভাঙ্গতেই খিদে পেল। অদ্ভুত ব্যাপার। যেদিন বাড়িতে খাবার থাকে সেদিন দেরি হলেও খিদে পায় না। আমি উঠলাম। এক কাপ চা বানিয়ে নিলাম। নিজের হাতে এসব কাজ করলে বেশ আত্মবিশ্বাস বাড়ে। চায়ের কাপ হাতে ব্যালকনিতে গেলাম। সমুদ্র সমুদ্রের মতই আছে। এবং তখনই তাকে দেখতে পেলাম। কালকের জায়গা থেকে সামান্য সরে জলের নিচে ছায়াটা চুপ করে আছে। আজ যেন বড্ড ছোট দেখাচ্ছে। এত ছোট যে দূর থেকে মাঝে মাঝে গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই জলের নিচে ছায়াটা নড়ে উঠে আগের জায়গায় চলে এল। এবার যেন ওর আকৃতি বড় হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হল প্রাণীটা আমাকে দেখতে পেয়েছে। এবং দেখামাত্র বেশ উৎফুল্ল হয়েছে। ওর শরীরের পেছনদিকটা নড়ছে। আর আমার মনে হল এখন আমি একা নই। আমি চিৎকার করে বললাম, 'কুইনিন খাওয়ানোর জন্যে দুঃখিত। নইলে ওরা তোমাকে মেরে ফেলত। বুঝতে পারছ ?'

আমার গলার স্বর নিয়ে হাওয়ারা লোফালুফি করতে লাগল। যেহেতু সমুদ্র থেকে হাওয়া ছুটে আসছে তাই স্বর পেছনদিকে ভেসে গেল। আমরা অনেকক্ষণ পরস্পরকে

দেখলাম। আমি অবশ্য ওর শরীরের আদলটা বুঝতে পারছি, বাকি সব ঝাপসা, তবে আমার বিশ্বাস ও আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তা না হলে ওর ওখানে এসে দাঁড়ানোর কোন মানে নেই।

যখন সমুদ্রে ছায়া ছড়ালো তখন ঠিক করলাম শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করব। আমি চা বা ওমলেট বানাতে পারি কিন্তু তার বেশী কিছু প্রয়োজন হলে একটা কাজের লোক দরকার হবেই। আর সেটা যে অবশ্যই প্রয়োজন তা এর মধ্যে বুঝতে পারছি।

দরজায় চাবি দিয়ে বের হলাম। সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডান দিকে সূর্যকে ঢলতে দেখছি। হঠাৎ একটা গান বেজে উঠল মনে। সেই গানের কথায় গায়কের আনন্দ ছিল, কারণ তার প্রেমিকাও সঙ্গে আছে। অতএব সূর্য ডোবার পালা এলেও কোন ক্ষতি নেই। পৃথিবীর সমস্ত গান কি কাউকে কাছে পেয়ে অথবা হারিয়ে গাওয়া ? সন্তোষদা যেদিন বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পূজার গান প্রেমেরই গান, সেদিন মনে দোলা লেগেছিল। শ্যামাসঙ্গীত কিংবা কীর্তন সেই অর্থে প্রেমসঙ্গীত ছাড়া কিছু নয়। দ্বিতীয়জন, তিনি ঈশ্বরী হন বা ঈশ্বর, তাঁর উদ্দেশে নিজেকে নিবেদনের মধ্যে যে আনন্দ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গাইতে পারছি না। তাতেও তো অভিমান মেশানো আছে।

হঠাৎ আমি কাঁকড়াটাকে দেখতে পেলাম। সমুদ্রের ঢেউ ছেড়ে ভেজা বালির ওপর দিয়ে আসছিল, সম্ভবত আমার পায়ের শব্দ অনুভব করে দাঁড়িয়ে গেল। এই অবস্থায় কুচো কাঁকড়ারা ছুটে গর্তে লুকিয়ে পড়ে কিন্তু এটি দাঁড়িয়ে আছে আক্রমণ করার ভঙ্গীতে। এত বড় কাঁকড়া আমি কখনও দেখিনি। ওর বিশাল দাঁড়দুটো যে প্রচুর শক্তি ধরে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাছে হাত নিয়ে গেলেই আঙ্গুল খসিয়ে দিতে পারে সহজে। কুচকুচে কালো বিরাট চেহারার কাঁকড়াটা আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল। আমি চারপাশে তাকালাম। তারপর ফুটদুয়েক লম্বা একটা সরু ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে এগোলাম। কাঁকড়াটা নড়ছে না। ওর চোখ স্থির। দুটো দাঁড় আক্রমণের জন্যে তৈরী। আমি ডালটা ওর সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতেই ও ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে দুটো দাঁড় দিয়েই সেটাকে কামড়ে ধরল। আমি ডালটা ওপরে টেনে তুলতেই কাঁকড়াটা শূন্যে উঠে এল। মনে হচ্ছিল ডালটা ভেঙ্গে যাবে ওর ওজনে কিন্তু সেটা হল না। আমি হাঁটা শুরু করলাম। কাঁকড়াটা প্রাণপণে ডালটাকে চাপ দিচ্ছে। ও বুঝতে পারছে না—দাঁত আলগা করলেই মুক্তি পেয়ে যাবে। বালিতে পড়ে জলের দিকে ছুটে গেলে আমি কিছুই করতে পারব না। অথচ ও সেটা করছে না। মুক্তি যার নিজের ইচ্ছের মধ্যে, সে আক্রমণ করে খুশী হতে চাইছে। অনেকটা যাওয়ার পর ওর দাঁত ডালটাকে কাটতে সমর্থ হল। বালির ওপর পড়ল বলে ও আহত হল না। আমি ডালের পরের অংশ ওর সামনে ধরতে ও আবার সেটাকে কামড়ে শূন্যে উঠে এল। আমার মনে হল, মানুষও এই কাজ করে। নিজের ইগোকে

সন্তুষ্ট করতে এমনই মরীয়া হয়ে যায় যে বিপদ ডেকে আনে বোকার মতন। হঠাৎ কেমন মায়া হল। ওকে নিয়ে জলের কাছে গিয়ে নামিয়ে দিলাম। চলে আসার সময় দেখলাম, ও তেমনি ডালটাকে কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু কিছু নিরীহ মানুষ এখনও পৃথিবীতে রয়েছেন যাঁদের কাজই হল অন্যের সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। শরৎবাবুও সেইরকম মানুষ। ভদ্রলোকের মাতৃভাষা বাংলা নয় কিন্তু বাংলা পড়তে পারেন। লেখক হিসেবে আমার যে পরিচিতি আছে সেটা জানেন। শুধু সেই কারণেই যে আমাকে খাতির করেন তা মোটেই মনে করি না আমি। আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে একই ব্যবহার পেতেন শরৎবাবুর কাছ থেকে।

ফাল্গুনীর কথাটা ওঁকে বললাম। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। দীনবন্ধু যে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে নিয়েছে এটা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল বলে প্রসঙ্গটা বাদ দিয়েছিলাম। শরৎবাবু বললেন, 'কি বলব বলুন! আমাদের দেশের মানুষ এখনও স্বামীকে স্বামী হিসেবেই গ্রহণ করে, তাকে মানুষ হিসেবে বিচার করে না। মেয়েটা কাজকর্ম শিখে গিয়েছিল। নতুন একজনকে—।' শরৎবাবু থেমে গেলেন।

বললাম, 'নাঃ, আর কাউকে আমি রাখব না। নিজেরটা নিজেই করে নেব।'

'পারলে খুবই ভাল। তবে আমি আর একটা প্রস্তাব দিতে পারি। আমাদের এখানে যা রান্না হয় তা থেকে আপনার জন্যে দুবেলা পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা হতে পারে। এতে আপনার খরচও কম হবে আবার পরিশ্রমও বাঁচবে।'

প্রথম দিকে আমি ট্যুরিস্ট লজের রান্না খেয়েছি। কোন ট্যুরিস্ট না থাকলে তার মান এত নেমে যায় যে খেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এখন মনে হল এটাই চলুক।

আমরা কথা বলছিলাম ট্যুরিস্ট লজের সামনে মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। দোকানের মালিক এবং দুজন অলস মানুষ কথাবার্তা শুনছিল। ওদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। দোকানদার বলল, ফাল্গুনী খুব ভুল করেছে। অন্য দুজন বিপরীত ধারণা পোষণ করে। শরৎবাবু আমাকে চা এবং বিস্কুট খাওয়ালেন। একটা বাচ্চা ছেলে রাত নটার মধ্যে আমার খাবার পৌঁছে দেবে বলে জানালেন।

আমরা দুজন সমুদ্রের ধারে হেঁটে এলাম। এখন সমুদ্রে গভীর ছায়া। অন্ধকার নামার প্রস্তুতি চলছে। হাওয়া বইছে প্রায় ঝড়ের মত। হঠাৎ শরৎবাবু মিনমিনে গলায় বললেন, 'কিছুদিন থেকে আপনাকে একটা কথা বলব বলে ভাবছি, কিন্তু ঠিক সাহস হচ্ছে না।'

আমি তাকালাম। লোকটা মোটেই মতলববাজ নয়। এই মুহূর্তে মুখে বেশ লজ্জা এবং সঙ্কোচ মেশামেশি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কথা?'

লাজুক হাসলেন ভদ্রলোক, 'আমি একটু, মানে, লেখার চেষ্টা করি। ছাত্রাবস্থা থেকেই লিখি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোথাও ছাপতে দিইনি। আসলে আমার খুব সাহস হয় না। আপনি যদি একটু দেখে দেন—।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। বঙ্গসন্তানদের এমন গোপন অভ্যেস থাকে। কিন্তু এই ভদ্রলোক——। বললাম, 'বেশ তো, কিন্তু আপনার মাতৃভাষা কি আমি বুঝব ?'

শরৎবাবু মাথা নাড়লেন, 'আমি বাংলা ভাষায় লিখেছি।'

আমি বেশ অবাক হলাম। ভদ্রলোকের বাংলা কথাবার্তায় অবশ্য জড়তা নেই। কিন্তু উনি কিছু লিখলে সেটা মাতৃভাষায় লিখবেন বলে আশা করেছিলাম। কলকাতায় থাকাকালীন প্রায়ই আমাকে এইরকম অনুরোধ শুনতে হত। সাহিত্যযশপ্রার্থীদের সেইসব লেখা যে সবসময়ই নিম্নমানের হত তা নয়। বললাম, 'ঠিক আছে, পৌঁছে দেবেন।'

আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে শরৎবাবু ফিরে গেলেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অন্ধকারে চাঁদ উঠেছে সিন্ধুপারে। গানটা হঠাৎই মনে এল। যদিও এখন চাঁদ ওঠার সময় নয়। অথচ আমি মনে মনে দিব্যি চাঁদ দেখতে পাচ্ছিলাম। গোলাপের দিকে চোখ মেলে বললুম সুন্দর, সুন্দর হল সে। আমি ইচ্ছে করলেই সব কিছু আমার মত করে নিতে পারি। মন আমার কী ভাল! চা খাওয়ার পর খিদেটাও নিস্তেজ।

হাওয়া বইছে হনহনিয়ে। অন্ধকারেও সমুদ্রের ঢেউ সাদা ছোপ ফেলছে। একটু শীতেল মেজাজ। বুকভরে বাতাস টানলাম। আঃ, কী আরাম!

সতের বছর বয়সে এক নির্জন মফঃস্বলী শহর থেকে কলকাতায় পা রেখেছিলাম। তখন কলকাতা ছিল স্বপ্নের দেশ। তেত্রিশ বছর ধরে সেই শহরে নিজেকে আটকে রেখেছিলাম। কলকাতা আমাকে অর্থ দিয়েছে, খ্যাতি দিয়েছে, কিন্তু নিয়েছে অনেক। এই নেওয়াটা গোপনে গোপনে সারা হয়েছে। হঠাৎই আবিষ্কার করলাম মানুষ হিসেবে আমি প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছি। এখন এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে নিজেই অবাক হচ্ছি, কি করে এতদিন আমি কলকাতায় ছিলাম!

এখন কলকাতাকে শুধুই নস্ট্যালজিক না হলে গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রতিটি দিনের সবকটি মুহূর্তে কলকাতার বাতাসে বিষ ভাসছে। অজস্র গাড়ি আর কলকারখানা থেকে বের হওয়া সেই বিষ কলকাতার মানুষকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে——অথচ কারও কোন হুঁশ নেই। অবহেলায় ফেলে রাখা শহরটায় দু'পা হাঁটা যায় না। গাড়ির দঙ্গলে রাস্তা ভরাট। আর রাস্তাগুলোর দেখাশোনা করার মত কেউ আছে কিনা বোঝা দায়। মানুষের জীবন চালিত হয় রাজনৈতিক দলগুলোর ইচ্ছানুযায়ী। সমস্ত শহরটা এখন নীরক্ত। একজন যদি মাঝরাস্তায় উঁচু হয়ে বসে প্রস্রাব করেন তাহলে তাকে পাঁচজনে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবে। আগে যে যত বড় চোর সে তত বড় ধার্মিক সাজতো। এখন এই মুখোশের দরকার হয় না। সারা শহরে জঞ্জাল পচছে, দুর্গন্ধে শরীর টলছে তবু সেটাকে ফুলের বাগান ভেবে মানুষেরা হেঁটে যায়। এককালে নিউমার্কেটের পেছনে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে একটা বিশাল জঞ্জালের আড়ৎ ছিল। তার দুর্গন্ধ এত তীব্র যে কোন কারণে সেখানে যেতে হলে অন্নপ্রাশনের ভাতও বেরিয়ে আসতে পারত। আমি বিরক্ত হয়ে ভাবতাম, ওই অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ রাতদিন

কিভাবে বাস করেন? শিশুরা নিঃশ্বাস নেয় কি করে? একদিন ওখানকার এক বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম। সে বলেছিল, এখন নাকি গন্ধটাকে টের পাওয়া যায় না। অভ্যেস হয়ে গেছে ওভাবে থাকা।

ক্রমশ গন্ধটা ওই ছোট্ট অঞ্চল ছাড়িয়ে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। আর একই ভাবে তার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে কলকাতার মানুষ। বালক ব্রহ্মচারীর ব্যাপারটা আমার কাছে প্রতীক হিসেবে চূড়ান্ত। মানুষটির শরীর পচে গলে হেজে পড়েছিল তবু কিছু স্বার্থান্বেষী তাঁকে নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে গেছে। কলকাতার অবস্থাও তো ওইরকম। পচে গলে যাওয়া ওই শহরটাকে ক্রিমির মত খুঁটে খাচ্ছে রাজনৈতিক ধান্দাবাজ আর ব্যবসায়ীরা। মাঝেমাঝেই, 'আবার চেঁচিয়ে উঠবেন' স্লোগানের মত তাঁরা জানিয়ে যাচ্ছেন কলকাতা আবার তিলোত্তমা হবে। আর আমরা সেই কথায় বিশ্বাস করে বুঁদ হয়ে আছি। কেউ কলকাতার সমালোচনা করলে চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছি। কুৎসিত মুখের মানুষও আয়নায় তাকিয়ে নিজের কোন অংশকে সুন্দর দেখে খুশী হয়ে থাকে। এখন কলকাতার মানুষদের অবস্থা সেইরকম।

ওই কলকাতা ছেড়ে চলে আসতে আমার খারাপ লেগেছিল। পচে যাওয়া কোন অঙ্গ অপারেশন করে বাদ দেবার কথা শুনলে যে খারাপ লাগা তৈরী হয় ঠিক সেইরকম।

অন্ধকারেও দূর থেকে আমার বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। আবছা কাঠামো। সিঁড়ি বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। কালো জল হৈ হৈ করে ছুটে আসছে, ফিরে যাচ্ছে। আমার বুকের পাঁজরে পাঁজরে শহরে বাস করে যত ঝুল জমেছিল তা এজন্মে যাবে না। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, কেউ দশ বছর ধরে সিগারেট খেলে শরীরের যে ক্ষতি হয় তা সিগারেট বন্ধ করার পর দশটি বছর লাগে দূর হতে। আমি প্রায় তিরিশ বছর ধরে সিগারেট খাচ্ছি। আজ থেকে তিরিশ বছর পরে সুস্থ হবার কোন মানে হয় না। আশি বছর বয়সে সুস্থ শরীর নিয়ে আমি কি করব? অতএব ওইসব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এই নির্মল বাতাস বুক ভরে নেওয়া অনেক ভাল। হঠাৎ একটা গান বাজল মনে, 'তব দয়া দিয়ে ধুতে হবে জীবন আমার।' এই বাতাস, এই সমুদ্র ঈশ্বরের দয়া ছাড়া কিছু নয়। আমার সর্বাঙ্গ, ভেতর বাইরে এই মুহূর্তে যেন ধোয়া হয়ে যাচ্ছে। আঃ, কি আরাম!

সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গতেই বেশ চাঙ্গা বোধ করলাম। পরিষ্কার হয়ে এক কাপ চা বানিয়ে নিলাম। গত রাতে শরৎবাবু খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রুটি ডাল আর তরকারি। একটা বাচ্ছা ছেলে ওগুলো পৌঁছে দিয়েছিল। খিদে পেলে মানুষের সব কিছু ভাল লাগে। আমারও অমৃত বলে মনে হয়েছিল। গতরাত্রে মদ খাইনি। গান বাজাইনি। চুপচাপ আকাশ দেখেছিলাম। এত তারা এক আকাশে ঠাসাঠাসি হয়ে থাকতে আগে কখনও দেখিনি। হঠাৎ মনে হয়েছিল নতুন যা কিছু তা যেন স্রষ্টার তৈরী করা হয়ে গেছে। এই আকাশ, গ্রহনক্ষত্র এখন একটু একটু করে ক্ষয় হবে। যিনি স্রষ্টা তিনি যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন তাহলে কতদিন আর তাঁকে স্রষ্টা

বলা হবে?

চায়ের কাপ হাতে বাইরে এলাম। সূর্যদেব সমুদ্রের কয়েক হাত ওপরে। চমৎকার এই সকাল। আলো ঝকঝক করছে সমুদ্রের ঢেউ-এ। হঠাৎ ওকে দেখতে পেলাম। সম্রাটের মত ছায়াটি এসে দাঁড়াল জলের তলায়। আমি খুশী হলাম। আজ ছায়াটাকে বেশ বড় দেখাচ্ছে। সম্রাট না সন্ন্যাসী—কি বললে ঠিক বলা হয়?

আমি আর একা নই। যদিও অনেকটা দূরে জলের নিচে ছায়াটা রয়েছে এবং জলের নিচে থাকার কারণে ওর চেহারাটা এখনও দেখতে পাইনি আমি, আয়তনও গুলিয়ে যাচ্ছে তবু ওকে সঙ্গী ভাবতে আর অসুবিধে হচ্ছে না। এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি ও আমাকে নিশ্চয়ই দেখতে পায়। না দেখতে পেলে রোজ ওখানে এসে দাঁড়াত না। জলের প্রাণীদের চরিত্র নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা বলতে পারবেন এমন সখ্যতা সম্ভব কিনা। আমি অন্তত কোন বইতে পড়িনি। ডলফিন পোষ মানে। কিন্তু পোষ মানাতে হলে তার কাছে ট্রেনারকে যেতে হয়। অবশ্য ময়দার বল খাওয়ার লোভেও ও রোজ ওখানে অপেক্ষা করতে পারে। আমার স্টকে আর ময়দার বল নেই যে ওকে দেব।

ঘরে ফিরে এলাম। ঝাঁট দেওয়া দরকার। নিজের ঘর নিজে পরিষ্কার করতে অসুবিধে কোথায়? কাজে লেগে পড়লাম। সুতপা যদি দৃশ্যটা দেখত! হজম করতে বেশ কষ্ট হত ওর। এত বছরের বিবাহিত জীবনে ও কখনও আমাকে এমন ভূমিকায় দ্যাখেনি। ইদানীং কথাবার্তা খুব কমই হত। তবু সংসারের এইসব সাধারণ কাজ নিয়ে আমাকে কখনও মাথা ঘামাতে হয়নি।

পরিষ্কার করা হয়ে গেলে ক্যাসেট চাপালাম স্টিরিওতে। শচীন দেবের গান। তুমি এসেছিলে পরশু, কাল আসোনি। আঃ, দারুণ! সকালটা হু-হু করে কাটতে লাগল।

এবার ব্রেকফাস্ট বানানো দরকার। মেজাজটা খারাপ হল। এইসব কাজে যদি সময় নষ্ট করি তাহলে পড়ালেখার সময় পাব কখন? কিন্তু খিদে পাচ্ছে, এটাও সত্যি। আমি যখন মনস্থির করছি তখন ব্যালকনিতে শব্দ হল। মানুষের শব্দ। এখন এখানে কারও আসার কথা নয়। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে?'

কেউ সাড়া দিল না। কোন্‌টা বাতাসের শব্দ আর কোন্‌টা মানুষের আমি এখন আলাদা করতে পারি। অতএব উঠলাম। ভেজানো দরজা ঠেলে ব্যালকনির দিকে তাকাতে আপাদমস্তক কাপড়ে মোড়া মূর্তি চোখে পড়ল, যেন কলাবউ এসে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?'

মূর্তিটি একটু নড়ল মাত্র, কোন শব্দ বের হল না।

'তোমার কি কিছু চাই?' অবাক হচ্ছিলাম।

'কাজ করতে এসেছি।' নরম গলায় দিশি উচ্চারণে তিনটে শব্দ শুনলাম।

'কে তোমাকে পাঠিয়েছে? শরৎবাবু?'

ঘোমটা নড়ল। অর্থাৎ শরৎবাবু পাঠিয়েছেন। যাক, ভদ্রলোক এত তাড়াতাড়ি

আমার জন্যে অনুসন্ধান চালাবেন বলে আশা করিনি।

নিজেকে আচমকা হাল্কা লাগল। কিন্তু এর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কোত্থেকে এল ? ভাল করে পরিচয় জানা দরকার। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি নাম তোমার ?'

ঘোমটা আরও নিচু হল, 'রাধা।'

'কোথায় থাক ?'

'পাশের গ্রামে।'

'ঘরের কাজ জানো তো ?'

'মেয়েছেলে ঘরের কাজ তো জানবেই।'

'তা ঠিক, তবে আমার রান্না একটু অন্যরকম।'

'বলে দিলে করে দেব।'

'গুড। তোমার আর কে আছে ? স্বামী থাকলে তাকে নিয়ে আসতে হবে।'

'কেন ?' ঘোমটা সমেত মাথাটা ওপরে উঠল।

'না, স্বামীর সঙ্গে কথা না বলে আমি কাউকে রাখব না।'

'তিনি যদি না থাকেন ?'

'না থাকেন মানে ? তুমি কি কুমারী না বিধবা ?'

'বিধবা ?'

একটু থতিয়ে গেলাম। বয়স বোঝা যাচ্ছে না। গলার স্বর শুনে বয়স বোঝা সবসময় সম্ভব নয়। আমার বন্ধু প্রদীপের মায়ের গলা ছিল কিশোরীর মত। মাসীমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে গেলে প্রায়ই ভুল হত।

'তোমার অভিভাবক কে ? বাবা, মা—?'

'কেউ নেই।'

'কত বয়স তোমার ?' প্রশ্নটা করতে খারাপ লাগল।

'জানিনা।'

'ঠিক আছে। আমি একটু ভেবে দেখি। আমার কাছে যে কাজ করত তাকে তুমি চেনো ? মেয়েটার নাম ফাল্গুনী।'

'জন্ম থেকে দেখছি। ওর স্বামীটা বদমাশ।'

'হুঁ। ফাল্গুনী কত মাইনে পেত জানো ?'

'জানি।'

'তাতে তোমার হবে ?'

'না হলে আসব কেন ?'

'বেশ, আমি একটু শরৎবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখি। তিনি তোমাকে জানিয়ে দেবেন।'

ফাল্গুনীকে যখন ও জন্ম থেকে দেখে আসছে তখন নিশ্চয়ই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। দীনবন্ধুর মত আর কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেইল করুক—তা হতে দেব না।

'আপনি ভাববেন বললেন,—আবার কথা বলবেন বললেন। কিন্তু আপনি তো

আমাকে কাজ করতে দ্যাখেননি!'

আমি এবার হোঁচট খেলাম। কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারল না ও। বললে বলত, আপনি দুরকম কথা বলছেন কেন? কি দেখে আমার সম্পর্কে ভাববেন? কিন্তু যেটুকু বলেছে তাতে বোঝা যায় একেবারে লজ্জাবতী নয়। ভাবলাম, ওকে স্পষ্ট কথা বলি।

'দ্যাখো, আমি এখানে একা থাকি। কোনরকম ঝামেলা পছন্দ করি না। যে আমার কাজ করবে সে সকালে আসবে। আমার দুবেলার রান্না, ঘর পরিষ্কার করা, এইসব কাজ নিজের মত করে চলে যাবে। তার কাজ ভাল হলে আমি কোন কথাই বলব না। ফাল্গুনীও তাই করত। হঠাৎ তার স্বামী এসে নিয়ে গেল। আমি কোন আপত্তি করিনি মেয়েটার ভাল হবে ভেবে। কিন্তু যাওয়ার সময় খামোকা আমার নামে বদনাম দেবে বলে কিছু টাকা আদায় করে নিয়ে গেল।'

আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র হাসির শব্দ বাজল ঘোমটার আড়ালে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাসছ কেন?'

'ফাল্গুনীকে নিয়ে বদনাম করলে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'তার মানে?'

'গ্রামের লোক বলে, ও মেয়েছেলে কিনা সন্দেহ।'

'তুমি একজন মহিলা হয়ে আর একজন মহিলা সম্পর্কে এভাবে বলছ?'

'আমি বলিনি। গ্রামের সবাই বলে। ওর গায়ের রঙ, শরীর দেখে কেউ—। কিন্তু ওর স্বামীটা এমন বদমাস যে এখন ওই ভাঙ্গিয়ে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। আপনি দিলেন কেন? কেউ বিশ্বাস করত না ওর কথা। ফাল্গুনী জানে?'

'না। সে তখন সামনে ছিল না।'

'আমাকে নিয়ে আপনার সেসব কোন ভয় নেই।'

'তাহলে তো ভালই। কিন্তু তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি। তোমাদের এখানকার মেয়েরা তো এত ঢাকাঢাকি করে রাস্তায় বের হয় না। তুমি কেন এমন আগাপাছতলা ঢেকে এখানে এসেছ?' বলতে বলতে হাসি চাপতে পারলাম না।

'শরৎদা বলল আপনি নাকি খুব গোঁড়া মানুষ।'

অনেক কষ্টে ছিটকে আসা হাসিটাকে আটকালাম।

'তাহলে কি আমি পরে আসব?'

আমি আর কথা বাড়ালাম না' বললাম, 'থাক। ভেতরে যাও। কি কি জিনিস কম আছে দ্যাখো। টাকা নিয়ে সেগুলো পরের বার নিয়ে আসবে। আর আমাকে একটু জলখাবার আর চা বানিয়ে দাও।'

'কি বানাবো?' মূর্তিটি একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে।

'তুমি যা ভাল মনে করবে তাই তৈরী কর।' দরজা থেকে সরে তাঁকে ভেতরে যাওয়ার জায়গা করে দিলাম। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঠিক করলাম শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। তাকে ধন্যবাদ জানানো দরকার। দুপুরবেলায় ছেলেটির

খাবার বয়ে নিয়ে আসার কথা আছে, সেটা বাতিল করতে হবে। আর এই মহিলা সম্পর্কে শরৎবাবু কতটা জানেন তাও জেনে নিতে হবে। হঠাৎ দীনবন্ধুর কথা মনে এল। দীনবন্ধু ফাল্গুনীকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিকল্প কাজের লোক হিসেবে ওই গ্রামের আর একজনের নাম করেছিল। সেই নাম শোনামাত্র ফাল্গুনী আপত্তি করে উঠেছিল। আমি অনেক ভেবেও নামটা মনে করতে পারলাম না। কিন্তু সেই মহিলা বিধবা ছিল অথবা তার সম্পর্কে কোন মন্দ ধারণা ফাল্গুনীর ছিল। এই কি সেই? এটাও শরৎবাবুর কাছে জেনে নেওয়া দরকার।

এইসময় ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল। আমি দৌড়ে রান্নাঘরের সামনে পৌঁছে দেখতে পেলাম রাধা বাতাসে হাত নাড়ছে। এখন তার মাথায় ঘোমটা নেই, তার বদলে বেশ পুরুষ্টু একটা খোঁপা দেখতে পেলাম। গায়ের রঙ এদিকের মানুষের চেয়ে একটু খোলা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখেই সে জিভ কেটে ঘোমটা দিতে গেল। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'কাজ করতে গেলে সহজ হয়ে কর।'

'ঘোমটা না রাখলে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?' তার মুখ ওপাশে।

'আশ্চর্য! আমি কেন মনে করব?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা খসিয়ে ফেলল সে। হাওয়ায় আঙ্গুল বুলিয়ে বলল, 'পুড়ে গেছে।'

'সে কি? কিভাবে?'

'ওইটে ধরাতে গিয়েছিলাম। কোনদিন ধরাইনি তো? আচ্ছা, ফাল্গুনী কি ওটা ধরাতে পারত? কক্ষনো না, তাই না?'

'আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম। খুব বেশী পুড়েছে?'

'একটু একটু।'

'এসো, মলম লাগাও।' আমি করিডোরের একপাশে রাখা ফার্স্ট এইড বক্স থেকে বার্নল বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম, 'অল্প লাগাবে। আমার এখানে এসে প্রথমদিনেই আঙ্গুল পোড়ালে!'

সে কিছু বলল না। কিন্তু বুঝলাম যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী এই মহিলা মোটেই লাজুক নয়। ওকে গ্যাস জ্বালানো, ফ্রিজের ব্যবহার দেখিয়ে দিলাম। টি ভি, স্টিরিও দেখে সেগুলোর ব্যবহার জানতে চাইলে আমি আপত্তি করলাম, 'ওখানে তুমি কক্ষনো হাত দেবে না। বেশী কথা বলা আমি পছন্দ করি না।'

দেখলাম তার ঠোঁটের কোণ সামান্য বেঁকে গেল। ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হল না। আর সেইসময় শরৎবাবু নিজেই চলে এলেন আমার বাড়িতে। বাইরের ঘরে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওকে কি কাজে লাগালেন?'

'আপনি যখন পাঠিয়েছেন তখন আমি আপত্তি করব কেন?'

'ওর সম্পর্কে কিছু কথা আপনার জানা দরকার।'

ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যেমন?'

'মেয়েটি বিধবা। গ্রামের কেউ কেউ ওর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করে।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'তাহলে?'

'মুশকিল হল আপনি একা আছেন। যদি খুব বৃদ্ধ হতেন, তাহলে অসুবিধে হত না। পরিবারের পুরুষরা তাদের মেয়েদের এখানে কাজ করুক চাইছে না। বিশেষ করে এই অঞ্চলে বাড়িতে গিয়ে কাজ করার অভ্যেস কারও নেই, কারণ লোক রাখার মত সঙ্গতিই এলাকার কারও নেই।'

'বুঝতে পারছি।'

'আজ সকালে রাধা নিজে আমার কাছে এল আপনার এখানে কাজ করবে বলে। ওর কোন অভিভাবক নেই। আমার মনে হল আপনি তো জীবনে অনেক দেখেছেন, লেখকদের চরিত্র সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা। আব পাঁচজন বদনামের ভয় পেলেও আপনি নিশ্চয়ই পাবেন না।' খুব নম্র স্বরে বললেন শরৎবাবু।

হাসলাম, 'না, ওসব আমি কেয়ার করি না। রাধা যদি ভাল কাজ করে তবে ওকে রাখতে আমার আপত্তি নেই। তবে ফাল্গুনীকে ব্যবহার করে ওর স্বামী যা করে গেল তারপর মনে অবশ্যই কিছু দ্বিধা আছে। ওরকম নিরীহ মেয়ে যদি আমাকে বিপদে ফেলে, তাহলে এই ক্ষেত্রে সেটা যে রিপিট হবে না তার ভরসা কোথায়?'

শরৎবাবু বললেন, 'পাঁচজনের সামনে ও-ব্যাপারে ওকে সতর্ক করে দিয়েছি আমি।'

বললাম, 'গ্রামের লোক যদি ওর নামে বদনাম দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেই বদনামের সঙ্গীও থাকবে। দেখা যাক। তবে আমার কাছে রাধা এসেছে আপাদমস্তক ঘোমটা দিয়ে। এই একটু আগে ওর আঙ্গুলে ছ্যাঁকা লেগেছিল বলে আমি মুখ দেখতে পেয়েছি। বুঝতেই পারছি ওর ওই সাজসজ্জা সম্পূর্ণ ভেক।'

আমাদের কথা শেষ না হতেই রাধা এসে দরজায় দাঁড়ালো, 'খাবার হয়েছে।'

আমি শরৎবাবুকে অনুরোধ করলাম, 'বাঃ, খুব ভাল। আপনার পাঠানো লোকের হাতের রান্না টেস্ট করে যান।'

তিনি রাজী হলেন। দেখা গেল রাধা ভালই রাঁধে।

শরৎবাবু চলে যাওয়ার পর আমি লেখার টেবিলে বসলাম। সামনে জানলার বাইরে সমুদ্র। ঢেউ—অফুরান ঢেউ। সোজা চলে গেলে কি অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে যাব?

'চিনি আর হলুদ কিনতে হবে। আলুও কম আছে।'

ফাল্গুনী হলে বলতাম ড্রয়ার থেকে টাকা বের করে নাও। মেয়েটা সম্পর্কে ধারণা হয়েছিল ও এত সরল যে চুরিচামারি পর্যন্ত করতে পারবে না। কিন্তু রাধা সম্পর্কে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। উঠে গিয়ে টাকা বের করে টেবিলের ওপর রাখলাম, 'যাও—নিয়ে এস। আর শোন, আমি যখন লিখতে বসব তখন আমার সঙ্গে কথা বলবে না।'

'আচ্ছা। আপনি গল্প লেখেন?'

'হ্যাঁ।'

'বানিয়ে বানিয়ে?'

ওর দিকে তাকালাম অবাক হয়ে, 'বানাতে তো হয়ই।'

রাধা কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল।

লিখতে বসলাম। কলম হাতে নিয়ে আবিষ্কার করলাম, মাথায় কিছু আসছে না। পায়ের শব্দে বুঝলাম রাধা বেরিয়ে গেল। মেয়েটা খুব সাধারণ প্রশ্ন করেছে। আমি বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখি কিনা! ছাব্বিশ বছর ধরে যে লেখালেখি করছি, আমার নাম, টাকা পয়সা যার ওপর দাঁড়িয়ে তার সবটাই বানানো? কখনও কোন লেখা লিখতে গিয়ে দেখা-শোনা কোন ঘটনার এক খামচা নিয়েছি, কোন চরিত্রের আদল আমার গল্পের চরিত্রে এনেছি—এই মাত্র। সেই ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, সাহিত্য জীবনের ফটোগ্রাফ নয়। তার মানে সাহিত্যের অনেকটাই লেখকের বানানো। তাহলে আজ এই মেয়েটির কথা কানে যাওয়া মাত্র নিজেকে এমন রিক্ত মনে হচ্ছে কেন? আমার কল্পনার চরিত্র অথবা ঘটনা কি জীবনকে ছুঁতে পেরেছে? কেউ কখনও বলেনি। বরং ইদানীং শুনতে পাই আমার লেখা নাকি আর আগের মত টানছে না। তার মানে আমার কল্পনায় ভেজাল বেড়ে গেছে?

লিখতে ইচ্ছে করছিল না। ক্যাসেট চাপিয়ে স্টিরিও চালিয়ে দিলাম। 'গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা, আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা।' এরকমটা ভাবতে খারাপ লাগে না। শুনতে শুনতে মনের ক্ষতে প্রলেপ পড়ে। অল্প সময়ের জন্যে হলেও সেই প্রলেপ বড় আরামদায়ক।

॥ ৫ ॥

আজ অনেকদিন বাদে সমুদ্রে নেমেছিলাম। আমার একটি নীলরঙের শর্ট আছে। সেটি পরে বুক-জলে চলে যেতেই খেয়াল হল প্রাণীটির কথা। দ্রুত উঠে এলাম হাঁটুজলে। ওই প্রাণী মাংসাশী কিনা তা জানা নেই। সকাল থেকে এমন অন্যমনস্ক ছিলাম যে জলে নামার আগে ভাল করে দেখিনি যে সে কাছাকাছি রয়েছে কিনা! ঢেউ আসছে গড়িয়ে। আমি বালির ওপর বসে। আমাকে আঘাত করে খানিকটা উঠে আবার ফিরে যাচ্ছে জলরাশি। কি আরাম! সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হল, একবার জেলেদের নৌকোয় চেপে ভেতরটা ঘুরে এলে মন্দ হয় না। সুজন বলে একটি ছেলে ওর নৌকোয় যাওয়ার জন্যে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল কয়েকমাস আগে। এড়িয়ে গিয়েছিলাম। এখন ওকে বললে হয়। স্নান সেরে বাড়ির দিকে ঘুরতেই রাধাকে দেখতে পেলাম। জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই আমার স্নান দেখছিল সে। পুরুষমানুষের স্নান দেখাকে কি কোন অন্যায় কর্ম বলা যায়? বিশেষত প্রকাশ্যে এমন সমুদ্রস্নান! কিন্তু চোখাচোখি হওয়া মাত্র ও সরে গেল। এইটে প্রমাণ করল ও অপরাধবোধে আক্রান্ত। হয়তো আমার ভুলও হতে পারে। সভ্যসমাজের বিচারবুদ্ধিমত এরা যে চলবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। কলকাতার কোন কাজের মেয়ে তো আপাদমস্তক ঢেকে কাজ করতে আসত না।

দুপুরের খাওয়াটা আজ ভাল জমল। ফাল্গুনীর থেকে রাধার রান্নার হাত অনেক ভাল। খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে শিখিয়েছে রাঁধতে?'

'নিজে শিখেছি।' রাধা হাসল।

এখন সে ছিমছাম। যে শাড়ি তাকে কলাবউ করে রেখেছিল সকালে, সেই শাড়িকে সে শাসন করে শরীরে মানিয়ে নিয়েছে। মেয়েটার হাবভাব এবং শরীরের গঠন এমন যে চট করে বাড়ির কাজের লোক বলে মনে হয় না। না হোক, এতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি ভাল খেতে পেলেই হল।

'আমি কি রাত্রের খাবার ঢেকে রেখে যাব?'

'হ্যাঁ। ওখানে হটবক্স আছে, ওর ভেতর রেখে যেও।'

'আমি রাত্রে আপনাকে খাবার দিয়ে যেতে পারি।'

'না না, অত রাত্রে তোমার একা ফেরা ঠিক হবে না।'

'তা অবশ্য। একজন খুব পেছনে লেগেছে।'

'পেছনে লেগেছে মানে?'

রাধা মাথা নিচু করে রইল।

'তোমাকে যদি কেউ বিরক্ত করে, তাহলে তার কথা পাঁচজনকে বলছ না কেন?'

'বললে কেউ কান দেয় না।'

'কি নাম তার?'

'সুজন।'

অবাক হয়ে তাকালাম। এই সুজনের কথাই একটু আগে ভাবছিলাম। বছর পঁচিশের যুবক। সুন্দর চেহারা। আমার সঙ্গে বেশ আলাপ আছে। ভদ্র বলেই মনে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'যে সমুদ্রে মাছ ধরে তার কথা বলছ?'

'হুঁ।'

'সুজন কি বিয়ে করেনি?'

'করেছিল। বউ মরে গেছে।'

'ছেলেটা তো ভাল।'

'পৃথিবীতে কত ভাল লোক আছে, তারা যদি সবাই আমার পেছনে ঘোরে তাহলে আমাকে হ্যাঁ বলতে হবে? গ্রামের লোক বলে, ওকে বিয়ে করে নে। একবার জোর করে দেওয়া বিয়ে মেনে বিধবা হয়েছি। এরপর যাকে মন চায় না তাকে বিয়ে করব কেন?'

আমি আর কথা বাড়ালাম না। রাধা যেভাবে কথা বলছে তাতে বিশ্বাস করা মুশকিল যে সকালে ও ঘোমটা মাথায় এখানে এসেছিল! বাড়ির কাজ করার লোকও তো এই ভাষায় কথা বলে না। এখানকার মানুষজনকে দেখে আমার ধারণা হয়নি কেউ এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারে। মন বলছে ওর সম্পর্কে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। হয়তো এতকালের শহরবাসের অভ্যেস থেকেই এমন ভাবনা হচ্ছে। কিন্তু আমি আর বিপদ ডেকে আনতে রাজী নই। কিন্তু ওকে চলে যেতে বলার জন্যে আমার একটা অজুহাত প্রয়োজন। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে চুপ করেই থাকতে হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর টিভি খুললাম। আশ্চর্য, আজই ওরা আঞ্চলিক ছবির পর্যায়ে একটা ওড়িয়া ছবি দেখাচ্ছে। দেবদেবীর ছবি। বন্ধ করে দিতেই পেছন থেকে একটা শব্দ ছিটকে এল। হতাশ হলে অমন শব্দ আচমকা বের হয়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম রাধা পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি দেখছিলে?'

সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। ছবিটা আবার চালু করে সরে এলাম। এটাকে আমি নিশ্চয়ই অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। কিন্তু মনে পড়ল, অনেক বছর আগে শুধু টিভির সামনে বসে থাকার অপরাধে আমার স্ত্রী কাজের লোককে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাধা ডাকতেই চোখ মেলে চায়ের কাপ দেখতে পেলাম। ধড়মড়িয়ে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকাতে বুঝলাম বিকেল হয়ে এল বলে। চায়ের কাপ নিয়ে ব্যালকনিতে চলে আসার সময় দেখতে পেলাম টিভি বন্ধ করে দিয়েছে রাধা। অর্থাৎ এটা শিখে ফেলেছে। যে গ্যাস জ্বালানো নেভানো শিখে নিয়েছে, সে টিভি অফ অন করা পারবে। অবশ্য আগেই জানত কিনা কে জানে! ঠিক করলাম ওর সঙ্গে বাড়তি কথা বলব না। অকাজের কথা বললেই মানুষ প্রশ্রয় পেয়ে বাড়তি কথা শুরু করে।

জলের দিকে তাকালাম। ছায়াটা রয়েছে। কালো ছায়া সামান্য নড়ছে। তাহলে প্রাণীটা ওখানে সারাদিন আমার অপেক্ষায় ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার। প্রাণীটা দলছুট, আমার মতনই। অথবা অসুস্থ হতে পারে। শুনেছি হাতিরা মৃত্যু এসে গেলে দল থেকে সরে যায়, নির্জনে চুপচাপ মৃত্যুর অপেক্ষা করে এবং মারা যায়। এই জলপ্রাণীটিও সেইরকম করছে। যেহেতু জায়গাটা টিলার পাশে, সমুদ্র ধাক্কা খেয়ে ঘুরে গেছে সামান্য তাই জল ওখানে স্থির এবং আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ওর কোন খবর জানার আমার কোন উপায় নেই। আজ নয়, কাল আবার ওর জন্যে ময়দার বল ফেলব। তেতো বল খাইয়ে ওকে বিরক্ত করেছিলাম, সেটা শোধরাতে হবে। চা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতে দেখি রাধা দাঁড়িয়ে আছে। আমার হাত থেকে খালি কাপ নিয়ে ভেতরে চলে গেল। ও এভাবে ছায়ার মত আমার সঙ্গে লেগে থাকবে নাকি? ফাল্গুনী এতদিন এখানে ছিল, তবু আমার কখনও মনে হয়নি সে কোনরকম কর্তৃত্ব করছে। কিন্তু একদিনেই রাধা সেই আবহাওয়া তৈরী করে ফেলেছে।

'আপনার আর কোন দরকার আছে?' রাধা এসে দাঁড়াল। সেই সকালের ভঙ্গীতে শাড়ি পাল্টে নিয়েছে সে। শুধু ঘোমটাটাই নেই।

বললাম, 'না।'

'আমি রাতের খাবার বাক্সে ভরে রেখেছি।'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে যাই?'

'এসো।'

ও আমার পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বালির ওপর দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। মনটা একটু হালকা হল। ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল রাতের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থেকে যাবে। হঠাৎ ওর সিদ্ধান্ত বদল হবার কোন কারণ ঘটেছে কিনা জানি না, তবে আর একটা মানুষ অকারণে এখানে ঘুরঘুর করল না, এটাই স্বস্তির।

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে জেলেদের গ্রামের দিকে চলে গেলাম। মাছ ধরার জালগুলো শুকিয়ে ভাঁজ করছে কেউ কেউ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আড্ডা মারছে কিছু মানুষ। প্রত্যেকের চেহারায় অভাবের ছাপ রয়েছে। মহাজনের কাছ থেকে আগাম নিয়ে মাছ ধরে শোধ করতে হয় এদের। সারারাত জেগে সমুদ্র চষে যে ঠিকঠাক মাছ পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যা পায় তা ধার শোধ করতে শেষ হয়ে যায়। ইদানীং মৎস্যদপ্তর এদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, এইটে যা ভাল খবর।

লোকটার নাম হলধর। শুকনো কালো শরীর, পাকা চুল। বালির ওপর বসে বিড়ি খাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটা একজন মাতব্বর। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন আছ?'

'এই আছি।' লোকটা হাসল, 'আপনি ভাল আছেন?'

'এখানে আসার পর আমি সবসময় ভাল থাকি।'

'আজ কিছু চিংড়ি উঠেছিল। আপনি এলে সস্তায় দিয়ে দিতাম।'

'এত ভোরে আজ ঘুম ভাঙেনি ভাই।'

'ফাল্গুনী তো আর কাজ করছে না। ওর স্বামী নিয়ে গিয়েছে।'

'হ্যাঁ। তার বদলে শরৎবাবু রাধা নামের একটা মেয়েকে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, শুনলাম।'

'মেয়েটা আজ কাজ করেছে। আমার খারাপ লাগেনি।'

'কেউ খারাপ নয় বাবু, পরিস্থিতি মানুষকে খারাপ করে। রাধা বিধবা, মাথার ওপর পুরুষ নেই। খোলা খাবার জলে পেলে সব মাছই ঠোকর দিতে চায়। মুশকিল হল মানুষের বেলায় খাবারটার দোষ হয়ে যায়, মাছগুলো সতী থাকে। আপনি ভালই করেছেন ওকে রেখে। কারও কথায় কান দেবেন না।'

'ও তো আবার বিয়ে করতে পারত। তোমরা বিয়ে দাওনি কেন ?'

'দেবার লোক ছিল না। তাছাড়া কুমারী মেয়ে এত রয়েছে যে কে বিধবাকে ঘরের বউ করবে বাবু ? তারপর যখন আর একটু বয়স হল তখন ঠোকরানো আরম্ভ হয়ে গেল। মন না মতি। সবসময় যে ও ঠিক থেকেছে তা বলতে পারি না। ঠিক থাকলে বদনাম হবে কেন ? ছেড়ে দিন বাবু এসব কথা। আপনার কাছে ভালভাবে কাজ করলেই হল।'

হলধর চুপ করল। এর মধ্যে আশেপাশে কিছু মানুষ ভিড় জমিয়েছে। প্রত্যেকেই আমাকে নিয়ে কৌতূহলী। এদের অনেককেই সকালে মাছ ধরে ফেরার সময় আমি দেখেছি।

ওদের মধ্যে সুজন দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা, ছিপছিপে, একমাথা কোঁকড়া চুল। ইসারায় কাছে ডাকতেই ও এগিয়ে এল, 'কি খবর তোমার ?'

'আছি।' ছেলেটা চোখ নামাল।

রাধার কথা মনে পড়ল। আমার বাড়িতে রাধা কাজ করছে বলে সুজন কি অসন্তুষ্ট ? জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি আমাকে সমুদ্রে ঘোরাবে বলেছিলে একদিন !'

'চলেন।'

'যেতে তো খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু রাত্রে গিয়ে কি করব বল। রাত্রে তো আকাশ ছাড়া কিছুই দেখতে পাব না। সেটা বালিতে দাঁড়িয়েও দেখি। তুমি যদি কখনও দিনের বেলায় যাও তাহলে আমাকে বলো।'

'কালই চলুন।' নির্লিপ্ত গলায় বলল সুজন।

'কাল ? তোমরা কি দিনের বেলায় নৌকো নিয়ে বের হচ্ছ ?'

'আপনি গেলে যেতে পারি।'

'না না, আমার জন্যে কেন পরিশ্রম করবে তুমি। তোমরা তোমাদের কাজে গেলে আমি সঙ্গে যেতে পারি।' আমার খারাপ লাগল।

'পরিশ্রম কিছু হবে না। আপনি দশটা নাগাদ চলে আসবেন। আমরা তিন-চার

ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।' সুজনকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাল এখন।

হলধর বলল, 'সাধ হয়েছে যখন তখন ঘুরে আসুন বাবু। সুজনের ওপর ভরসা আছে। আপনার কোন বিপদ হবে না।'

মেনে নিলাম। কথা পাকা করে ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যে নামল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বেশ রোমাঞ্চিত হলাম। ছেলেবেলা থেকে নৌকোয় সমুদ্রপাড়ি দেবার কত কাহিনী পড়েছি। মাঝে মাঝে কল্পনা করেছি, নিজেও অমন অভিযানে নেমে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছেছি। কাল সুজন আমাকে কতদূর নিয়ে যাবে কে জানে! আর তখনই খেয়াল হল, আমি সাঁতার জানি না। ওই বিস্তৃত জলরাশিতে যদি আমি পড়ে যাই, তাহলে তিরিশ সেকেণ্ডও ভেসে থাকতে পারবো না। ঢেউ-এর আঘাতে মাছধরা নৌকো উল্টে যেতেই পারে। তাহলে ? শরীর শিরশির করে উঠল।

॥ ৬ ॥

সন্ধ্যের পর থেকেই হাওয়ার দাপট বাড়ল। সেই সঙ্গে সমুদ্র আচমকা অন্য চেহারা নিয়ে নিল। লক্ষ লক্ষ রাগী সাপ একসঙ্গে ফোঁসফোঁসানি শুরু করলেও এই শব্দের কাছে হার মেনে যাবে। ঢেউগুলো প্রবলবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তীরে। যেহেতু আমার বাড়ি টিলার ওপরে তাই আমি ওদের নাগালের বাইরে। স্টিরিওতে দেবব্রত বিশ্বাস চাপিয়ে দিয়ে ব্যালকনিতে এসে এই দৃশ্য দেখছিলাম। 'বাতাস আমার কেশেবেশে করছে মাতামাতি' লাইনটির এমন সার্থক অভিজ্ঞতা আমার আগে হয়নি। কিছুক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে থেকে ভেতরে এলাম। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তেই এই বাড়িটা উড়ে যাবে। আঃ, এমনটা হোক। জীবনে তো কত কি ঘটে, আমার মৃত্যুও যদি এইভাবে ঘটে যায় বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

হুইস্কি ঢাললাম গ্লাসে। অল্প জল। দেবব্রতর গলায় এখন বর্ষার গান। যেন আমার সমস্ত সত্তা নিংড়ে লোফালুফি করছেন ভদ্রলোক। এই সময় মনে হল, নতুন করে মনে হল, কিছুই করতে পারিনি আমি। এই যে লেখালেখির নামে এতটা কাল কাটালাম, কিন্তু আমার পূর্বসূরীদের কাউকে কি ছাপাতে পারলাম—যাঁদের নাম আমার পরেও উচ্চারিত হবে। তাঁদের রচনার কাছাকাছি লেখার ক্ষমতাও অর্জন করতে পারিনি। তাহলে আমি কি করতে পারতাম? যাকে বলে দাগ রেখে যাওয়া তেমন কোন কর্ম কি আমার দ্বারা করা সম্ভব ছিল? আমি না পারি গান গাইতে, না পারি শিল্পের অন্যতর শাখায় স্বচ্ছন্দে হাঁটাহাঁটি করতে। আজ এতদিন পরে সামুদ্রিক ঝড় আর দেবব্রতর গান শুনতে শুনতে নিজের জন্যে খুব কষ্ট হল। অবশ্য সেটার পেছনে হুইস্কির প্রভাবও থাকতে পারে। চার পেগ হুইস্কি চোখ এবং মন সাদা রাখবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই।

সকালে রাধা এল হলুদ শাড়ি পরে। ভোরের রোদ মা... ওর শাড়ি আমি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। মাথায় ঘোমটা দিয়ে হেঁটে আসছিল বালির ওপর দিয়ে। ব্যালকনিতে বসে দৃশ্যটি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, চমৎকার ছবি হয়। এখন সমুদ্র শান্ত। কালকের মাতলামির চিহ্নমাত্র নেই। গতকাল রাধা এসেছিল সাদা শাড়ি পরে। একরাত্রের ঝড় সেই শাড়িকে হলুদ করে দিল নাকি?

সিঁড়িতে পা রেখে রাধা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। অভিজ্ঞ মানুষের হাসি। তারপর পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। আজ ঘুম ভেঙেছিল ভোরেই। ওঠা অবধি চা-তেষ্টা পেয়েছিল। রাধার আসার কথা না থাকলে নিজেই বানিয়ে নিতাম। কেউ আছে জানা থাকলে মানুষের নির্ভর করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

চা-বিস্কুট নিয়ে এল রাধা। দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ কি রান্না হবে?'

'তোমার যা ইচ্ছে কর। আমাকে কখনও জিজ্ঞাসা করবে না।'

'আপনার যদি পছন্দ না হয়?'

'না হলে বলে দেব। রোজ সকালে কি খাব প্রশ্ন করলে আমার খেতে ইচ্ছে

করে না।'

উত্তর দিল না রাধা কিন্তু শব্দ করে হাসল। অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি সে ভেতরে চলে গেছে। হাসল কেন? এটা কি স্পর্ধা? কাজের লোক হয়ে মনিবের সামনে ওইভাবে হাসির মানে কি? এই হাসিটাকে ঔদ্ধত্য হিসেবে ধরে নিয়ে ওকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়? ঠিক করতে পারছিলাম না। তারপরেই মনে হল রাধা চলে গেলে আমাকে আর একজনকে খোঁজ করতে হবে। এতদিনে আমি বুঝে গিয়েছি রাঁধা খাবার সামনে পাওয়ার মত আরাম আর কিছুতেই নেই। অতএব শুধু একটা হাসির জন্যে ওকে ছাড়িয়ে দেওয়াটা বোকামি হবে।

ঘরে ঢুকে লিখতে বসলাম। এর মধ্যে রাধা এল দুবার। লিখছি বলেই কথা বলতে সাহসী হল না অনুমান করলাম। নটা নাগাদ লেখা ছেড়ে উঠতেই সে পরোটা আর ডিমের তরকারি নিয়ে এল। ডিম আমার বেশী খাওয়া বারণ। রেড মিটও মাসে একবারের বেশী নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে হাত গোটাতে পারলাম না। খাওয়া শুরু করতেই রাধা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি মদ খান?'

এমন চমকে উঠেছিলাম যে আর একটু হলেই জিভ কামড়ে ফেলতাম। বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকাতে বলল, 'গ্লাস ধুতে গিয়ে গন্ধ পেলাম, তাই—।'

'হ্যাঁ, খাই।' বেশ জোর দিয়ে বললাম।

'বিলিতি মদ, না?'

'কেন বলো তো?'

'আমি দিশি মদের গন্ধ চিনি। এই গন্ধটা বেশ ভাল।'

আমি জবাব না দিয়ে খেতে লাগলাম। আমার স্ত্রী একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি মদ খাও?' আমার খুব খারাপ লেগেছিল। যদি জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি কি ড্রিঙ্ক করো', তাহলে কানে লাগত না। বলেছিলাম, অল্প-স্বল্প। সে বলেছিল, 'যেদিন মদ গিলবে সেদিন আমার পাশে এসে শোবে না। ওই গন্ধ নাকে গেলে আমার বমি আসে।' ব্যাপারটাকে আমার অস্বাভাবিক মনে হয়নি। কোন কোন বিশেষ বস্তুর গন্ধ কেউ কেউ সহ্য করতে পারে না। আমার এক বন্ধু রসুন দিয়ে রান্না খাবার খেলেই বমি করে ফেলতেন। আমি ব্যাপারটাকে সেইভাবেই নিয়েছিলাম। আমি কখনই মদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করিনি। আমার প্রতিক্রিয়া অন্যভাবে জানতে পারিনি আর। আজ রাধার মুখে একই প্রশ্ন এবং তার সরল প্রকাশ আমি কেন ঠিকঠাক হজম করতে পারছি না জানি না। মেয়েটা দেখছি বড্ড বেশী কথা বলে।

খাওয়া শেষ করা মাত্র রাধা প্লেট এবং ডিশ নিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এল চায়ের কাপ হাতে।

মনে পড়ে গেল। বললাম, 'আমার একদম মনে ছিল না, দুপুরের খাবার তুমি নিজের জন্যে করো, আমি খাব না।'

'কেন?'

'আমার খাওয়ার সময় হবে না।'

'লজে গিয়ে খাবেন ?'

'না। আমি সমুদ্রে বেড়াতে যাব।'

'সে কি ? কেন ?'

'কেন মানে ? সমুদ্র দেখতে আমার সাধ হয়েছে, তাই।'

'কার সঙ্গে যাবেন ?'

এবার মনে পড়ল। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সুজনের সঙ্গে।'

ওর মুখে হাসি ফুটল, 'তাহলে কোন ভয় নেই।'

'খুব ভাল নৌকো চালায় বুঝি ?'

'হ্যাঁ। কত লোককে সমুদ্র থেকে তুলেছে।'

'তাহলে তো ছেলেটা ভাল।'

'আমি কি খারাপ বলেছি। আপনি কিন্তু সঙ্গে জল নিয়ে যাবেন। সমুদ্রে বেশীক্ষণ ভেসে থাকলে মানুষের জল খেতে ইচ্ছে করে।'

'তুমি কখনও গিয়েছ ?'

'না, শুনেছি।' রাধা চলে যাচ্ছিল। তাকে ডাকলাম, 'শোন, কাল তুমি যেভাবে বললে তাতে ভেবেছিলাম সুজনের সঙ্গে যাচ্ছি বলে তুমি রেগে যাবে। ছেলেটাকে তুমি বিয়ে করতে চাইছ না। অপছন্দ কর বলেই চাইছ না। কিন্তু আমাকে কিছু বললে না তো ?'

'আমার অত ভাল ছেলে পছন্দ নয়। তাছাড়া ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট। যে পুরুষমানুষ আমার চেয়ে বয়সে বেশী তাকেই আমার পছন্দ।'

'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

'আর আপনি সমুদ্রে যাবেন যখন, তখন ওর সঙ্গে যাওয়াই ভাল। বলা যায় না কখন বিপদ আসতে পারে। তবে বেশীদূরে যাবেন না।'

রাধা চলে গেলে নিজেকে গালাগাল করলাম। গায়ে পড়ে একগাদা কথা বলে ফেললাম মেয়েটার সঙ্গে। এই প্রশ্রয় পেয়ে আবার কখন কি বলে বসে—সেটা আমাকে সহ্য করতে হবে। গম্ভীর হয়ে থাকা কেন যে রপ্ত করতে পারছি না।

একটাই নৌকো দেখতে পাচ্ছিলাম দূর থেকে। তার পাশে বসে থাকা মানুষটা যে সুজন তা বুঝতে অসুবিধে নেই। ঠিক দশটায় এসে গেছে ও। হাঁটতে হাঁটতে বেশ রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। আমার পরণে এখন একটা খাটো প্যান্ট, কলার তোলা গেঞ্জি। কাঁধে জলের বোতলের স্ট্র্যাপ, পকেটে সিগারেটের প্যাকেট। ভারি শরীরে ওগুলো যে কিরকম দেখাচ্ছে কে জানে ?

আমাকে দেখামাত্র সুজন উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত এই বেশ দেখে একটু হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের দুপাশে। ওর খালি গা এবং হাফপ্যান্ট পরা শরীরটা আমার চেয়ে ঢের বেশী স্মার্ট।

বললাম, 'কাল রাত্রে যা ঝড় হচ্ছিল যে ভয় পেয়েছিলাম আজ যাওয়া হবে না। অথচ বিকেলে তার কোন আভাস পাইনি।'

'সমুদ্রে অমন হয়। আসুন, নৌকোটাকে ঠেলে জলে নামাই।'

সরু নৌকো। ঠিকঠাক বসতে পারব কিনা সন্দেহ হচ্ছিল। বাল্যকালে তিস্তায় যে সমস্ত নৌকোয় পারাপার করতাম তারা ছিল বেশ ঢাউস। সরু ডিঙ্গিনৌকো দেখেছি কিন্তু কখনও উঠিনি। এটা যেমন সরু তেমন লম্বা। জলের বোতল নৌকোয় রেখে হাত লাগালাম। সুজন যত শক্তি প্রয়োগ করছে আমি নিশ্চয়ই ততটা পারছি না, কিন্তু তাতেই বেশ হাঁপিয়ে গেলাম। জলের মধ্যে কোনমতে নামাতে ব্যাপারটা সহজ হয়ে এল। কোমরজলে পৌঁছে ঢেউ-এর ধাক্কায় ভিজে গেলাম পুরোটা। সুজন বলল, 'নিন, উঠে পড়ুন।' নৌকোর একটা ধার ধরে উঠতে গিয়ে দেখছি ওটা কাৎ হয়ে যাচ্ছে। ওভাবে উঠতে গেলে নৌকো উল্টে যাবে। দুবার ব্যর্থ হবার পর সুজন বলল, 'দুটো দিক ধরে লাফিয়ে উঠুন, কোন ভয় নেই।'

রীতিমত জিমন্যাস্টিক হতে হবে দেখছি। কিন্তু নৌকোয় উঠতে পারলাম না বলে এখান থেকে ফিরে যাওয়া আরও বেশী হাস্যকর হবে। দুহাতে ভর দিয়ে কোনমতে শরীরটাকে খোপের মধ্যে তুলে দিলাম। দুলতে দুলতে নৌকো স্থির হল। সুজন এবার ওটাকে ঠেলে বেশ কিছুটা নিয়ে গিয়ে অবলীলায় উঠে বসল। ও উঠেছে আমার বিপরীত দিকে। উঠে বৈঠা হাতে নিয়ে বলল, 'সহজ হয়ে বসুন। কোন ভয় নেই।'

কোন ভয় নেই—শব্দ তিনটে ও দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল। নিশ্চয়ই আমার মুখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। পৃথিবীতে এমনভাবে আশ্বাস দেবার মত মানুষ দিন-কে-দিন কমে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তেই নৌকো উল্টে যাবে এবং আমি টুপ করে তলিয়ে যাব। সাঁতার জানি না একথাটা সুজনকে জানানো দরকার। বাতাস বইছে। দুহাতে নৌকোর দুটো কানা আঁকড়ে ধরে আমি বেশ জোরেই চিৎকার করলাম, 'আমি কিন্তু সাঁতার জানি না।'

সুজন সেই গলায় জবাব দিল, 'বসে থাকুন।'

দুলছে খুব। সেই সঙ্গে শরীরের সব রক্ত যেন নেমে যাচ্ছে—আবার উঠে আসছে। যতই বলুক সহজ হয়ে বসুন, এই অবস্থায় কিছুতেই সহজ হয়ে বসা যায় না। হঠাৎ সুজন চিৎকার করল, 'ওইদিকে দেখুন।'

আমি ওর হাত লক্ষ্য করে ঘাড় ঘোরাতে যেতেই মনে হল নৌকো সমেত শূন্যে উঠে পড়েছি। একটা হাত ছিটকে গেল নৌকো ছেড়ে। পরমুহূর্তে দেখলাম একটা গভীর খাদে ঢুকে যাচ্ছে নৌকো। দুহাতে নৌকো আঁকড়ে ধরে বুঝতে পারলাম বিশাল ঢেউ-এর পাল্লায় পড়েছি। এখন কিছুই দেখতে পাব না আমি। মুখে জলের ঝাপটা লাগছে। ব্যাপারটা অবশ্য শেষ হতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল এবং তার মধ্যেই আমার জলের বোতল ছিটকে গেছে সমুদ্রের জলে।

সুজন বলল, 'আর চিন্তা নেই। এবার দেখুন।'

শরীর বেশ অসাড়। তবু ঘাড় ঘোরালাম। সর্বনাশ, তীর এখন অত দূরে ? কখন যে এতটা দূরত্ব চলে এসেছি টেরও পাইনি। সব কিছু ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

আমি আমার বাড়িটাকে দেখতে পেলাম। টিলার ওপরে সেটাকে এখনও দেশলাই-এর বাক্স বলে মনে হচ্ছে।

'আর একটা ঢেউ আসছে, সাবধান।' সুজন হাঁকতেই দেখতে পেলাম একটা পাহাড় যেন দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। এমন গম্ভীর তার চেহারা যে বুক হিম হয়ে গেল। আমার দু'হাত তখন শক্ত করে নৌকোর দুপাশ ধরেছে। ঢেউটা কাছে আসতে নৌকো ওর ওপর উঠে পড়ল। চারপাশের জল এখন অনেক নিচে। আমরা ঢেউ-এর মাথা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে একেবারে খাড়া নিচে নামতে লাগলাম। শরীর এগিয়ে গেল। টাল খেতে খেতে নৌকোটা সামলে গেল হয়তো সুজনের কেরামতিতে। পেটে একটু নোনা জল ঢুকে গেল। বমি করতে গিয়েও করলাম না।

এবার নৌকো স্থির। সামনে কোন ঢেউ নেই। পেছনে তাকিয়ে দেখি কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সুজন হাসল, 'আর কোন চিন্তা নেই। এবার সব শান্তি। জল এখন মাঠের মত।'

মাঠের মত জল—এমন উপমা জীবনে শুনিনি। আমি সোজা হয়ে বসলাম। সত্যি সমুদ্র এখন শান্ত। কিন্তু একটু খাওয়ার জল পেলে ভাল হত। মুখ বেশ নোনতা হয়ে গেছে। পেটে অস্বস্তি। আমি সমুদ্রে থুতু ফেললাম।

নৌকো এখন প্রায় স্থির। আমি কোন দিকচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। দূরে কিছু নৌকো অবশ্য দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত এই সময়ে মাছ ধরতে এসেছে ওরা। ধাতস্থ হতে আমার কিছুক্ষণ সময় লাগল। আমি সুজনের দিকে তাকালাম। সে নৌকোর ওপর ঝুঁকে কিছু খুঁজছে। ওর আচরণে কোন পরিবর্তন নেই। এই যে সমুদ্রের অনেকখানি ভেতরে এত কাণ্ড করে চলে এল, কোন উত্তেজনা এখন দেখতে পাচ্ছি না। মানুষ যখন উত্তেজনা হারিয়ে ফেলে তখন তার ভাগ্যে কোন আনন্দ জোটে না। জুটলেও উপভোগ করতে পারে না। আমি সোজা হয়ে বসে চারপাশে তাকালাম। খুব হাল্কা ঢেউ, যাকে ঢেউ বললে বেশী বলা হবে, চারপাশে ছড়ানো। এখানে সমুদ্র কতটা গভীর তা আমার অনুমানের বাইরে। শুধু জানি এই কাঠের আশ্রয় থেকে টুপ করে পড়ে গেলে একমাত্র সুজন না বাঁচালে জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। যদি এই মুহূর্তে আমার কোন ভগবান থেকে থাকে তাহলে ওই লোকটা। ধরা যাক, এখনই সুজনের হার্ট অ্যাটাক্‌ড হল। ছটফটিয়ে মরে গেল ওখানে। তাহলেও আমার ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। কোনমতে বৈঠা হয়তো বাইতে পারব কিন্তু কোন্‌দিকে গেলে তীর পাব তা এখন বুঝতে পারছি না। তারপরেই মনে হল আমি একটি মহামূর্খ। রোজ সকালে সমুদ্র থেকে সূর্য ওঠে এবং আমার বাড়ির পেছনে অস্ত যায়। যদিও এখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে চলে এসেছে, কিন্তু আর একটু বাদেই ওর গতি দেখে বোঝা যাবে পশ্চিমদিক কোনটা—পশ্চিমদিকেই তীর, আমার বাড়ি। সূর্য অনুসরণ করে নৌকো বেয়ে গেলে তীর খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। এইসময় গলা কানে এল, 'জল খাবেন?'

মুখ ফিরিয়ে দেখি একটা ছোট চ্যাপ্টা বোতল হাতে নিয়ে সুজন তাকিয়ে আছে।

আমি মাথা নাড়তে সে সড়সড় করে চলে এল। নৌকোটা একটু দুলল মাত্র কিন্তু কোন ঝামেলা হল না। বোতলটা নির্ঘাৎ বাংলা মদের। ছিপি খোলাই ছিল। জল পরিষ্কার। গন্ধ-টন্ধ নেই। দু'ঢোক খেয়ে ফিরিয়ে দিলাম। ঠিক করলাম সুজনকে একটা ভাল স্কচের খালি বোতল উপহার দিতে হবে।

'আপনি সমুদ্র দেখতে চেয়েছিলেন, কেমন লাগছে?'

'এখন বেশ ভাল।'

'গেঞ্জি খুলে ফেলুন। ভিজে গেছে।'

আমি বাধ্য ছেলের মত আদেশ মান্য করলাম। খালিগায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগলেও বেশ আরাম হল। এর আগে কবে খালিগায়ে বাইরের লোকের সামনে খোলা আকাশের নিচে গিয়েছি মনে পড়ল না। ঈষৎ চর্বি জমেছে পেটে। নাঃ, এবার থেকে একটু-আধটু ব্যায়াম করতে হবে।

সুজন ফিরে গেল নিজের জায়গায়। গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরও ভেতরে যাবেন?'

আমি পূবদিকে তাকালাম। সমুদ্রের চেহারা একই রকম। দূরত্ব বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। আমি মাথা নাড়লাম, 'ঠিক আছে।'

সুজন বিড়ি ধরাচ্ছে। আমি একটু দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই নৌকো এমন দুলে উঠল যে চটপট বসে পড়লাম। কে যেন বলেছিল জীবন পদ্মপাতায় জল, আমার মনে হচ্ছে সরু ডিঙ্গিতে বললে আরও বেশী সত্যি বলা হবে।

আমি চুপচাপ সমুদ্র দেখছিলাম। কূল নেই কিনারা নেই বলে নির্মলেন্দু যে গান শুনিয়েছেন তা এখন বড় সত্যি ঠেকছে। এখন আমার ঢেউ নেই। সুজন যদি ভগবান হয় তবে সে শুধু আমার বিপদে সাহায্য করার জন্যে রয়েছে। কিন্তু বিপদ চূড়ান্ত হলে ঈশ্বরের মত সে-ও অসহায়। আমি এখন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। কলকাতায় থাকতে কোনদিন যদি হঠাৎ মারা যেতাম তাহলে আমার স্ত্রী এবং সন্তানেরা সেটাকে মেনে নিত। দিন, সপ্তাহ অথবা মাসের পর আমার প্রয়োজন কমে কমে ফুরিয়ে যেত। আমার রেখে যাওয়া সম্পদই ওদের জীবন সুস্থিত করলেও, ওরা বাৎসরিকের আগে আমার জন্যে কিছু করত না। সেদিন প্রকাশকরাও আসতেন ছবিতে মালা দিতে। আর কালজয়ী না হলে লেখকদের মৃত্যুর পর তাঁদের বই বিক্রি প্রায় বন্ধ হয়ে যায় বলে প্রকাশকরা বাৎসরিকের পর আসা বন্ধ করতেন। আমার চোখের সামনে এখন নারায়ণ গাঙ্গুলির সদাহাস্যময় মুখ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সন্ত্রস্ত ভঙ্গী, সন্তোষকুমার ঘোষের অস্থিরতা এক হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ খেয়াল হল, আমি এসব কি ভাবছি, সমুদ্র দেখতে এসে কেন আমার মনে মৃত্যুচেতনা চেপে বসছে? আমি কলকাতা থেকে সমুদ্রের ধারে চলে এসে টিলার ওপর বাড়ি করেছি, একা থাকব বলে আমার স্ত্রী একটুও চিন্তান্বিতা হননি। ছেলেমেয়েরা বলেছে, 'যাতে তুমি ভাল লিখতে পার তাই কর।' অর্থাৎ ওদেরও সম্মতি আছে। তবে এভাবে সমুদ্রের মাঝখানে চলে এলে ওরা আপত্তি করত কিনা

জানি না। রাধা তো করেনি।

রাধার কথা মনে আসতেই সুজনের দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম সুজন একটা হুইল বসানো লাঠির গা থেকে সুতো ছড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরবে নাকি?'

'হ্যাঁ।' ও আমার দিকে তাকাল না।

'কি মাছ?'

'যা খাবে।' এবারও তাকাল না সে।

'সুজন, তুমি বিয়ে করেছ? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম।

'একবার হয়েছিল।' সুজন জবাব দিল সুতো ঠিক করতে করতে।

'কথাটা বুঝলাম না।'

'সেই বউ মরে গেছে। আমার তখন বারো-তেরো বছর বয়স। মনেও নেই।' বঁড়শিতে টোপ পরিয়ে খানিকটা দূরে ছুঁড়ে মারল সুজন। সেটা জলের তলায় চলে যাওয়া মাত্র হুইল সমেত ছোট লাঠিটাকে সযত্নে ধরে বসে পড়ল নৌকোর প্রান্তে। সমুদ্রে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার গল্প বিদেশি লেখকদের লেখায় পড়েছি। কিন্তু পুরী অথবা দীঘায় কাউকে ছিপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। একসময় মাছ ধরতে বেশ মজা লাগত আমার। ছোট ছিপ আর পুঁটি অথবা বান মাছ ধরার বঁড়শি নিয়ে বেরিয়ে যেতাম দুপুরে। আঙরাভাসার নির্জন বুকে অনেক সময় কেটেছে আমার পুঁটি ধরে। জলের নিচে মাছ বঁড়শি গিলছে আর আমি টান মারতেই জলের ওপর রুপো চকচকিয়ে উঠছে, এ দৃশ্য দেখতে যে কি আরাম লাগত! জলপাইগুড়িতে এলেও তিস্তা অথবা করলার ধারে গিয়ে সেই শখ মিটিয়েছি। কলকাতায় আসার পর এসব বন্ধ। একবার ঢাকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। এক বন্ধুর সঙ্গে তার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে অনেক পুকুর দেখে মাছ ধরার কথা বলেছিলাম। সে ছিপ আর পাঁউরুটি দিয়ে মোড়া পেতে বসিয়ে দিল একটি পুকুরের ধারে। বঁড়শি ফেলছি আর মাগুর মাছ উঠে আসছে। পর পর তিনটে মিনিট দেড়েকের মধ্যে ধরে সন্দেহ হল। প্রশ্ন করতেই জানতে পারলাম ওখানে মাগুরের চাষ করা হয়। পুকুরে থিকথিক করছে মাগুর। এ যেন চৌবাচ্চায় জাল ফেলে মাছ ধরা। উঠে এসেছিলাম। একটু লুকোচুরি, একটু রোমাঞ্চ, অপেক্ষা করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠার মুহূর্তে কিছু পাওয়া না হলে মাছ ধরায় সুখ হয় না। এর সঙ্গে মানুষের জীবনের মিল প্রচুর। যারা চাইতে না চাইতেই সব পেয়ে যায় তাদের বোধহয় আনন্দিত হবার কোন উপায় থাকে না।

ঝরণা নদী পুকুর অথবা দীঘি নয়, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার মধ্যে কতটা আনন্দ আছে তা দেখার সৌভাগ্য হল। মিনিট পনের হয়ে গেল কিন্তু কোন মাছই সুজনের বঁড়শিতে ঠোকর মারেনি। এর মধ্যে কয়েকবার সে বঁড়শি তুলে দেখে নিয়েছে টোপ ঠিক আছে কিনা। যেসব মাছ বঁড়শি গিলবে তারা বোধহয় এদিকে নেই।

'আবার বিয়ে করনি কেন?'

'আমি চাইলেই কে বিয়ে করবে আমাকে ?'

'দূর ! এদেশে কি মেয়ের অভাব ?'

'অভাব নেই। তাদের বিয়ে করতে মন চায় না।'

'কেন ?'

'দেখে মন ভরে না। মন যদি না ভরে বাবু, তাহলে আর কি লাভ !'

আমি হাসলাম, 'কেমন মেয়ে হলে তোমার মন ভরবে ?'

'জিজ্ঞাসা করছেন যখন তখন বলি—শ্রীদেবী, রেখা, হেমামালিনী।'

'দূর ! ওরা তো ফিল্মের মেয়ে। জীবনের কথা বল—এই গ্রামের কেউ নেই।'

'আছে।'

'আছে ? কে ?'

'আপনাকে বললে আপনি হাসবেন।'

'হাসব কেন ? এরকম সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে কেউ হাসে নাকি ?'

কিন্তু-কিন্তু ভাব ফুটে উঠল সুজনের মুখে। হয়তো লজ্জা পাচ্ছে—অথবা সঙ্কোচ। তারপর বলেই ফেলল, 'আপনার বাড়িতে যে কাজে লেগেছে !'

'আচ্ছা ! কিন্তু রাধা তো বিধবা ?'

'তাতে কি হয়েছে ? আমারও তো বিয়ে হয়েছিল। আর বিধবা হলে কি মেয়েছেলের সব কিছু নষ্ট হয়ে যায় ?' বেশ জোরের সঙ্গে প্রশ্নটা করল সে।

'তা ঠিক। তুমি রাধাকে প্রস্তাব দিয়েছ ?'

'হুম্।'

'সে কি বলল ?'

'রাজী হচ্ছে না। বলছে আমি নাকি বয়সে ছোট। বলুন বাবু, এটা কি কোন কথা হল ? আমার শরীর কোন পুরুষমানুষের থেকে খারাপ ? সে নাকি আমার আগে বুড়ো হয়ে যাবে ! আরে আমি যদি ওর থেকে বড় হতাম, তাহলে আগে আমি বুড়ো হতাম না ? একজনকে ছোট বা বড় হতেই হবে।' কথাটা বলে সে উদাস হল, 'আসলে অন্য কারণ আছে।'

'কি কারণ ?'

'ও মনে করে আমি ভালমানুষ। তাই বিয়ে করবে না।'

'সেকি ? ভাল হওয়া কি দোষের ?'

'আসলে ওকে তো অনেকে ঠকিয়েছে। তারপর থেকে নিজেকে খারাপ ভাবে। যে নিজে খারাপ সে কেন ভালর সঙ্গে থাকবে ! আচ্ছা বাবু, এটা কি কোন কথা হল ?'

'কক্ষনো নয়।'

'আমাকে দেখা করতে নিষেধ করেছে। তারপর—।'

'তারপর ?'

'আপনার বাড়িতে কাজে লেগে গেল।'

'তাতে কি হল ?'

'সকাল থেকে সন্ধ্যে আপনার ওখানে আটকে গেল। কাল খবরটা শোনার পর আমার খুব রাগ হয়েছিল বাবু।'

'কেন ?'

'ওর নৌকো আছে, জাল আছে। ভাড়া খাটিয়ে টাকা পায়। তার ওপর পরের বাড়িতে গিয়ে কাজে লাগার কি দরকার বলুন ? জবাব চাইবার হক কারো নেই বলে যা ইচ্ছে তাই করবে ? তার ওপর আপনি একা থাকেন। ওর গায়ে বদনামের গন্ধ লেগে আছে। কেউ যদি এই নিয়ে রস-রসিকতা করে তাহলে আমার কি শুনতে ভাল লাগবে ?'

'তা তো নিশ্চয়ই।'

'আপনার সঙ্গে গতকাল দেখা না হলে আপনি আমার শত্রু হয়ে যেতেন।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ। ফাল্গুনী যখন আপনার ওখানে ছিল তখন কোন চিন্তা হয়নি। ওই মেয়েছেলেটার দিকে অন্ধও ফিরে তাকাবে না। কিন্তু রাধা হল আগুনের মত। তাকে দিনভর একা পাচ্ছেন আপনি, আপনার ওপর আমার রাগ হবে না ?'

'কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে।'

'কি বয়স আপনার ?'

'পঞ্চাশ ?'

'ছ্যা। আমাদের যদু জেঠার গতমাসে বাচ্চা হয়েছে। তার বয়স এখন তিনকুড়ি। তিনকুড়ি মানে ষাট। আপনার থেকে দশ বছরের বড়।'

'তুমি বললে শত্রু হয়ে যেতাম—তাহলে এখনও শত্রু হইনি।'

'ওই যে—আপনি এসে বললেন আমার নৌকোয় সমুদ্র দেখতে চান। যে মানুষ আমাকে বিশ্বাস করছে তাকে শত্রু করি কি করে ?'

'তোমার নৌকোয় আসছি শুনে রাধা কি বলল জানো ?'

'কি বলল ?' সুজনের আগ্রহী মুখ দেখতে মন্দ লাগল না।

'বলল তুমি খুব ভাল নৌকো চালাও। আমার কোন ভয় নেই।'

'বলল ?'

'হ্যাঁ।'

সুজন হঠাৎ ঘুরে বসল। তারপর হ্যাঁচকা টান মারল সুতোয়। মেরে সেটা ছেড়ে হুইল ঘোরাতে লাগল। ব্যাপারটা এমন নাটকীয় ভাবে ঘটল যে আমিও অবাক হয়ে গেলাম। একটা সুখবর পাওয়ামাত্র যেন ওর বঁড়শিতে মাছ আটকালো। নৌকো এখন মাছের টানে সামান্য ঘুরছে। মিনিট চারেক এপাশ-ওপাশে যাওয়ার পর সুজন সুতো গোটাতে শুরু করল। এবং কিছুক্ষণ বাদেই আমি মাছটাকে দেখতে পেলাম। সামুদ্রিক আড়মাছ। বড়জোর এক কেজি হবে। সেটাকে নৌকোয় তুলে বিজয়ীর হাসি হাসল সুজন। বঁড়শি খুলে দক্ষ হাতে মাছটাকে মেরে একটা দড়ি কানকো

দিয়ে ঢুকিয়ে নৌকোর সঙ্গে বেঁধে নিচে ফেলে দিল। তারপর বলল, 'মাছটা আপনাকে দিয়ে দেব বাবু।'

মাথা নাড়লাম, 'না ভাই, ওটা তুমি খেয়ো।'

'কেন ? নেবেন না কেন ?'

'খাবে কে ? আমি তো সমুদ্রের আড় খাই না।'

'রাধা খাবে।'

আমি চমকালাম। আমাকে দেওয়া মানে যে রাধার কাছে পৌঁছে দেওয়া এটা আমি ভাবিনি। হেসে বললাম, 'অতখানি মাছ বেচারা কতদিনে খাবে ? বড় চিংড়ি দু'চারটে পেলে নাহয় নিয়ে যাওয়া যেত।'

'বঁড়শিতে তো চিংড়ি ওঠে না বাবু।'

আমি আকাশের দিকে মুখ তুললাম। সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। বললাম, 'চল, এবার ফেরা যাক।'

'এত তাড়াতাড়ি ? আপনি তো সমুদ্রের কিছুই দেখলেন না।'

'এই তো দেখছি— আমার চারপাশে জল আর জল।'

'এটা তো নৌকোয় বসে দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের নিচে নামলে কত কি দেখতে পাবেন। ওহো, আপনি তো আবার সাঁতার জানেন না।' সুজন সুতো গোটাচ্ছিল।

আমি কিছু বললাম না। দুটো সি-গাল আমাদের মাথার ওপর পাক খাচ্ছে। নিশ্চয়ই মাছটাকে জল থেকে তুলতে দেখেছে ওরা। সুজন যা বলল তা আর একটু হলেই প্রায় দার্শনিকের মত শোনাতো। আমি লেখক হিসেবে জীবনের ওপরের গল্প শুনিয়ে যাচ্ছি একের পর এক। ডুবুরির মত জীবনের গভীরে ঢুকে মুক্তো খুঁজে এনে পাঠকদের দেবার ক্ষমতা নেই আমার। লেখার ব্যাপারে হয়তো একটু-আধটু সাঁতার যাকে বলা হয় তা আমি জানি কিন্তু সেই বিদ্যে দিয়ে ডোবা বা পুকুরে এপার ওপার করা যায়, সমুদ্রে নয়।

দেখলাম সুজন আবার দাঁড় তুলে নিয়েছে হাতে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা আর কতদূরে মাছ ধরতে যাও ?'

সে হাত তুলল। দূর বহুদূর দেখাল। যেন অস্ট্রেলিয়া থেকে মাছ ধরে নিয়ে আসে রোজ রাত্রে এমন ভাব! ছেলেটাকে বালির ওপর যেরকম মনে হত জলে এসে ঠিক তেমন বোধ হচ্ছে না। এখানে ও যেন বেশী বোদ্ধা, বেশী পাকা। কথা বলছে আমাকে বালকজ্ঞান করে। আমার ওপর ওর রাগ ছিল। সেই রাগের টানে ইচ্ছে করলেই ও আমাকে জলে ফেলে দিতে পারে। আমি যদি এখানে তলিয়ে যাই, তাহলে পুলিশ ওর কোন ক্ষতি করবে না। জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেবে। কাগজে বের হবে সমুদ্রে প্রখ্যাত লেখকের সলিলসমাধি। অবশ্য প্রখ্যাত শব্দটি ব্যবহার করা হবে কিনা সেটা নির্ভর করবে কোন্ সাংবাদিক খবরটা লিখছেন, কোন্ নিউজ এডিটার তখন ডিউটিতে থাকছেন তার ওপর। আমাকে যাঁরা লেখক বলে মনে করেন না তাঁরা শর্টকাটে খবরটা ছাপবেন। স্বপ্নেন্দুর কথা মনে পড়ল। খুব

ভাল গান গাইত স্বপ্নেন্দু। আধুনিক-রবীন্দ্রসঙ্গীত। স্বপ্ন ছিল বড় শিল্পী হবার। হয়নি। জীবন যেমন অনেককেই কিছুই হতে দেয় না। স্বপ্নেন্দু এখন ফুড ডিপার্টমেন্টে ইন্সপেক্টার। শেষ দেখা হতে বলেছিল, 'নাঃ, আর গাই না।'

'নিজের জন্যে তো গাইতে পারিস?'

'দূর! তোর কথা আলাদা। তুই মরলে খবরের কাগজে নাম ছাপা হবে।'

আমার কাছে বাক্যটিকে ঈর্ষাপ্রসূত বলে মনে হয়নি।

নৌকো এগিয়ে যাচ্ছিল। সূর্য ঢলছে। আমরা এখন সূর্যের দিকে চলেছি। সুজনের মুখ গম্ভীর। হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করেছে সে। যদি সূর্য পশ্চিমদিকে অস্ত যায় এবং সেটা যদি আমার বাড়ির পেছন দিক হয় তাহলে আমরা ঠিক নিশানায় চলেছি।

হঠাৎ সুজন কথা বলল, 'বাবু!'

'বলো।'

'আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'কি বিষয়ে?' জেনেশুনে না জানার ভান করলাম।

'এই যে—। মানে, আমাকে যদি বিয়ে করে—।'

এই মুহূর্তে কি আমি ওর অনুরোধ অস্বীকার করতে পারি? তবু বললাম, 'তুমি নিজে বলেছ ও শোনেনি, আমার কথায় কাজ হবে?'

হঠাৎই পাল্টে গেল সুজন, 'তা অবশ্য। ওই মেয়েছেলে কারও কথা শুনে চলে না।'

আমি রাধাকে দেখছি মাত্র দুদিন। কিন্তু সুজনের মন্তব্য শুনে মনে হল, যা দেখেছি তার থেকে আরও কঠোর চরিত্রের মানুষ রাধা। তাই যদি হয় তবে ওর নামে দুর্নাম রটেছে কেন? সেটা কি সে নিজের ইচ্ছেমত করেছে?

বললাম, 'ওসব চিন্তা ছাড়ো। পৃথিবীতে অনেক সুন্দর মেয়ে আছে, তাদের কাউকে পছন্দ করে সংসার করো। বুঝলে?'

'তা হয় না।'

'তুমি জেদ ধরছ।'

'ও মেয়েছেলের বিকল্প পাবো না বাবু।'

'দূর! তা কি হয়? অনেক ভাল মেয়ে পাবে।'

'থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো জানার সুযোগ পাব না। কোন মেয়ে তো বিয়ের আগে আমার সামনে বস্ত্রহীন হবে না?' সুজন জানাল।

'আশ্চর্য! তা কি কেউ হয়?'

'সেকথাই তো বলছি। কেউ হবে না। অথচ আমি যখন বেশ ছোট তখন রাধাকে বস্ত্রহীন অবস্থায় একঝলক দেখেছিলাম। বাড়িতে কেউ ছিল না। ভেতরের দাওয়ায় স্নান করে জামাকাপড় পরছিল। সেই দৃশ্য এখনও আমার মনে আঁকা আছে। কাঞ্চনবর্ণ অগ্নি পাক দিয়ে ওপরে উঠছে। কাউকে একথা বলিনি আমি। আপনাকে বললাম। রাধাও জানে না। আপনি লেখক মানুষ, নিশ্চয়ই বুঝবেন। আর একজনের ওরকম

ছবি না পেলে এটাকে মন থেকে মোছা সম্ভব? বলুন বাবু?' শেষের দিকে ওর গলার স্বর করুণ হল, না বাতাসের দাপটে নরম হল জানি না। কিন্তু আমি আর কথা বললাম না। একটি বালক অথবা কিশোরের মনে এরকম একটা দৃশ্য কি স্মৃতি সেঁটে দেয় তা আমি জানি। বাল্যকালে মন বড় চটচটে হয়।

'বাবু, সাবধানে বসুন।'

আমি চকিতে সামনে তাকালাম। মনে হল কয়েক ডজন হাতি পাশাপাশি দৌড়ে যাচ্ছে। তাদের ওপাশে কি আছে দেখতে পাচ্ছি না। স্রোতের টানে আমাদের নৌকো সোঁ সোঁ করে হাতিদের মাথায় চড়ে বসল। আকাশ যেন হাতের মুঠোয়। আমি চোখ বন্ধ করলাম। করতেই শরীরের সব রক্ত পায়ে নেমে যাচ্ছিল। নৌকোটা সোজা নিচের দিকে নামছে। এইবার সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাব আমি। নোনাজলের কিলবিলে ঢেউ আমার নাকে মুখে চোখে। তারপরেই আবার বাতাস। আবার আকাশের গায়ে উঠে বসা। তিন-চারবার এই খেলা চলল। আমার শরীর তখন প্রায় অসাড়। হাত অবশ্য শক্ত করে নৌকোর প্রান্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে।

'কাল ঝড় হয়েছিল বলে সমুদ্র আজ ঢেউ তুলছে।'

সুজনের স্পষ্ট গলা কানে আসতেই চোখ খুললাম। আমার বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। ওই তো তীর। আমরা যেন মন্ত্রবলে পৌঁছে গিয়েছি। এখন যে ঢেউ তা একটুও মারাত্মক নয়। তীরের কাছে পৌঁছে সুজন নেমে পড়ল নৌকো থেকে। প্রায় বুকজলে দাঁড়িয়ে নৌকো ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল তীরের দিকে। আমারও নামা উচিত। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি খারাপ হলে আমিও নেমে পড়ে ড্রাইভারের সঙ্গে ঠেলার কাজে হাত লাগাতাম। উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম সমস্ত শরীরে ঝিঁঝি ধরেছে। পা-দুটো অবশ। হাঁটু সোজা করতেই আরাম হল। নৌকো ততক্ষণে উঠে পড়েছে বালির ওপর। এখন আমার দুপাশে জল নেই। হাত বাড়ালে বালির স্পর্শ পাব। মুঠো খুললাম। বাঁ হাতের চেটোয় জ্বালা। দেখলাম ফোসকা পড়ে গেছে এর মধ্যে। কোনমতে বালিতে নেমে দাঁড়ালাম। সুজন বলল, 'আজ আপনার বেশ কষ্ট হল বাবু। কিন্তু সমুদ্র যেদিন শান্ত থাকবে সেদিন মনে হবে যেন বাগানে বেড়াচ্ছেন। শরীর ঠিক আছে তো বাবু?'

'ঠিক আছে।'

'আপনি একা যেতে পারবেন?'

'কেন পারব না? চলি।'

আমি হাঁটতে শুরু করলাম। শরীরটাকে টানতে লাগলাম বলাই ভাল। মনে হচ্ছিল নিজের ভার নিজেই বয়ে নিয়ে চলেছি। বাইশে যা সম্ভব তা পঞ্চাশে যে অসম্ভবের পর্যায়ে চলে যায় এ কথা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। তবু যদি অভ্যেস থাকতো তাহলে আলাদা কথা। এই যে আমি হাঁটছি, শরীর ঝিমঝিম করছে, হয়তো প্রেসার বেড়েছে। কিছুদিন আগে হলেও প্রেসার নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করতাম না আমি। আজকাল করতে বাধ্য হই।

অনেকটা চলে আসার পর সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালাম। চোখের নাগালের মধ্যে কেউ নেই। বহুদূরে সুজনের নৌকো বালির ওপর পড়ে আছে। সে নেই। এখনো রোদ আছে আকাশে। শেষ বিকেলের রোদ। নরম নরম। বালিতে বসলাম, পায়ের গোড়ালিতে ঢেউ-এর প্রান্ত নিয়ে। বারংবার উঠে এসে গোড়ালি ভিজিয়ে ফিরে ফিরে যাচ্ছে। আঃ, কি আরাম! পায়ের তলায় মাটি না পেলে মানুষ নিরাপদ থাকে না, নিদেনপক্ষে বালি। কিন্তু যে জল ছাড়া মানুষ মৃত তাকে পায়ের তলায় পাওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। হঠাৎ খেয়াল হল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধিক্কার দিলাম। আমার এই অভিযানের আগে অথবা মধ্যে একটিবারও কথাটা মাথায় আসেনি। সুজনের সঙ্গে নৌকোয় বসে থাকার সময় কেন যে সেই জলপ্রাণীটির কথা মনে আসেনি তাই এখন আমি বুঝতে পারছি না। মনে এলে কাছাকাছি গিয়ে ওটাকে দেখার চেষ্টা করতাম। আমার টিলার ওপর বাড়ির ব্যালকনি থেকে যে স্থির জলে ওকে আসতে দেখি সেখানে নিশ্চয়ই নৌকো নিয়ে পৌঁছাতে অসুবিধে হত না সুজনের। খুব আফসোস হচ্ছিল আমার। এমনও হতে পারে, এই ঢেউ-এর দঙ্গলের বাইরে শান্ত সমুদ্রে আমরা যখন বসেছিলাম তখন সেই জলপ্রাণীটি আমাকে লক্ষ্য করেছে, হয়তো পাশ দিয়ে চলে গেছে, কিন্তু আমি নজর করিনি। তখন আমি আকাশ, দিগন্ত দেখার চেষ্টা করেছি, সুজনের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছি। আর সেই ছায়া আমাদের নৌকোর নিচ দিয়ে হয়তো মন্থরগতিতে চলে গিয়েছে।

ক্রমশ বাতাস ঠাণ্ডা হতে শুরু করল। ভেজা গেঞ্জি শার্ট এবং প্যান্ট এখন রঙ বদলে শরীরে প্রায় শুকিয়েছে। উঠে পড়লাম। হাতেপায়ে বেশ ব্যথা। হাতের ফোসকা টসটসে বড়। দু'তিনদিন ভোগাবে। ভাগ্যিস বাঁ হাতে! আশ্চর্য, আমরা নিজেরাই একটি হাতকে জ্ঞান হবার পর থেকে গুরুত্ব দিয়ে দিয়ে আলাদা করে ফেলেছি। অন্য হাতটি যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। মানুষ শুধু সম্পর্কের ক্ষেত্রেই স্বার্থপর নয়, নিজের শরীরের ক্ষেত্রেও অজান্তেই একই কাজ করে ফেলে।

রাধা দাঁড়িয়েছিল ব্যালকনিতে, আমাকে দেখে দৌড়ে নিচে নেমে এল, 'কি হয়েছে?'

ওর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম, 'সমুদ্র দেখে এলাম।'

'কিন্তু আপনার কি শরীর খারাপ?'

'না তো।' আমি ওর পাশ কাটিয়ে সিঁড়িতে পা রাখলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম চেহারাটি মোটেই সুস্থ দেখাচ্ছে না। সমুদ্রের জলে পোশাক রঙ পাল্টেছে। রোদ এবং নুনে মুখের খোলতাই চমৎকার। সোজা বাথরুমে ঢুকে গেলাম। অনেকক্ষণ স্নান করে পরিষ্কার হয়ে তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম বাঁ হাত নাড়তে পারছি না ফোস্কার জন্যে। চামড়া টানটান হওয়ায় ব্যথা বাড়ছে। পাজামা পাঞ্জাবি পরে চুল আঁচড়াতেই রাধা চা আর বিস্কুট নিয়ে এল। দুপুরে খাওয়া হয়নি কিন্তু এখন খিদে পাচ্ছে না একটুও। বরং বিছানায় হাত পা মেললে ভাল লাগে। চা অমৃত বলে মনে হল। রাধা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের একপাশে। দুচোখ দিয়ে যেন

আমাকে পড়তে চেষ্টা করছে। আমি কোন কথা বললাম না। কথা বললেই মেয়েটার কথা বলার প্রবণতা বেড়ে যায়। চায়ের কাপ শেষ করে নামিয়ে রাখতেই রাধা জিজ্ঞাসা করল, 'এখন তো ভাত খাবেন না। অন্য কিছু তৈরী করে দেব?'

'নাঃ। এখন খিদে নেই।'

'অনেকক্ষণ খাননি!'

'ঠিক আছে।'

'কোন অসুবিধে হয়েছিল?'

'অসুবিধে কেন হবে? দিব্যি বেড়িয়ে এলাম।' কথাটা বলে ওর দিকে তাকাতেই দেখলাম মুখ নরম হয়েছে। বলল, 'আপনি যেভাবে হেঁটে আসছিলেন মনে হয়েছিল খুব শরীর খারাপ হয়েছে। অভ্যেস নেই তো!'

'তা নেই।'

এখন বাইরে বিকেলের ছায়া ঘন হচ্ছে। এখনই শুয়ে পড়াটা ঠিক নয়। হয়তো মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। বললাম, 'তোমার কাজ হয়ে গেলে চলে যেতে পার।'

মাথা নিচু করে সরে গেল রাধা। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সুজনের কথা ভাবলাম। রাধাকে কি আমি বলেকয়ে রাজী করাতে পারব? কি বলব? সুজন যে ওকে খুব ভালবাসে তা রাধার জানা ঘটনা। আমি বললে আর কতটা বেশী গুরুত্ব বাড়বে? তাছাড়া এসব ব্যাপারে আমার নাক গলানোর কোন যুক্তি নেই। আমি এতদূরে একা থাকতে এসেছি, অন্য কারো সমস্যায় আমার কেন ভূমিকা থাকবে? চোখ বন্ধ করলাম। না, ঘুম আসছে না। শুধুই ক্লান্তি। বেশী পরিশ্রম হলে আমি ঘুমোতে পারি না। হঠাৎ সুজনের বর্ণনাটা মনে পড়ে। কবে কোন্ বালকবয়সে সে রাধাকে স্নানের পর এক ঝলক দেখেছিল---সেই স্মৃতি এখনও ওকে রোমাঞ্চিত করে, এখনও তার টানে ওর প্রেম সোচ্চার। সেই দৃশ্য কি আমি জানি না। এখনকার বয়সী রাধাকে দেখে আমার পক্ষে তা অনুমান করাও অশোভন। আমি টিভি খুললাম।

খেলা হচ্ছে। ভারতবর্ষের বাইরে মেয়েদের বাস্কেটবলের কোন টুর্নামেন্ট দেখাচ্ছে টিভিতে। সাদা কালো আগুনের মত চেহারার মেয়েরা একটা বলের পেছনে ছোটাছুটি করছে। প্রতিটি মেয়েই বেশ লম্বা এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। প্রত্যেকেই প্রচণ্ড ফিট। শরীর নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছে। প্রত্যেকেরই পোশাক খেলার জন্যেই সংক্ষিপ্ত। বালকবয়সে কি সুজন রাধাকে এদের চেয়ে সুন্দরী বলে মনে করেছিল? সুজন কি টিভিতে এইসব মেয়েদের দ্যাখে না? গ্রামে একটি বা দুটি এ্যান্টেনা রয়েছে, আমার চোখে পড়েছিল। তাহলে? আমি মেয়েদের দিকে তাকালাম। সবচেয়ে যাকে আকর্ষণীয়া তাকে লক্ষ্য করলাম। মেয়েটা যেভাবে দৌড়ে লাফিয়ে বলটাকে নেট করার চেষ্টা করে সফল হল তাতে মুগ্ধ হতেই হয়, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। ওর সংক্ষিপ্ত পোশাক সরিয়ে নিয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করতে গিয়ে হোঁচট খেলাম। ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর। আমার মনে কোন আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে না। যার অনেকটাই প্রকাশ্য তার সম্পর্কে কোন গোপন কামনা হামাগুড়ি দেয় না। যার পুরোটাই অন্তরালে

সেই শুধু বারংবার টান মারে মনের তন্ত্রীগুলো। আমি আজ অবধি সেই মহিলাকে ভুলতে পারিনি যে আংরাভাসার ঘাটে সায়া বুকে বেঁধে স্নান করছিল। আমি তখন বালক। মাছ ধরার নেশায় গিয়েছি। আমাকে দেখিয়ে তার সঙ্গিনী মহিলাকে সতর্ক করতে চেয়েছিল। মহিলাটি আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে শব্দ করে হেসেছিল। তারপর গলা তুলে নিজের ভাষায় প্রশ্ন করেছিল, 'এই ছোঁউযা, তোর গোঁফ উঠেছে?'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নেড়ে না বলেছিলাম।

মহিলা তার সঙ্গিনীকে বাঁকা গলায় জানিয়েছিল, 'গোঁফই ওঠেনি।'

অর্থাৎ আমি একটি গাছ পাথর অথবা পাখির মত নিরীহ। সেই বয়সে খুব আঘাত পেয়েছিলাম ওই অবহেলায়। কেন আমার গোঁফ ওঠেনি, কবে আমার গোঁফ উঠবে এই দুশ্চিন্তায় কটা দিন কাতর ছিলাম। কিন্তু তারপর এই এতদিন ধরে আমার মন সেই মহিলার মুখ মনে রেখে দিয়েছে। মুখ এবং মুখের সেই তাচ্ছিল্যের হাসি। অতএব সুজনের পক্ষে দৃশ্যটি ভোলা সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে বয়সের ব্যবধান সে মানতে চাইছে না। আমাদের পরিচিত অনেকেই তো তাদের স্ত্রীর চেযে বয়সে ছোট।

শীত-শীত করছিল। আমার কি জ্বর আসছে? সিগারেট ধরালে বুঝতে পারতাম শরীর অসুস্থ কিনা। স্বাদ বলে দিত। আশ্চর্য! নিজের শরীর নিজে বুঝতে পার না। সিগারেট খেয়ে বুঝতে হবে? এরকম কথা তো কয়েকবার শুনতে হয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে হাতে মলম লাগালাম। ফোসকার ওপর মলম। ঠিক কি লাগালে কাজ দেবে জানি না। ফুটো করে জল বের করে দিলে ভাল হত। ছেলেবেলায় তাই করতাম। একটা ক্যালপল খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। টিভিতে এখন খেলার পরে হেমন্তের পুরোন রেকর্ড করা অনুষ্ঠান দেখাচ্ছে। 'এই কথাটি মনে রেখো।'

গানটা শুনলেই আমার কেমন যেন খারা লাগা তৈরী হয়। রবীন্দ্রনাথ গানটা না লিখলেই পারতেন। ওরকম অনুনয় করে মনে রাখতে বলার মধ্যে একধরনের দীনতা ধরা পড়ে। আমি এই করেছিলাম, আমি তাই করেছিলাম, আমি ভাঙ্গা ভেলায ভেসেছিলাম—অতএব তুমি আমাকে মনে রেখো। যে মনে রাখবে সে যদি মনে রাখার মত কিছু পায় তবেই রাখবে। তাকে বারংবার বলে মনে করিয়ে দিতে হবে না। বাঙালি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ দাপটে তাদের মনে থাকবে। এর জন্যে আবার অনুরোধ করতে হবে কেন? হঠাৎ আর একটি চিন্তা মাথায় এল। এটা একধরণের পরিহাস নয় তো? যাঁরা সত্যিকারের পণ্ডিত তাঁরা যেমন বিনয় করেন কিছুই জানি না বলে, যাঁরা ধনী অথচ বুদ্ধিমান তাঁরা যেমন নিজেদের প্রকাশ করেন না, তেমনি রবীন্দ্রনাথের এ এক পরিহাস ছিল সমস্ত বাঙালি জাতির কাছে! যাঁকে মনে রাখতে বাধ্য তিনি বিনীত গলায় বলছেন, মনে রেখো!

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ গভীর জলের নিচ থেকে হু-হু করে ওপরে উঠে আসতেই চোখ খুললাম। ঘরের আলো নেভানো, টিভি বন্ধ। অবশ্য এগুলোর কথা প্রথমে আমার মাথায় আসেনি। চোখ মেলে মনে হয়েছিল মধ্যরাত এবং আমি

স্বাভাবিক ভাবেই ঘুমাচ্ছি। তারপরেই মাথার যন্ত্রণাটা টের পেলাম। সারা শরীরে ব্যথা এবং জ্বরো ভাব। ডানদিকের জানলার বাইরে আকাশ জ্বলজ্বল করছে। উঠে বসলাম। হাত বাড়িয়ে বেডসুইচ টিপতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল আলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম ঘরের কোণায় একটা মোড়ার ওপর রাধা চুপচাপ বসে আছে। তার চোখ আমার দিকে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'খেতে দেব ?'

আমি ঘড়ি দেখলাম। এখন রাত এগারটা বেজে দশ মিনিট। যাচ্চলে! এতক্ষণ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ? জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি বাড়ি যাওনি কেন ?'

'আপনি ঘুমোচ্ছিলেন!'

'আঃ, ডাকতে অসুবিধে কি হয়েছিল ?'

'আপনার জ্বর এসেছে।'

'তুমি কি করে বুঝলে ?'

'বুঝলাম।'

'খুব অন্যায় করেছ। যাও, আর দেরি করো না।'

'আমি এত রাত্রে একা যাব কি করে ?'

ওর মুখের দিকে তাকালাম। না, কোন অভিসন্ধির চিহ্ন নেই। কথাটাকে অস্বীকার করতে পারছি না আমি। এই রাত্রে একা কোন মহিলার পক্ষে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে গ্রামে ফিরে যাওয়ায় দু'ধরনের অসুবিধে। ও আক্রান্ত হতে পারে অথবা গ্রামের লোকেরা ওকে দেখে আর একটা বদনাম তৈরী করে দেবে।

বললাম, 'কিন্তু এখানে থাকলে লোকে কি ভাববে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ?'

'ভাবুক। আমাকে নিয়ে সবাই অনেকে ভেবেছে।'

'কিন্তু আমি চাই না তুমি থাকো। চল, আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।'

'আপনি এই শরীর নিয়ে হাঁটবেন ?'

'এমন কিছু খারাপ হয়নি শরীর। ক্লান্ত ছিলাম আর জলে ভিজে জ্বর এসেছে। কাল সকালেই ঠিক হয়ে যাব। চল।'

'আপনার সঙ্গে এখন আমাকে দেখলে কেউ বদনাম দেবে না ?' রাধা উঠে দাঁড়াল, 'আগে খেয়ে নিন, তারপর ঠিক করবেন যাবেন কিনা।'

আমি বসে রইলাম। নিজেকে একরকম জড়ভরত বলে মনে হচ্ছিল। হঠাৎ মনে প্রশ্ন এল, আমি ওকে সরিয়ে দিতে চাইছি কেন ? রাধা যদি আমার কাছে শুধুই একজন কাজের মানুষ হিসেবে গৃহীত হয়, তাহলে সে এখানে থাকল কি চলে গেল তা নিয়ে এত ভাবনা কেন আসবে ? সে একজন নারী বলেই আমি ওকে সরিয়ে দিতে চাইছি ? সারাদিন কোন নারী আমার সঙ্গে এই নির্জন বাড়িতে থাকলে আমি চরিত্রহীন হব না, রাত নামলেই সেটা বাস্তব হবে ? কোন কিছু না করে, মনে বিন্দুমাত্র কুচিন্তা না এনেও ফাল্গুনীর স্বামী আমাকে ব্ল্যাকমেল করে গেছে। আমি কি করতে পারলাম ? এত রাত্রে রাধা আমার বাড়ি থেকে যখন ফিরে যাবে তখন সে সতী হয়ে ফিরছে এই বিশ্বাস আমি কি জনে জনে করাতে পারি ?

খাওয়া-দাওয়ায় মন ছিল না। জিভও বিস্বাদ ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করবে?'

সে জবাব দিল, 'যা বলবেন!'

'তুমি ফিরে না গেলে কেউ দুশ্চিন্তা করবে না?'

হাসল রাধা। এরকম হাসি তারাশঙ্করের চরিত্রকে হাসতে দেখেছি।

বললাম, 'যা ভাল বোঝ কর। আমি শুয়ে পড়ছি।'

চাদর টেনে বিছানায় শুয়ে বেডসুইচ অফ্ করলাম। রাধা বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে। একবার ভাবলাম দরজাটা বন্ধ করে দিই। নিজের দুর্বলতায় নিজেই হেসে ফেললাম। হয়তো অসুস্থতাই আমাকে সাহায্য করল। কখন ঘুম এল আমি নিজেই জানি না। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন শেষরাত। বুঝতে পারলাম ওষুধে কাজ হয়েছে। শরীর এখন বেশ হালকা। পাশ ফিরতেই রাধার কথা মনে এল। কোথায় কোন্ ঘরে ঘুমিয়েছে সে কে জানে! চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ চোখের পাতায় সুজনের বর্ণনা ভেসে উঠল। কিশোর বা বালক বয়সে যে দৃশ্য দেখে এখনও স্মৃতি বহন করছে সেই দৃশ্যটি ঝাপসা হয়ে সামনে এল। বেশ মজা লাগছিল। এখন যে মেয়েটি এই বাড়ির কোন এক জায়গায় শুয়ে রয়েছে সে আমার কাজের লোক। মধ্যবয়সিনী এক বিধবা। আর আমি একজন সুস্থচিন্তার মানুষ হিসেবে তার বিবস্ত্র-বর্ণনাকে বাস্তবে ধরার চেষ্টা করছি! নিজেকে পুরুষ এবং তাকে প্রকৃতি হিসেবে ভাবার কোন কারণ নেই! আমার জীবনে নারী এসেছে বহুবার। তাদের অনেক রকমের রূপ দেখেছি। মহিলা দেখলেই তাদের সঙ্গে শয়ন করার বাসনা আমার কোনকালেই ছিল না। আর এখন রুচি, শিক্ষা, মানসিকতার মিল না হলে আমার কাছে কোনো নারী আকর্ষণীয়া হয়ে ওঠে না। আমার স্ত্রী জানেন পৃথিবীর অন্যতম সুন্দরী নারী যদি আমাকে আহ্বান করেন এবং তাঁকে যদি আমার মন গ্রহণ না করে তাহলে আমার শরীর বিরূপ হবে। জীবনে অনেকবার এই সত্যর মুখোমুখি হয়েছি।

তা সত্ত্বেও আমি রাধার চেহারাটাকে সুজনের বর্ণনা অনুযায়ী কেন ভাবতে চেষ্টা করলাম? তার মানে আমি কি মানসিক অসুস্থ? এইসব ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে গেল। বিছানায় থাকতে পারলাম না। চুপচাপ দরজা খুলে নেমে এলাম বালিতে। সমুদ্র এখন অনেকটা উঠে এসেছে। এবার তার নেমে যাওয়ার সময়। ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে অবিরত। পৃথিবীর বুকে একটা হাল্কা হিম আধার ছড়িয়ে। জলে হাত দিলাম। ঠাণ্ডা। এই জল জিভে দেওয়া যায় না। মানুষের জীবনেও এমন পরিস্থিতি কখনও না কখনও আসবেই। সময় যখন একের পর এক আঁচড় কেটে কেটে সাধের জিনিষগুলো তুলে নিয়ে সামনেই সরিয়ে রাখে তখন মানুষ সেগুলো চেয়ে দ্যাখে, গ্রহণ করতে পারে না। বিশাল ধনী অথচ হৃদ্‌রোগী একজনকে দেখেছিলাম। ইচ্ছে করলেই পৃথিবীর সব সুখ কিনে নিতে পারেন। কিন্তু সেগুলোর একটাকেও ভোগ করার সামর্থ্য তাঁর শরীরের নেই। সব সুখ তার কাছে সমুদ্রের জলের মত নুনময় হয়ে গিয়েছে।

শুধু শরীর বিকল হলেই যে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় তাও তো নয়। আমার এই পঞ্চাশ বছরের শরীরটার কোথাও মরচে পড়েনি। অথচ আমি এক জীবনে তিন জীবন বেঁচে ফেলেছি। সেই কারণেই এক অদ্ভুত নিরাসক্তি আমাকে আক্রমণ করে প্রায়শই। এ কারণে আজকাল একা থাকতে মন্দ লাগে না। এই নিরাসক্তি আমাকে ঈশ্বরমুখী করছে না, কোনদিন তথাকথিত সন্ন্যাসী হতে পারব না আমি। এ নিজেকে নিজের কাছ থেকেই সরিয়ে রাখা।

'বাবু, চা ওখানে নিয়ে যাব ?'

চিৎকারটা কানে যেতেই ঘাড় ঘোরালাম। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে রাধা।

আজ থেকে দশ বছর আগে হলেও ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললাম। বাড়ির বাইরে সমুদ্রের গায়ে বালির ওপর বসে চা খেতে কার না ভাল লাগে। কিন্তু আজ কিছুই জবাব না দিয়ে চুপচাপ ফিরে এলাম। বসার ঘরে আমাকে চা দিয়ে রাধা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন বাবু ?'

'ভাল।'

'কাল রাত্রে আর জ্বর আসেনি।'

আমি মুখ তুললাম। তার মানে গতরাতে আমার ঘুমের সময়ে ও ঘরে ঢুকেছিল। বললাম, 'কাজটা ঠিক করোনি।'

'কেন ?'

'প্রথমত তোমার এ বাড়িতে থাকা নিয়ে আমার অস্বস্তি আছে। তার ওপর রাতদুপুরে আমার জ্বর এসেছে কিনা জানতে ঘরে ঢুকলে তো কথাই নেই।'

'আমি কি কোন অন্যায় করেছি ?'

'দ্যাখো, রাধা, তুমি ছেলেমানুষ নও !'

শব্দ করে হাসল রাধা, 'বুড়ী হতে চললাম।'

'তাহলে নিশ্চয়ই বোঝ, ব্যাপারটা লোকে কি চোখে-দেখবে ?'

'লোকে দেখবে কি করে ? আর আমি যদি নাও যেতাম, রান্নাঘরেই শুয়ে থাকতাম তাহলে যে বিশ্বাস করবে না তাকে কি করে বোঝাব সত্যি আমি আপনার ঘরে যাইনি ! না বাবু, কে কি বলছে তা মেনে চললে আমাকে অনেক আগে—।' কথাটা শেষ করল না সে।

আমি চুপচাপ চা খেলাম। আমার অসুস্থতার সময় কেউ অগোচরে সাহায্য করছে জানলে কার না ভাল লাগে। তবু কি যেন একটা খচখচ করছিল। রাধা আমার এখানে এসে কখনই অসভ্যতা করেনি, বরং ঘরোয়া ব্যবহার করছে। আমি সেই ব্যবহারটা নিতে পারছি না, এটা ওর দোষ নয়।

'বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?'

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

'আপনি কি আমাকে পছন্দ করেন না ?' ওর ঠোঁটের কোণে ভাঁজ পড়ল।

'কি আশ্চর্য! অপছন্দ করলে তোমার সঙ্গে এত কথা বলতাম?'

হেসে উঠল রাধা। কোন মন্তব্য করল না। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, 'টাকা দিন। অনেকগুলো জিনিষ শেষ হয়ে গেছে, নিয়ে আসতে হবে।'

ফাল্গুনীকে টাকা নিয়ে নিতে বলতাম ড্রয়ার থেকে। রাধাকে নিজের হাতে টাকা দিলাম। বেরুবার আগে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কিছু লাগবে?'

'না।'

রাধা চলে গেল। আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। যে মাছটার থাকার কথা সেখানে সূর্যের প্রখর রোদ পড়ায় চকচক করছে। ওপরে আলো বেশী থাকলে নিচের ছায়া দেখা যায় না। মাছটা কি চিরকাল আমার কাছে ছায়া হয়ে থাকবে? কোনদিন ওর শরীরটাকে দেখতে পাব না? এখন এই মুহূর্তে মাছটা ওখানে আছে কিনা আমি জানি না। গতকাল সমুদ্রে ঘোরার সময় ওর কথা মনে আসেনি। এলে সুজনকে বলতাম ওই জায়গা দিয়ে তীরে ফিরে আসতে। এটাও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যাকে নিয়ে সবসময় ভাবি, ঠিক সময়ে তার কথা মন মনে করে না।

ঠিক করলাম আমাকে একটা নৌকো কিনতে হবে। মোটর লাগানো বোট হলে চালাতে কোন অসুবিধে নেই। ওই ঢেউগুলোকে সামলে, অবশ্য সমুদ্র যখন শান্ত থাকবে, স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারব গভীরে। তীর থেকে দূরে চলে গেলে সমুদ্র যেরকম শান্ত থাকে তাতে আরামসে ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে। মাছটাকে দেখার ইচ্ছেও আমার এইভাবে মিটে যেতে পারে। আচ্ছা, আমি ওকে মাছ ভাবছি কেন? কলকাতা থেকে সামুদ্রিক প্রাণীর ওপর লেখা বই আনাতে হবে।

বাজার নিয়ে রাধা ফিরে এল নটার মধ্যে। শরৎবাবু ওর হাতে আমার নামে আসা চিঠি পাঠিয়েছেন। দুটো চিঠি। আমার এক নম্বর পাবলিশার্স জানিয়েছেন যে হঠাৎই তিনখানা বই-এর বিক্রী বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে সেই বইগুলোর চাহিদা হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করতে হচ্ছে। আমার নতুন উপন্যাসের খবর জানতে চেয়েছেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চিঠির শেষ লাইনটি হল, 'আপনার নির্দেশমত মিসেসকে প্রতিমাসে টাকা দেওয়ার পর প্রচুর জমে যাচ্ছে। দয়া করে ওগুলো নিয়ে আমাকে উদ্ধার করুন।'

আমি হাসলাম। এই উদ্ধার চাওয়া ততদিনই চলবে যতদিন আমার বই বিক্রি করে উনি লাভ করতে পারবেন। বিক্রি পড়ে এলেই সব হিসেবে গোলমাল দেখা দেবে। আমি আর এসব নিয়ে ভাবতে চাই না। তবে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, আমার এই প্রকাশকমশাই কলেজ স্ট্রীটে এখনও সৎ থাকার চেষ্টা করছেন বলেই আমি জানি। বই-এর ব্যবসায় লেখক এবং প্রকাশক পার্টনার। অথচ সেই ব্যবসার পুরোটাই প্রকাশকের হাতের মধ্যে। তিনি পার্টনার লেখককে যা জানাবেন তাই লেখক মেনে নিতে বাধ্য।

দ্বিতীয় চিঠিটি আমার স্ত্রীর। আমি আমার স্ত্রীর শেষ চিঠি কবে পেয়েছিলাম? মনে করার চেষ্টা করেও পারলাম না। বছর কুড়ি আগে? সেই যেবার আমেরিকায়

গিয়েছিলাম, সেবার? না, সেবার আমার চার বছরের ছেলে চিঠি লিখেছিল কাঁপা আঙ্গুলে। তার আগে? হ্যাঁ, ছেলে হবার পর ওকে যখন বাপের বাড়িতে রেখে ফিরে আসি তখন পরপর দুটো চিঠি পেয়েছিলাম। এতদিন পরে সেই চিঠিগুলোর ভাষা অথবা সম্বোধনের ব্যাপারটা মনে নেই। শুধু মনে হচ্ছে তিনি আর বাপের বাড়িতে থাকতে চাইছিলেন না।

খামটা খুললাম। সাদা কাগজের নিচের বাঁদিকে আমার নাম লেখা। পুরো নাম। সম্বোধন ছাড়াই শুরু হয়েছে এভাবে, 'আশা করি ভাল আছ। ভাল থাকার জন্যে তুমি এতদিন যেভাবে ছটফট করতে এখন নিশ্চয়ই তাতে শান্তি হয়েছে। ভয় নেই, তোমাকে তোমার শান্তি নষ্ট করতে এই চিঠি লিখছি না। আমি কয়েকটা ব্যাপার স্পষ্ট জানতে চাই। এক, তুমি কি ওখানেই পাকাপাকি থেকে যাবে? দুই, তোমার সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে আমরা বলি উনি অজ্ঞাতবাসে গেছেন, কারণ তুমি চাওনি বেশী লোক তোমাকে বিরক্ত করুক। আমরা আর কতদিন একথা বলব? এখন কি বলার সময় আসেনি যে উনি পাকাপাকি কলকাতার বাইরে থাকতে চলে গেছেন? তিন, সেটা বললে কিছু আইনকানুনের ব্যবস্থা করতে হয়। যেমন, ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট, ফ্ল্যাটের মালিকানা, ইনসিওরেন্স, ইউনিট ট্রাস্ট ইত্যাদির মালিকানা হস্তান্তর। তাছাড়া তুমি আর আসছ না জানলে কিছু প্রকাশক তো চিরকালের মত হাত গুটিয়ে নিতে পারেন, যদি আমাদের কাছে তোমার সই করা কাগজপত্র না থাকে। এসব পড়ে যদি তোমার ধারণা হয় আমি টাকাপয়সার লোভে বিরক্ত করছি তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আমাদের, মনে রেখো শব্দটা, আমাদের, অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। ভাল থেকো।' নিচে পুরো নামটি সই করা আছে।

আজ হোক কাল হোক এমন একটা চিঠি আসবে আমি জানতাম। চিঠির শুরুতেই যে শান্তির কথা বলা আছে, ওটার মধ্যে যে কেউ জ্বালা খুঁজে পাবে কিন্তু আমি পেলাম না। কারণ আমি ভাল করেই জানি আমরা দুজনেই যাকে বলি শান্তি তা কোথাও পাইনি। অথবা শান্তি বলতে ঠিক কি বোঝায় তা আমরা জানি না। এখানে আসার পর আমার কোন টেনশন নেই। এটা কি শান্তি? আমি চলে আসার পর তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে একা আছেন, হয়তো সেইরকম শান্তিতেই আছেন। উনি জানতেন বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আমি কোনদিন মাথা ঘামাইনি। কলকাতায় পা রেখেছিলাম ছাত্রবয়সে একটা টিনের স্যুটকেসে দুটো শার্ট, দুটো প্যান্ট আর বিছানার চাদর নিয়ে। যা কিছু উপার্জন তা আমি কলকাতায় থাকতেই করেছি। অতএব এখানে আসার সময় সেগুলো নিয়ে আসার প্রয়োজন বোধ করিনি। হ্যাঁ, আমি টাকা নিয়েছি প্রকাশকদের কাছে যাতে এই বাড়িটায় ভালভাবে থাকা যায়। সেই টাকা নেওয়ার ফলে ওঁদের ভাগে একটুও কম পড়বে না। এসব কথা ভদ্রমহিলা জানেন। তবু কেন এমন চিঠি? ঠিক করলাম, এ চিঠির কোন জবাব দেব না। ওঁদের যা ইচ্ছে হয় সেইমত করুক। ব্যাঙ্ক ইত্যাদির ব্যাপারে এখনই মাথা ঘামানোর দরকার কি? কত মানুষ হুট করে মারা যায়। তাঁদের পরিবার শেষ পর্যন্ত আইনমাফিক কর্তৃত্ব

আদায় করে তো নেয়! চিঠি ভাঁজ করতে করতে ছোট মেয়ের কথা মনে পড়ল। অনেকদিন বাদে মনে পড়ে। দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে ওকে আমার একসময় প্রিয়তম বলে মনে হত। ওর গায়ের গন্ধ না পেলে ঘুম হত না। ঈশ্বর মানুষকে সব কিছু ভোলার ক্ষমতা দিয়েছেন বলেই মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে আমি রাধাকে বললাম বাড়ি যেতে। গতকাল থেকে সে এখানে আছে, বিকেলের জন্যে অপেক্ষা না করে সে চলে যাক। রাতের খাবার ফ্রিজে রেখে গেলেই হবে, আমি গরম করে নেব।

সে আপত্তি করেছিল প্রথমে, তারপর আদেশ মান্য করল। সে যখন চলে যাচ্ছে তখন আমি জানলার পাশে বসেছিলাম। নরম বালিতে পা রেখে হাঁটতে মেয়েদের একটু অসুবিধে হয়, বিশেষ করে ভারী শরীরের মেয়েদের। পেছন থেকে রাধার শরীর দেখছিলাম। কাছে থাকলে যা অনেকসময় স্পষ্ট হয় না, ঈষৎ দূর থেকে তার অনেক রহস্য ধরা পড়ে। এভাবে দেখা অশোভন কিনা জানি না কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট হল কেন সুজন ওর জন্যে আকর্ষণ বোধ করে। রাধা এখন অনেকটা দূরে। ওর শরীরের ছন্দ আমি টের পাচ্ছি। পাশে স্ত্রী থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এই দেখার জন্যে আমাকে ভর্ৎসনা করতেন। কিন্তু কোনারকের মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছুই বলবেন না। সেগুলো যদি শিল্প হয়, তাহলে রাধার চলন হবে না কেন?

রাধা সম্বন্ধে লোকে খারাপ কথা বলে। আমি আজ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝলাম না। জীবনের কোন্‌টা খারাপ কোন্‌টা ভাল এই ধন্দ কাটল না এখনও। আমার বাবা মদ্যপান চরিত্রহীনের কাজ মনে করতেন। আমি সেটা পান করেও দেখছি চরিত্র ঠিকই আছে। আমার ঠাকুমা মাথায় ঘোমটা এবং গরমকালেও পাতলা চাদর শাড়ির ওপর না জড়িয়ে বেরুনোর কথা ভাবতে পারতেন না। আমার স্ত্রীকে সেটা করতে বললে তিনি আমাকে পাগল ভাববেন। একটি মেয়ে তার রিসার্চের কাজে আমার কাছে কিছুদিন এসেছিল। একদিন বলেই ফেলল, 'জানেন, আমি যখন প্রথম আসি তখন সবাই খুব ভয় দেখিয়েছিল।'

'কি রকম?'

'বলেছিল আপনি নাকি মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন।'

'তাই নাকি?'

'ভাগ্যিস ওদের কথা শুনি নি।'

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলিনি। তাহলে কিছু মানুষ মনে করে আমার চরিত্র বলে কিছু নেই। আর চরিত্র শব্দটি যে কি জিনিস তা আজও বুঝতে পারলাম না। অবশ্য যতটা কম বোঝা যায় ততই ভাল।

॥ ৯ ॥

কদিন খুব ঘোরাঘুরি করতে হল। একটা মোপেট চালাতে যখন লাইসেন্স দরকার হয় তখন মোটরবোটের জন্যে প্রয়োজন হবেই। বালেশ্বর-ভুবনেশ্বর ঘুরে অর্ডার দিয়ে এলাম। এই যে কদিন সমুদ্রের কাছ থেকে সরে যাওয়া, এ আমার মোটেই ভাল লাগেনি। দিনরাত ঢেউ-এর আওয়াজ আর হাওয়ার শব্দ এখন একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে। তবে শহরে গিয়ে কিছু ভাল মদ কিনে এনেছি আর দারুণ সব মাছ ধরার সামগ্রী। সেসব দেখে রাধা ঠোঁট টিপে হেসেছিল মাত্র, কোন কথা বলেনি। মেয়েটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। যাকে সবাই চরিত্রহীনা বলছে সে আমার সঙ্গে বিন্দুমাত্র বদ আচরণ করেনি।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আজ লিখতে বসলাম। আমার টেবিলের সামনেই জানলা। কাগজপত্র পেপারওয়েটের তলাতেও স্থির থাকে না। কিন্তু সমুদ্রের বাতাস মুখে মেখে লিখতে বেশ ভাল লাগে। উপন্যাসটাকে এগোতেই হবে। লেখার মধ্যে এমন মগ্ন ছিলাম যে টের পাইনি কেউ এসেছে। রাধার গলা কানে এল, 'বাবু এখন লিখছেন, দেখা করবেন না।'

আমি মুখ তুললাম, কে এল ? ঘড়িতে এখন সাড়ে চারটে। শরৎবাবুর গলা পেলাম, 'ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করছি।'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। ব্যালকনিতে শরৎবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। বললাম, 'আসুন।'

'না না, আপনি লিখুন। ডিস্টার্ব করলাম এসে।'

'আজ আর লিখতাম না। বসুন। চা খাবেন তো ?'

'না। আমি একটা দরকারে এসেছি।'

রাধা ভেতরে চলে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বলুন ?'

'একটি মেয়ে, কলকাতার মেয়ে, হঠাৎ এখানে বাস থেকে নেমে পড়েছিল। বেচারা ফেরার বাস মিস করেছে। আজকে ও ফিরতে পারবে না। কি করা যায় ?'

'মেয়েটি একা ?'

'হ্যাঁ, সেটাই মুস্কিল হয়েছে। আমার লজের নিয়ম হল হেড অফিসের অনুমতি ছাড়া কোন একা মেয়েকে আমি ওখানে থাকতে দিতে পারি না।'

'মেয়েটি যাচ্ছিল কোথায় ?'

'ভাল জবাব পাচ্ছি না। বলল ঘুরতে বেরিয়েছে। বাঙালি বলে আপনার কাছে নিয়ে এলাম। ওকে যদি সাহায্য করেন তাহলে ভাল হয়।'

'কি সাহায্য করব বলুন ?'

'আজকের রাতটা যদি এখানে থাকতে দেন !'

'আমার এখানে ?'

'মেয়েটি অল্পবয়সী। আসুন না—।' শরৎবাবু ব্যালকনিতে চলে গেলেন। আমি

ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। জিনস আর গেঞ্জি পরনে। কাঁধে একটা ত্রিপলের ঝোলা ব্যাগ। চুল প্রায় ছেলেদের মত ছাঁটা। সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। শরৎবাবু ডাকলেন, 'শুনুন ?'

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। বছর চব্বিশ বয়স হবে বলে মনে হল। উনিশ কুড়িও হতে পারে। বেশীমাত্রায় স্লিম বলে বোঝা যাচ্ছে না। শরৎবাবু ডাকলেন, 'এখানে আসুন। এঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম। আসুন।'

মেয়েটি এগিয়ে আসছিল। একটুও সঙ্কোচ অথবা অপ্রস্তুত ভাব ওর হাঁটায় নেই। সুন্দরী নয় কিন্তু ওর সাদামাটা মুখটায় অদ্ভুত কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। নিচে এসে মেয়েটি এমন ভাবে একই সঙ্গে কাঁধ এবং মাথা নাড়ল যে তাতেই পরিচয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে চাইল। শরৎবাবু আমার পরিচয় দিলেন।

মেয়েটি বলল, 'আপনার নাম আমি বিজ্ঞাপনে দেখেছি।'

এর চেয়ে ও যদি আমাকে চিনতে না পারত তাহলে ভাল লাগত। ইদানীং আমার ধারণা হচ্ছিল, ভাল না লাগুক অথবা ভাল লাগুক, যে কোন শিক্ষিত বঙ্গসন্তান আমার বই-এর পাতা উল্টে দেখেছেন। তবু আমি হাসলাম, 'কোত্থেকে আসছ ?'

'কলকাতা। আপনার বাড়িটা বেশ। অনেকদিন আছেন ?'

'কিছুদিন। কোথায় যাচ্ছিলে ?'

'কোথাও না। এমনি বেরিয়ে পড়েছি। হঠাৎ নেমে পড়ে দেখি জায়গাটা চমৎকার। কলকাতায় এই জায়গাটার কোন পাবলিসিটি হয়নি, তাই না ?'

'এইভাবে হুটহাট বেরিয়ে পড়লে বিপদে পড়তে পারো।'

'বিপদ ? কেন ? ওহো! না, এখনও পড়িনি। কিন্তু ফিরে গিয়ে আমি কাগজে চিঠি লিখব আপনাদের নিয়মটার বিরুদ্ধে। এখন সমস্ত পৃথিবীতে মেয়েদের মানুষ হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে আর আপনারা মধ্যযুগে আছেন।' কথাটা বলে সে ঝোলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা আঙুলে তুলে নিল।

শরৎবাবু আমার দিকে তাকালেন, 'কি করবেন ?'

আমি কি করব বুঝতে পারছি না। এই সব হিপিটাইপ মেয়ের সংখ্যা নাকি বাড়ছে এমন খবর শুনেছিলাম। এরা ড্রাগটাগও খেতে পারে। উটকো ঝামেলা টেনে নেওয়ার কোন দরকার নেই। এইসময় শরৎবাবু বললেন, 'আসলে বাঙালি বলেই——।'

কথাটা শেষ করলেন না। মেয়েটির আজ কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এখানে বাঙালি বলতে একা আমি। অবশ্য তার জন্যে মেয়েটি যে বিন্দুমাত্র চিন্তিত এমন ভাবার কোন কারণ নেই। ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে এই বালির ওপর সারারাত কাটিয়ে দিতে পারে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এখানে আজ থাকতে চাও ?'

'ফাইন, আমার খারাপ লাগবে না।' বলে সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করল লাইটার জ্বেলে। সামুদ্রিক বাতাসে সেটা অবশ্য বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার হল।

শরৎবাবু বললেন, 'আমি এখন চলি। মেয়েটি কালই ফিরে যাবে। কোন সমস্যা হলে রাধাকে দিয়ে খবর পাঠাবেন।' ভদ্রলোক চলে গেলেন।

আমি দেখলাম কাঁধের ব্যাগ বালির ওপর নামিয়ে রেখে মেয়েটি জলের দিকে হেঁটে গেল। আমাদের অল্পবয়সে এমন কোন বাঙালি মেয়ের কথা চিন্তা করতে পারতাম না। এমন কি নিজের মেয়েকেও ওই ভূমিকায় ভাবতে পারছি না।

'বাবু!'

ফিরে দেখি রাধা দাঁড়িয়ে। সে বলল, 'আমি কি আজ থেকে যাব ?'

'কেন ? তুমি থাকবে কেন ?'

সে আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল, 'তাহলে দুজনের খাবার রেখে যাই ?'

'হ্যাঁ।' বলার সময় দেখলাম মেয়েটা সিঁড়িতে চলে এসেছে।

'আমাকে উনি বলেছিলেন আপনি একা থাকেন এবং বয়স্ক মানুষ।' মেয়েটি বলল।

বয়স্ক শব্দটা খারাপ লাগলেও মাথা নাড়লাম, 'ঠিকই বলেছেন।'

'কিন্তু উনি যেরকম 'মিন' করেছেন তেমন বয়স্ক বলে আপনাকে মনে হচ্ছে না—আর আপনি তো একা নন! আপনার স্ত্রী ?'

'মাই গড্!' আমি বললাম, 'এখানে একা আছি।'

'ও আচ্ছা! আপনার গার্ল ফ্রেণ্ড।' পাশ কাটিয়ে বসার ঘরে ঢুকে পড়ল মেয়েটি, 'ইয়া!' অদ্ভুত একটা শব্দ ছিটকে এল ওর গলা থেকে। সম্ভবত ঘরটি দেখে উৎফুল্ল হল এবং ওটি তারই প্রকাশ। ঘুরে দাঁড়াল সে, 'আপনি তো খুব রোমান্টিক। য়োরোপ ম্যারিকার অনেক লেখক শুনেছি সমুদ্র অথবা পাহাড়ে একা থাকেন বছরের কয়েকমাস, কলকাতার কেউ যে তাই করেন জানতাম না।'

আমি ঈষৎ হতভম্ব। ঘরে ঢুকে ও কি দেখে এমন মন্তব্য করছে বুঝতে পারছি না। এখন আমার তরল হবার সময় নয়। ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গম্ভীর হতেই হবে। বললাম, 'তুমি যাকে দেখলে সে আমার সাহায্যকারী। রান্না ইত্যাদি করে দেয়।'

'ব্যাস ?' চোখ বড় করল সে।

'মেয়েটি কাছাকাছি একটি গ্রামে থাকে। এরকম মন্তব্য করো না। কি নাম তোমার ?'

'মালিনী। কিছু খাওয়াবেন ? খিদে পেয়েছে।' ও চেয়ারে বসে পড়ল।

আমি গলা তুললাম, 'রাধা ?'

রাধা কাছাকাছি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। বললাম, 'ওকে কিছু খেতে দাও।'

মাথা নেড়ে চলে গেল সে। মেয়েটির পায়ে স্নিকার। সেটার রঙ বোঝা মুশকিল। হাত বাড়িয়ে ফিতে খুলতে লাগল সে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি কোন কাজকর্ম করো ?'

'ওয়েল, করতাম। এখন করছি না। দয়া করে এইসব পার্সোনাল কোয়েশ্চেন করবেন না। আপনি আমাকে থাকতে দিয়েছেন এখানে—আমার পেরেন্টসদের দেখে দেননি, অতএব ওদের ঠিকুজি জানতে চাইবেন না!'

'বাঃ। চমৎকার। তুমি কাল চলে যাওয়ার পর পুলিশ এসে তোমার সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করলে আমি কোন জবাব দিতে পারব না।'

'আপনি বলবেন আমার নাম মালিনী দত্ত। সল্টলেকে থাকি। ব্যাস।' মালিনী হাসল, 'সিলি ব্যাপার! আপনি আমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করবেন খাবার এবং থাকার জায়গা পাওয়ার জন্যে আমি তার প্রতিটির উত্তর দিতে পারি। কিন্তু স্যার, সেইসব উত্তরগুলো যে সত্যি তার কোন প্রমাণ আপনি কি আজ পাবেন?'

'তুমি তো অদ্ভুত মেয়ে!'

'কথাটা জ্ঞান হওয়া ইস্তক শুনে আসছি। আপনার বেডরুম কোথায়?'

'ভেতরে। তুমি ইচ্ছে করলে এখানে থাকতে পার—নইলে ভেতরে একটা ঘর আছে।'

'আপনার হেল্পিং হ্যাণ্ড?'

'ও বিকেলবেলায় গ্রামে ফিরে যায়।'

'তার মানে সারারাত আপনি একা থাকেন?'

'হ্যাঁ, আমি সেটা এনজয় করি!'

'আচ্ছা আপনি রোজ মদ খান, না?'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। বলে কি মেয়েটা? বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার মানে?'

'আপনার চোখের নিচে, চিবুকে এ্যালকোহলের ফ্যাট জমেছে।' মাথা নাড়ল মালিনী, 'একা একা মদ্যপান করা ঠিক নয়। ক্রিমিন্যাল টেন্ডেন্সি গ্রো করে।'

এইটুকুনি মেয়ে বলে কি! ওকে কি এখন বোঝাতে যাব আমি মোটেই মদ্যপান করি না? হঠাৎ খেয়াল হল নিজের মুখখানা অনেকদিন ভাল করে দেখি না। এখানে আসার পর এমন অবস্থা হয়েছে যে আমার মুখ দেখেই বলা যায় মদ্যপান করি! কলকাতায় কেউ কখনও এমন কথা বলেনি।

রাধা খাবার দিয়ে গেল। ওমলেট আর বিস্কুট। সঙ্গে চা। খেতে খেতে মালিনী জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

রাধা দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়, ওমলেট চিবোতে চিবোতে মালিনী তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কাছাকাছি থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম তো রাধা, আমার মালিনী। আমি আপনার গ্রামে যেতে পারি?'

'বেশ তো।'

'কিভাবে যাব? কোন্ দিক দিয়ে?'

'আমিই নিয়ে যেতে পারি।'

'না না, যাব কিনা এখনও ঠিক করিনি। ইচ্ছে হলে যেতে পারি তাই জিজ্ঞাসা করে রাখছি। আপনাকে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না।' মালিনী বলল।

কথাটা শোনামাত্র রাধা বিরক্তমুখে ভেতরে চলে গেল। আমার মনে হল মালিনীর

মত মেয়ের পক্ষে এমন বলাই স্বাভাবিক। এইরকম কোন মেয়েকে নিয়ে এখন পর্যন্ত কিছু লিখিনি। চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ লেখা উচিত। একজন মোটবাহক এবং সাহিত্যের মাস্টার একই ভাষায় কথা বলতে পারে না। লেখালেখির এই প্রথমপাঠ আজকাল আমাদের মত বয়স্ক লেখকদেরই গুলিয়ে যায়। কিছু কিছু কারণও যে ঘটে না তা নয়। এই যে আমি এখানে একা বাস করছি এবং রাধা আমার কাছে কাজ করছে, দুজনের স্ট্যাটাস দুই বিপরীত বিন্দুতে। রাধার সংলাপ লিখলে অশিক্ষাপ্রসূত গ্রাম্যশব্দাবলীর সন্ধান করব নিঃসন্দেহে। কিন্তু বাস্তবে রাধা কথা বলছে একেবারে আমার মত। কোন কোন অভিব্যক্তিতে তো এগিয়ে থাকছে। তাহলে? এককালে আদিবাসী চরিত্র পেলেই তার মুখে অদ্ভুত বাংলা বসানো হত। অথবা সাহেব চরিত্র, সে ব্রিটিশ হোক অথবা ওলন্দাজ—হামি টোমি লেখা হত। কেন হত?

'আপনি কি অসুস্থ?'

প্রশ্নটা শুনে চমকে তাকালাম। মালিনী আমার দিকে তাকিয়ে। আমি যে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারছি। তাই বলে এমন প্রশ্ন?

বললাম, 'এখনও হইনি।'

'এই ঘরে আপনার বইপত্র নেই কেন?'

'ওগুলো আমি নিয়ে আসিনি।'

'ভাল করেছেন। আমি উঠি, একটু ঘোরাঘুরি করি।' মালিনী তার ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। এক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই। যে একা ঘুরতে বেরিয়েছে সে বাড়িতে বসে থাকবে কেন? আর এখানে তো চট করে কেউ বিপদগ্রস্ত হয না।

চুপচাপ বসেছিলাম, রাধা এল। 'আমি তাহলে যাই?'

'এসো।'

রাধা তবু দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। ওর এই অস্বস্তির কারণ বোঝা সহজ। মালিনীর উপস্থিতিতে আমি অসুবিধেতে পড়তে পারি বলে ওর ধারণা হয়েছে। এটাও মজার ব্যাপার। এ বাড়িতে কাজ করে বলেই কি একটা অধিকারবোধ তৈরী হয়েছে ওর মধ্যে?

মিনিট পনের বাদে একটা চিৎকার শুনলাম। মেয়েলি গলার ডাক। কি নামে ডাকছে বোঝা গেল না। ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই মালিনীকে দেখতে পেলাম। আর একবার চিৎকার করতে যাচ্ছিল, আমাকে দেখে থেমে গেল। কাছে এগিয়ে এসে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কাছে সাঁতারের পোশাক আছে? মেয়েদের?'

ওর মুখ ওপরের দিকে তোলা। আমার হাসি পেল। বললাম, 'আমার এখানে কোন মেয়ে থাকে না যে ওটা রাখব!'

'রাখলে ক্ষতি কি ছিল? আমার এখন সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে।'

'মাই গড! এই সমুদ্রে সাঁতার কাটার চেষ্টা করো না।'

'এই সমুদ্রে মানে? এখানে সমুদ্র মোটেই রাফ নয়!' হাতের ঘড়ি খুলে ঝোলায়

ফেলল মালিনী। তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'বড় তোয়ালে নিশ্চয়ই আছে?'

'তা আছে। কিন্তু—!'

'আমার সঙ্গে কোন পোশাক নেই। এই গেঞ্জি প্যান্ট ভেজানো যাবে না। আপনি একটা তোয়ালে এখানে এনে দেবেন যাতে চেঞ্জ করতে পারি!'

ও কি চেঞ্জ করবে বুঝতে পারছি না। লক্ষ্য করেছি মেয়েটি যখন কথা বলে তখন বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলে। আমি ভেতরে ঢুকে একটা নীল রঙের লার্জসাইজ তোয়ালে নিয়ে বাইরে আসতেই চমকে উঠলাম। মেয়েটির গেঞ্জি আর প্যান্ট বালির ওপরে পড়ে আছে। ওর পরণে প্যান্টি এবং ব্রা। এখন প্রায় বিকেল। কলকাতায় আমরা যাকে বলি কনে দেখা আলো তা ছড়িয়েছে পৃথিবীতে, ঢাকায় হুমায়ূন আহমেদ এই আলোর নাম বলেছিল, কন্যাসুন্দর আলো। মালিনীর গমের মত শরীরের চামড়ায় সেই আলো যেন কৃতার্থ হয়ে ছড়িয়েছে, ব্যাপারটা আরও ভাল হয় এভাবে বললে, পৃথিবীর সব আলো যেন ওর শরীর গ্রাস করে নিয়ে আলোকময়ী হয়ে উঠেছে। মেয়েদের শরীর আজকাল আমরা প্রায়শই দেখতে পাই টিভির কল্যাণে। যে কোন সাঁতারের প্রতিযোগিতায় তাঁরা যে পোশাকে আসতে বাধ্য হন তাতে অনেকটাই বোঝা যায়। সিনেমার দৌলতে ব্যাপারটা আর তেমন গোপনীয় নয়। আমার এই মুহূর্তে ওকে দেখে একটাই শব্দ মনে এল—সুন্দর!

বড় বড় পা ফেলে মালিনী সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল সামনের সমুদ্র যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। ওর পা এবার জলে। গোড়ালি ডুবল, হাঁটুও। আমার কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত? মালিনীর কোমর এখন জলে। সমুদ্র খুব শান্ত হয়ে ওকে গ্রহণ করছে। সাঁতার কাটার অভ্যেস আছে মেয়েটার। যেভাবে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাতেই প্রমাণিত হল। এখন ওর মাথা ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সমুদ্র ওকে আড়াল করে ফেলেছে। কিন্তু আমার চোখের সামনে ওর লম্বা শরীরটার ঔজ্জ্বল্য এখন স্পষ্ট। ব্যাপারটাকে একটুও [illegible] বলে মনে হয়নি এতক্ষণ। হঠাৎ খেয়াল হল, রাধা এখানে থাকতে মালিনী তো স্নানের কথা বলেনি! রাধার সামনে ও কি ওইভাবে জলে নামতে চায়নি? এখন এই বালি সমুদ্র আকাশ এবং আমাকে ও একই পর্যায়ে ফেলে দিল? ওই পোশাক খোলার পর সে আমাকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করল না। একটা যুবক এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ওইভাবে সমুদ্রে নামতে পারত? অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভেতরে চলে এলাম। এই বিরক্তি ঠিক কার ওপর তা বোঝার চেষ্টা করলাম না। কলকাতায় থাকতে মধ্যবয়সিনীদের আগ্রহ আমার সম্পর্কে আছে এটা প্রায়ই বুঝতে পারতাম। পঞ্চাশ বছর বয়সে শরীর এবং মন যে একটুও জরায় আক্রান্ত হয়নি সেটা তাঁরাও বুঝতেন। অথচ এই বালিকাটি আমাকে এমনভাবে উপেক্ষা করল! নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম এবং তখনই সেই জলচরটির কথা মনে এল। ওই বিশাল প্রাণীটি ঠিক কি প্রকৃতির আমি জানি না। আমি দ্রুত বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করলাম, 'তাড়াতাড়ি উঠে এসো।'

মেয়েটিকে খুঁজে পেতে সময় লাগল। ও ঢেউ-এর আড়ালে ছিল। সমুদ্রের অনেকটা

ভেতরে চলে গেছে সে। আমার চিৎকার এই ব্যালকনি থেকে ওর কানে পৌঁছাবার কথা নয়। আমি নিচে নেমে দ্রুত সমুদ্রের কাছে চলে এসে চিৎকার করতে লাগলাম। অথচ সামুদ্রিক আওয়াজের জন্যে ও তার কিছুই শুনতে পারছিল না। আমার ভয় বাড়ছিল। যে কোন মুহূর্তেই ওর শরীরটাকে টেনে নেবে প্রাণীটা। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে তাতে ঢেউগুলো আড়াল করছে ওকে। আমি তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মাথার ওপর নাড়তে লাগলাম। মেয়েটির যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে আমি কাউকে জানাতেও পারব না।

পাগলের মত তোয়ালে নাড়ছিলাম। হঠাৎ যেন জলপরীর মত সে সমুদ্র থেকে উঠে এল। উঠে এল বলতে তার কোমরের নিচে জল, চোখে বিস্ময়। আমি তোয়ালে নামিয়ে রেখে চিৎকার করে বললাম, 'তাড়াতাড়ি উঠে এসো।'

হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করল, 'কেন ?'

'উঠে এসো, বলছি।' আমি গলার শিরা ফোলালাম।

'কি ব্যাপার বলুন না ?'

'এই সমুদ্রে একটা মারাত্মক প্রাণী আছে।'

'কি প্রাণী ?'

'নাম জানি না। বিশাল চেহারা। প্রায়ই দেখা যায়।'

সে ঘাড় ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না।'

'সেটা তোমার সৌভাগ্য। পেলে এখন কথা বলতে পারতে না।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন না তো ?'

'আমার কি লাভ ?'

সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে আসতে লাগল। সমস্ত শরীর এখন জলে ঝকঝক করছে। ইতিমধ্যে ছায়া নামলেও সে সমান উজ্জ্বল। এখন আর আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন কারণ নেই। আমি ফিরছিলাম—সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কখনও সমুদ্রে স্নান করেননি ?'

আমি হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'না।'

'কি মিস করেছেন! সমুদ্রের পাশে থেকে জলে নামেননি, আশ্চর্য!'

আমি জবাব না দিয়ে ওপরে উঠছিলাম। সিঁড়িতে পা রাখার সময় দেখতে পেলাম ও তোয়ালেতে শরীর মুছছে। সংক্ষিপ্ত দুটো পোশাক ভিজে শরীরের সঙ্গে এঁটে বসেছে। ও তোয়ালে জড়িয়ে নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কোন মানুষ নেই ?'

ব্যালকনিতে উঠে চিৎকার করলাম, 'আমি আছি।'

'আপনার কথা কে বলছে!' শোনামাত্র আমি ভেতরে ঢুকে গেলাম।

চেয়ারে বসে পত্রিকা তুলে নিয়েছিলাম কিছু একটা করতে হয় বলে। কিন্তু কিছুই পড়তে পারছি না। নিজের ওপর এত বিরক্ত আমি কখনও হইনি। আমি বুঝতে

পারছি ওর ওই স্নান করার ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারছি না। ও যদি প্যান্টশার্ট পরে স্নান করত তাহলে এটা আমার হত না। অথচ নারীশরীর নিয়ে আমি কখনই বিচলিত বোধ করিনি। মনে পড়ছে একজন চিত্রাভিনেত্রীর কথা। আমাকে দুপুরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন লাঞ্চে। ঠিক সময়ে গিয়ে শুনেছিলাম তিনি জরুরী কাজে বেরিয়েছেন এবং আমাকে অনুরোধ করেছেন অপেক্ষা করার জন্যে। ব্যাপারটার জন্যে ক্ষমাও চেয়েছেন। আমি বসার পরে ওঁর মেইডসার্ভেন্ট বিয়ার নিয়ে এল। আমি বিয়ার খাই না। দিশি বিয়ার তো নয়ই। কিন্তু সেদিন সময় কাটানোর জন্য খেলাম। গোটাদুয়েক খাওয়ার পর মেইডসার্ভেন্ট এসে জানালো, দিদিমণি পৌঁছে গেছেন এবং আমাকে তাঁর ঘরে ডাকছেন। আমি তাঁর শোওয়ার ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢুকতেই দেখলাম ঘর অন্ধকার। একটা নীল আলো জ্বলে উঠতেই তাঁকে দেখতে পেলাম। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে ক্লিওপেট্রার মত আধশোয়া ভঙ্গীতে খাটে শুয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমি চমকে উঠলাম, 'এ কি!'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। এসো।' তিনি হাত বাড়ালেন।

হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম আমার শরীরে বিন্দুমাত্র আন্দোলন নেই। মন খিঁচিয়ে উঠছে। আমি কোন শারীরিক প্রয়োজন বোধ করছি না। ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম। বিয়ারের ঘোর নিয়ে রাস্তায় চলে এসে মনে হয়েছিল স্নান করা দরকার। সেই অভিনেত্রীর সঙ্গে পরে দেখা হলে এই ঘটনার কথা একবারও উল্লেখ করেননি। যেন তাঁর সঙ্গে আমার কোন ঘটনাই ঘটেনি। আমার মনে ধন্দ এসেছিল। আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম এইভাবে, যেহেতু ওই মহিলার সম্পর্কে আমার কোন আকর্ষণ ছিল না, কোনরকম ভালবাসা জন্ম নেয়নি তাই আমার শরীর বিরূপ ছিল। হয়তো এটা ঠিক। কিন্তু তারপর থেকে ভাবনাটা সত্যি কিনা তার প্রমাণ পাওয়ার মত সুযোগ হয়নি।

'বাইরে রোদ নেই। এগুলো কোথায় শুকোনো যায়?'

গলা শুনে তাকালাম। মালিনী দরজায়। তার হাতে ভেজা অন্তর্বাসদুটো এবং তোয়ালে। অর্থাৎ মেয়েটি এখন পোশাকের নিচে বিবস্ত্রা। চোখ বন্ধ করলাম। এসব ভাবা আমার উচিত নয়।

'আপনাকে হঠাৎ এ্যাবনর্মাল দেখাচ্ছে!'

'কই না তো!' আমি উঠলাম, 'ওপাশে বাথরুম আছে, ওগুলো ওখানে রাখো।'

'কিন্তু তাতে শুকোবে না!'

'আমার কাছে শুকোনোর কোন ব্যবস্থা নেই। গ্যাস জ্বেলে শুকিয়ে নিতে পার। কিন্তু তুমি তো এখনই চলে যাচ্ছ না।'

'তা যাচ্ছি না।' মালিনী বাথরুমে চলে গেল।

ঠোঁট কামড়ালাম। এ কি করছি! নিজের মুখটা এমন বিশ্বাসঘাতকতা করল কেন? আমি স্বাভাবিক হতে চাইলাম।

মালিনী ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার স্পেয়ার পাজামা পাঞ্জাবি পেতে

পারি ?'

'আমার ?'

'আর কার ? এখানে তো কোন মহিলা নেই যে তার পোশাক চাইব !'

'আমার পাঞ্জাবি তোমার চলবে ?'

'চালিয়ে নেব।'

আমি উঠলাম। আলমারি থেকে পাজামা পাঞ্জাবি বের করলাম। একেবারে নতুন। হঠাৎ মনে হল মেয়েটির অন্য কোন মতলব নেই তো ? এরকম গল্প অনেক শুনেছি। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখব বাড়ি ফাঁকা। ওর সাকরেদরা হয়তো কাছাকাছি অপেক্ষা করছে। নাঃ, রাধাকে থাকতে বললে দেখছি ভাল হত। থানায় গেলে পুলিশই বলবে, 'একটা উটকো মেয়ে আপনার কাছে থাকতে চাইল আর তার কোন পরিচয়ের প্রমাণ না পেয়ে আপনি থাকতে দিলেন ?'

'আপনি দেখছি টিভি নিয়ে ভালই আছেন !'

এর মধ্যেই নজর পড়েছে। পাশের ঘরে এসে দেখলাম মালিনী টিভির সামনে। কাপড় দুটো দিয়ে বললাম, 'তুমি বাইরে বেড়াতে এসেছ অথচ পোশাক সঙ্গে আনোনি কেন ?'

'একদিনের জন্যে বেরিয়েছি, পোশাকের কি দরকার ? আজও না হলে চলে। কিন্তু ওই যে বলে, বসতে পারলে শুতে চায়, আমার সেই অবস্থা। আপনার এখানে আরাম পেয়ে—।' ও কথা শেষ না করে পাজামা-পাঞ্জাবি নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

আমি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। ছায়া নেমে গেছে সমুদ্রে। সেই প্রাণীটির দেখা এখন আর পাওয়া যাবে না। হয়তো ও ওখানেই আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না—কিন্তু ওর চোখে আমি ধরা পড়ছি। কিন্তু মালিনী যখন সাঁতরে অনেকটা ভেতরে চলে গিয়েছিল তখন ও কি করছিল ? মনে হচ্ছে বিশাল চেহারা হলেও প্রাণীটি নিরীহ।

'ফ্যান্টাস্টিক !'

গলাটা পেছনে, সে এসে দাঁড়াল। অদ্ভুতভাবে ম্যানেজ করেছে আমার পোশাক। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিটার আস্তিন গুটিয়ে নিয়েছে কনুই পর্যন্ত। এই পাঞ্জাবিতে বোতাম লাগানোই ছিল। তার তিনটে ঘর বন্দী করতে হয়েছে। কিন্তু অন্তর্বাস না থাকায় সরাসরি তাকাতে অসুবিধে হচ্ছে আমার। পাজামাটাকে গুটিয়ে নিয়েছে নিশ্চয়ই কোমরের কাছে।

'আমার ইচ্ছে করছে এখানে—এই সমুদ্রের কাছে সারাজীবন থেকে যাই।'

'বয়স না হলে পারবে না।'

'কেন ?'

'তুমি যখন সমুদ্রে স্নান করছিলে তখন সমুদ্রকে যত বড় মনে হচ্ছিল এখন তার থেকে অনেক বড় মনে হচ্ছে তো ? একটু দূরত্বে না এলে দেখার চোখ স্পষ্ট

হয় না যেমন, একটু বয়স না বাড়লে মানিয়ে নেওয়ার মন তৈরী হয় না।'

'তাহলে দরকার নেই। আমি চিরকাল সাঁতার কাটতে চাই।' মালিনী হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে বলল, 'আমি একটু পাক দিয়ে আসি।'

'কোন্‌দিকে যাবে?'

'দেখি।' ও নেমে গেল। অন্য পোশাকে একটুও জড়তা নেই।

মাঝখানে কলকাতায় মেয়েদের একাংশ নাকি অন্তর্বাস ছাড়াই বাইরের কাজে যেতেন। বিদেশের হাওয়া বোধহয় লেগেছিল তখন। কোন একটা মেয়েদের কাগজে এমন একটা খবর পড়েছিলাম। সেটা দেখে আমার সন্তানের মা বলেছিলেন, 'মাগো, ভাবতেই পারি না!' তিনি এখানে থাকলে কি বলতেন?

মালিনী বাঁকের আড়ালে চলে যেতে আমি একটু নিশ্চিন্ত হলাম। আমি হয়তো ওকে অকারণে সন্দেহ করছি। এখনকার মেয়েরা অনেক আলাদা। হয়তো স্রেফ এ্যাডভেঞ্চার করতেই ও বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। বিদেশে তো এমন হামেশাই হয়ে থাকে। কিন্তু ও কোথায় গেল? এখানে সমুদ্র ছাড়া তো কিছুই দেখার নেই। তাহলে কি মালিনী তার সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা করতে গেল? চিন্তাটা এঁটুলির মত লেগে রয়েছে। আমি ঘরে এলাম। ওর ঝোলা ব্যাগ পড়ে রয়েছে। কি আছে ওর মধ্যে?

অন্যের জিনিস বিনা অনুমতিতে দেখা অন্যায়। কিন্তু—। হাত বাড়ালাম। দুটো সিগারেটের প্যাকেট, একটা ছোট্ট তোয়ালে, দেশলাই, বড় চিরুনি আর ডায়েরি। ডায়েরিটা খুললাম। কোথাও কোন নামঠিকানা লেখা নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা লাইন ইংরেজিতে লেখা। এইভাবে চোরের মত সেসব পড়া যায় না। আমি সব যথাস্থানে রেখে দিলাম।

সন্ধ্যে নামল। আজ হাল্কা চাঁদ উঠবে কিন্তু মালিনীর যাতে চিনতে অসুবিধে না হয় তাই বাড়ির সব আলো জ্বেলে রাখলাম। ক্রমশ রাত বাড়লে আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম। একটা হুইস্কি নিয়ে বসেছিলাম বাইরের ঘরে। হঠাৎ হাসির শব্দ কানে আসতেই ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে সাদা মূর্তি এগিয়ে আসছে এবং তার সঙ্গে কেউ আছে। আলোর বৃত্তে আসার পর আমি সুজনকে চিনতে পারলাম। মালিনী তাকে বলল, 'ঠিক আছে। কাল সকালে দেখা হবে।'

সুজন ঘাড় নাড়ল। ছেলেটার মুখ খুব উজ্জ্বল। আমার সঙ্গে কথা না বলে সে ফিরে গেল। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। ওপরে উঠে এসে মালিনী বলল, 'দারুণ জায়গা। ভাবছি আর একদিন থেকে যাব।'

'ওর সঙ্গে দেখা হল কোথায়?'

'এখানেই। ও আমাকে সমুদ্রের ভেতরে নিয়ে যাবে বলেছে।'

'হুম।'

'আপনি যেন অপছন্দ করছেন ব্যাপারটা!'

'তাতে তোমার কি কিছু এসে যায়?'

'আপনাকে একটা অনুরোধ করব ?'

আমি তাকালাম, কোন কথা বললাম না।

'দয়া করে আমার সঙ্গে পিতাপিতামহের মত আচরণ করবেন না।' সে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে পড়ল। বসেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি মদ খাচ্ছেন ?'

'হুইস্কি।' আমার গলার স্বরটা যেন নিজের কানেই অন্যরকম শোনাল।

'এই যে আপনি শহর ছেড়ে চলে এসেছেন, এখানে সমুদ্রের ধারে বসে হুইস্কি খান আর লেখালেখি করেন, এতে কি আনন্দ পান ?' সে ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল সমর সেনের একটা লাইন, 'কি আনন্দ পাও নারী সন্তানধারণে ?' প্রশ্নকারীকে কখনও কি তা বোঝানো সম্ভব ? আমি হাসলাম।

'আপনি একজন এসকেপিস্ট।'

'তাই ?'

'নিশ্চয়ই। পারিবারিক সামাজিক অথবা প্রফেশনাল জীবনের প্রব্লেম ফেস করতে না পেরে এইভাবে পালিয়ে বাঁচছেন।' সে শান্ত গলায় বলল।

'তুমি যা জানো না তাই বলছ!'

'এখানে দুদিন থেকে সাতদিন এভাবে থাকা যায়! আপনি সন্ন্যাসী নন যে ঈশ্বরচিন্তায় একা মগ্ন হয়ে আছেন। আপনার মধ্যে কামনাবাসনা সব আছে।'

'কি করে বুঝলে ?'

'এই যে হুইস্কি খাচ্ছেন—দামী হুইস্কি !'

'ঠিক। কিন্তু আমি মাতাল হইনি।'

'সেটা হলে চরিত্র সরল হত। একটা লোক মদ খেয়ে মাতাল হলে তাকে বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। মেয়েদের সম্পর্কেও আপনার খুব আগ্রহ আছে।'

'এই তথ্য পেলে কোত্থেকে ?'

'আপনার চোখ দেখে। আমি যখন স্নান করছিলাম তখন আপনার দৃষ্টি ঠিক একজন যুবকের মত হয়েছিল। অথচ দেখুন, আপনি এখানে একা আছেন। রাধা আপনার কাজকর্ম করে দেয়। এ্যান্ড শী ইজ এ প্রেটি ওম্যান! কিন্তু আপনি তার সঙ্গে ডিসট্যান্স মেইনটেইন করেন। হোয়াই ? প্রথমত, শী ইজ্ জাস্ট মেইডসার্ভেন্ট, দ্বিতীয়ত, লোকে আপনার বদনাম করুক আপনি চান না। সেই অর্থে আপনি ভীতু।'

'তুমি তোমার বয়সের তুলনায় বেশী কথা বলছ!'

'ওই তো মুশকিল। আপনাকে একটু আগে বললাম, বাবার মত কথা বলবেন না।' মালিনী হেসে উঠল শব্দ করে, 'আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন ?'

'নিশ্চয়ই। জীবনে অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে কিন্তু তা চাওয়া উচিত শোভনভাবে। তাছাড়া রুচির প্রশ্ন আছে। পেলেই নিতে হবে এই বয়সটা পার হয়ে এলে রুচির সঙ্গে মিল দেখতে হয়। আমি সন্ন্যাসী নই কিন্তু আমি মুক্ত হয়ে থাকতে চাই বলেই এখানে চলে এসেছি।'

মালিনী কাঁধ নাচাল। যেন আমার কথাগুলো অর্থহীন। উঠে জানলার কাছে গিয়ে সে সমুদ্রের দিকে তাকাল, 'ফ্যান্টাস্টিক! হালকা জ্যোৎস্না নেমেছে সমুদ্রে। আহা, এখন স্নান করলে দারুণ হত!'

'রাত্রে কেউ সমুদ্রে স্নান করে না।'

'এখানে হয়তো করে না। কিন্তু পৃথিবীর অনেক সমুদ্রেই করে।'

'তোমাকে বললাম এই সমুদ্রে একটা বিশাল প্রাণী আছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেই প্রাণীটি যে হিংস্র তা জানলেন কি করে?'

'হতেও তো পারে।'

'না। সে যখন অতবড় গোটা সমুদ্র ছেড়ে এখানে তীরের কাছে আপনার কাছাকাছি এসে রয়েছে তখন তাকে নিয়ে আর কোন ভয় নেই।'

'তুমি কিন্তু খামোকা আমায় অপমান করে যাচ্ছ!'

'আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?'

'আর কি বাকি রেখেছ!'

'আপনি জীবনের সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে লেখেন কি করে?'

'তুমি আমার লেখা পড়োনি?'

'না। কিন্তু যে লোকটি নুন কি জিনিস জানে না সে কখনই ভাল রাঁধতে পারে না। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্ক ভাল নয়?'

'বলে যাও।'

'আপনার কোন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আছে?'

আমি হাসলাম। কিন্তু মেজাজটা চড়ে যাচ্ছিল।

'যদি থাকত, তাহলে তাঁকে এখানে দেখা যেত। অতএব আপনি যা লিখবেন তা আর যাই হোক সাহিত্য হবে না। জীবনের গন্ধ থাকবে না আপনার লেখায়। আপনি বানানো গপ্পো লিখবেন। অধিকাংশ বাঙালি লেখকই যেরকম লেখেন, যাকগে। অনেকটা বকেছি, আমার খিদে পেয়েছে।'

আমি দ্বিতীয় হুইস্কি নিলাম, 'কিচেনে খাবার আছে হটবক্সে। নিয়ে নাও।'

'আপনি খাবেন না?'

'এখন নয়।'

মালিনী চলে গেল কিচেনে। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। ভেতরে ভেতরে যে টালমাটাল কাণ্ড চলছে তা বুঝতে পারছি। পুরুষ হিসেবে আমাকে ও যা বলল তা নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। এখন ওর সঙ্গে জোর করেও আমি শারীরিক আনন্দ পেতে পারি। মুশকিল হল, জোরের সঙ্গে আনন্দের কোন সম্পর্ক নেই—সেটাই কাকে বোঝাবো? ওর কথাগুলো শুনে উত্তেজিত হওয়া আমার পক্ষে মোটেই শোভন নয়। কিন্তু ও যে আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতায় হাত দিল! আমি যা লিখছি তা কি সাহিত্য নয়? বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর অথবা সমরেশ বসুর পায়ের নখের যোগ্য নই একথা নিজে বলতে ভাল লাগে, লোকে সমীহ করে, কিন্তু অন্য

কারো মুখ থেকে শুনলে বুক টাটিয়ে ওঠে। পাঠকরা তাহলে আমার বই কেনে কেন? দুই বাংলার পাঠকদের আমি বানানো গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখছি? ভুল ভাঙ্গলেই ওঁরা আমাকে ছুঁড়ে ফেলবেন। এতদিন যা লিখলাম তার সব ভুল? আঃ, এ কি যন্ত্রণা।

হঠাৎ কানে বাজনা ভেসে এল। আমজাদের ক্যাসেট স্টিরিওতে চাপিয়ে দিয়েছে মালিনী। মেয়েটা যা ইচ্ছে তাই করছে। আমার সমস্ত এলাকায় অনুমতি ছাড়া ঢুকে পড়ছে। আমি টয়লেটে গেলাম। আলো জ্বালতেই ডানদিকে স্নানের জায়গার হ্যাঙারে ঝোলা দুটো জিনিস চোখে পড়ল। মালিনীর দুটো অন্তর্বাস। যৌবন আড়াল করার, না ধরে রাখার আধার? এসব জিনিস আমার কাছে নতুন নয় কিন্তু তাদের দিকে তাকানোর প্রয়োজন মনে করিনি। মনে হত তাকালে নিজের মনটাকে নোংরা করা হবে। আজ মনে হল, এইটুকুই পার্থক্য একটি নারীর সঙ্গে পুরুষের। এবং এই পার্থক্যের কারণে আমাকে আজ ওসব কথা শুনতে হল। ওই বয়সী কোন ছেলে এসে যদি কথাগুলো বলতে চাইত, নিঃসন্দেহে আমি তাকে এ্যালাউ করতাম না।

সরোদে যখন ঝালা শুরু হয়েচে তখন মালিনী জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কোথায় শোব?'

'তোমার যেখানে ইচ্ছে।'

'আপনি রেগে গিয়েছেন।'

এটা প্রশ্ন নয়, ওর মনে হচ্ছে। আমি কোন কথা বললাম না।

'কিন্তু আপনি লোকটি খুব ভাল।'

'অর্থাৎ?'

'আপনাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'হ্যাঁ, তুমি তো আমাকে ইঁট পাথর বালি অথবা সমুদ্রের মত ট্রিট করছ!'

'ঠিক তাই। এই যে আমি রাত্রে ঘুমাবো, আমি জানি আপনার কাছ থেকে আমার কোন ভয় নেই। আমার বদলে মাধুরী দীক্ষিত হলেও একই ব্যাপার হত।'

'জানি না। তবে সুচিত্রা সেন হলে তোমার কথার প্রতিবাদ করতাম।'

'সে কি? কেন?'

'ওটা তুমি বুঝবে না।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। সুচিত্রা সেন সন্ধ্যা মুখার্জী কম্বিনেশন আপনাদের অল্প বয়সে দারুণ এফেক্টিভ ছিল, তাই না?' বলতে বলতে সে ছুটে গেল স্টিরিওর কাছে। ক্যাসেট হাতড়ে বলল, 'পেয়েছি।' তারপর আমজাদকে থামিয়ে ক্যাসেট পুরে দিল পেটে। সেই মায়াবী গলায় বেজে উঠল, 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু!'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিরায় শিরায় অদ্ভুত আরাম ছড়িয়ে পড়ল আমার। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যেন আচমকা শীতল জলের ঝরণায় শরীর এলিয়ে দিয়েছি এখন। গানের কয়েকটা লাইন হওয়ামাত্র হাততালির শব্দে চোখ খুললাম।

চকচকে মুখে মালিনী বলল, 'হে অতীত, অনাদি অতীত কথা কও!'

আমি হাসলাম। এই বালিকাকে আমি কি বোঝাবো? এরকম স্মৃতি যে ওদের জন্যে থাকবে না তা বেচারারা জানে না!

হঠাৎ মালিনী এগিয়ে এল, 'ঘুমাতে যাওয়ার আগে আপনাকে একটু চুমু খেতে পারি? আপনাকে এই মুহূর্তে খুব রোমান্টিক দেখাচ্ছে!'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ঝুঁকে পড়ল। কপালের চামড়ায় উষ্ণ অথচ সিক্ত স্পর্শ পেলাম। সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'ইউ আর বিউটিফুল!'

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ টের পেলাম জীবনে এই প্রথমবার সন্ধ্যার এই গানটি আমাকে আর তেমনভাবে টানছে না। খুব ইচ্ছে করছিল মালিনীর কাছে যেতে। কাছে গিয়ে বলতে, এভাবে কেউ আমাকে অনেকদিন স্পর্শ করেনি। এককালে লাইনটা দারুণ লাগত, 'চেরাপুঞ্জির থেকে, একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে?' এখন মনে হল খুব ভুল চাওয়া। গোবি-সাহারার অফুরন্ত তৃষ্ণা। চেরাপুঞ্জি থেকে আসা একটি মেঘের পক্ষে মেটানো সম্ভব নয়। বরং যে স্বাদ জানা ছিল না তাই পাইয়ে যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া কোন লাভ হয় না। আমার খুব ইচ্ছে করছিল আদর পেতে এবং করতে। কিন্তু আমি উঠতে পারছিলাম না। কী একটা সঙ্কোচ আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল। আর তখনই সন্ধ্যা গেয়ে উঠলেন, 'এ শুধু গানের দিন—।'

সেই বাজনা, সেই সুর এবং সেই কণ্ঠ এক হয়ে আমাকে তুলে নিয়ে গেল এক স্বপ্নলোকে যেখানে আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে ভাসে। সেই প্রিয়ার অস্তিত্ব আমার নিজের মন তৈরী করে নিয়েছিল। যার আদলে সুচিত্রা সেন ছিলেন কি ছিলেন না, কিন্তু তাঁকে ছাপিয়ে আর বুক-ছাপানো আনন্দময়ী সমস্ত ভুবন দখল করেছিল সেইসময়। এই গান যেন তার সন্ধানে আমাকে এখন নিয়ে গেল।

কখন রাত বেড়েছে জানি না। ঘুম ভাঙ্গল যখন তখন কানে সমুদ্রের সোঁ সোঁ আওয়াজ। আমি চেয়ারেই হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছি। ঘরের আলো নেভানো। গান বাজছে না। উঠতে গিয়ে দেখলাম একটা পাতলা চাদর আমার বুক পর্যন্ত ছড়ানো। ঝট করে উঠে পড়লাম। আলো জ্বাললাম। এখন রাত দেড়টা। পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করলাম। তারপর ফিরে এলাম নিজের ঘরে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আর মেয়েটা সেই শরৎচন্দ্রের নায়িকার ভূমিকা নিয়ে নিল! এত আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের মন মেয়েলিপনা ছাড়তে পারবে না কখনও। বেশ ভাল লাগছিল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে জ্যোৎস্নায় সমুদ্রকে ভেসে যেতে দেখলাম।

অপূর্ব। মনে হচ্ছিল কোন অদৃশ্য তুলিতে এক মায়াময় শিল্প রচিত হয়েছে আমার সামনে যার সঙ্গে পার্থিব জগতের কোন সম্পর্ক নেই। আরও ভাল করে দেখবার জন্যে আমি ব্যালকনির দিকে যেতেই দেখলাম দরজা ভেজানো। রাতের প্রথম দিকে কি আমি দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম? চুরিচামারির তেমন কোন আশংকা না থাকলেও, এমন অসাবধান হব কেন? মেয়েটা আমার সব কিছু গোলমাল

করে দিচ্ছে না তো? ব্যালকনিতে দাঁড়ালাম। দূরের সমুদ্রকে যেন এই পৃথিবীর বলে মনে হচ্ছিল না। এর ঠিক কি রঙ তা আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। আকাশের দিকে তাকালাম। সন্ধ্যার সেই গান—ঘুমঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত, বর্ণনার এমন অবিকল মিল আমি আর কখনও পাইনি।

এমন রাতে বিছানায় গিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকতে যার ইচ্ছে করে তার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আমি বালিতে নেমে এলাম। খানিকটা যেতেই ও পাশের সমুদ্র দেখতে দেখতে নিচের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। ওটা কি? ঢেউগুলো যেখান পর্যন্ত এসে ফিরে যাচ্ছে তার কিছুটা এপাশে বালির ওপর সাদা কিছু পড়ে আছে। মনে হচ্ছে জামাকাপড়। সাদা জামাকাপড় ওখানে কে রাখল?

ভাল করে সমুদ্রের ঢেউগুলো দেখতে গিয়ে তাকে পেলাম। ঢেউ-ঢেউ-এ ভেসে বেড়াচ্ছে জলপরীর মত। এই অলৌকিক চাঁদিনী সমুদ্রে তার শরীর মাঝে মাঝে উঠে আসছিল ঢেউ-এর আড়াল ভেঙ্গে। দুটো হাত ডানার মত নাড়তে নাড়তে সে উঠে যাচ্ছিল ঢেউ-এর ওপরে। আমি মুখের দুপাশে করতল এনে চিৎকার করলাম, 'মালিনী, মা—লি—নী!'

সামুদ্রিক হাওয়ার বিরুদ্ধে সেই চিৎকার বিশেষ কার্যকরী হল না। আমি আবার গলা তুললাম, 'মালিনী! ফিরে এসো!'

এবার তার প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম। একটা হাত শূন্যে তুলে কিছু বলল। শব্দগুলো হাওয়ার সঙ্গে মিলেমিশে অর্থ হারিয়ে ফেলল। ওর পিঠের ভেজা মোমরঙা চামড়ায় জ্যোৎস্না যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। হঠাৎই খেয়াল হল, এই নির্জন রাতের সমুদ্রে যখন মানুষের কোন চিহ্ন কোথাও নেই তখন মালিনী কি সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে জলে নেমেছে? এ মেয়ে কি পাগল? একজন লেখক হিসেবে ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর বলে ভাবলেও বাঙালি হিসেবে মেনে নিতে অস্বস্তি হচ্ছিল। ওই অবস্থায় ওর পক্ষে আমার সামনে উঠে আসা সম্ভব নয়। পাজামা-পাঞ্জাবির নিচে তো কিছুই ছিল না, আর সেইদুটো তো বালির ওপর ফেলে জলে নেমেছে। এখান থেকে মনে হল ও ফিরে আসার চেষ্টা করছে। আমি আড়ালে যাওয়ার জন্যে বাড়ির দিকে এগোলাম।

সিঁড়ি বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। অনেকটা দূরে এখনও। চাঁদ যেন আঁকশি দিয়ে ওকে আঁকড়ে ধরেছে। এবার ওর শরীরটাকে দেখতে পাচ্ছি। আমার দিকে হাত নাড়ল। তারপর চিৎকারটা কানে এল বাতাসের দেওয়াল সরিয়ে, 'নেমে পড়ুন।'

নেমে পড়ব? এখন, এই রাতে? যে মানুষ দিনের বেলায় জলে নামেনি স্নান করতে, রাতের বেলায় সে কোন্ অবগাহনে যাবে? এ মেয়ে নিশ্চয়ই একদিন বুঝবে সবকিছুর জন্যে জীবন সময় বেছে রাখে। আমি ওর শরীরটাকে এগিয়ে আসতে দেখছি। না, যা ভেবেছি তা নয়। ওর ঊর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গে অন্যরঙ আঁকা রয়েছে, অর্থাৎ অন্তর্বাস। তার মানে ও কি শুকুতে দেওয়া অন্তর্বাসদুটো পরেই জলে

নেমেছিল? সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়, ভেজা পোশাক নতুন করে আর কত ভিজবে।

হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এল। স্পষ্ট দেখলাম ওর শরীরটা যেন জল ছেড়ে ওপরে উঠছে। দুটো হাত তুলে কি ও চাঁদ ধরতে চাইল? আর তার পরের মুহূর্তেই জলের নিচে নেমে গেল মালিনী। এটা কি ধরনের নাটক? আমাকে ভয় দেখানোর জন্যে অভিনয়? কয়েক সেকেন্ড চলে গেল অথচ সে জলের নিচ থেকে উপরে উঠে আসছে না। আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়। তিরিশ সেকেন্ড, একমিনিট, সমুদ্র তার ঢেউ নিয়ে সমুদ্রের মত রয়েছে। আকাশ তার চাঁদ নিয়ে, চাঁদ তার জ্যোৎস্না নিয়ে ঠিকঠাক, শুধু মালিনীকে দেখা যাচ্ছে না আর।

বুকের মধ্যে একটা আশংকা ছটফটিয়ে উঠল। আমি চিৎকার করলাম, 'মালিনী!' কিন্তু সমুদ্র তেমনি শান্ত, কোথাও তার চিহ্ন নেই। এতক্ষণ কোন মানুষের পক্ষে বিনা অক্সিজেনে জলের নিচে থাকা সম্ভব নয়। ও কি ডুবে গেল? ডুবে যাওয়ার আগে ওরকম চিৎকার করল কেন? ওর শরীর কি কোন কিছু থেকে নিষ্কৃতি পেতে ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠেছিল? তবে কি মালিনী আক্রান্ত? এই সমুদ্রে নাকি কোন হিংস্র মাছ নেই। হঠাৎ সেই রহস্যময় জলপ্রাণীটির কথা মনে পড়ল। দিনের বেলায় ও যেখানটায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তার খুব কাছাকাছি মালিনী নেমে গেছে জলের নিচে। যদি আর সে না ওঠে তাহলে ওই প্রাণীটাই—! আমি আর ভাবতে পারছিলাম না। দৌড়ে নিচে নেমে বালি ভেঙ্গে সমুদ্রের গায়ে চলে এলাম। মালিনী কোথাও নেই।

'মালিনী!' চিৎকারগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ছিল। বেদম হয়ে গেলাম। রুপো রুপো জ্যোৎস্নাভেজা সমুদ্র তার ঢেউ নিয়ে একই রকম রয়ে গেল। হঠাৎ বাস্তব সত্যিটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, মালিনী আর ফিরবে না। ধপ করে বসে পড়লাম বালির ওপর। সমুদ্রের গর্জন বাড়ছে। হাওয়ার দাপটও। নিজেকে কেমন নিঃস্ব, ছিবড়ে বলে মনে হচ্ছিল এখন। আমার শরীর নীরক্ত।

এইভাবেই রাতটা কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পেলাম। দৌড়ে সাদা কাপড়ের স্তূপটার কাছে গেলাম। আমারই পাঞ্জাবি এবং পাজামা। তার পাশে বালির ওপর ছোট ছোট পায়ের ছাপ যা জলের দিকে চলে গেছে। আমার কান্না আসছিল কিন্তু কাঁদতে পারছিলাম না। পোশাকটা তুলতেই মেয়েলি বাস পেলাম। ধীরে ধীরে ফিরে এলাম বাড়িতে।

বাথরুমে যা শুকুতে দেওয়া হয়েছিল তা আর নেই। ওর গেঞ্জি আর প্যান্ট, ঝোলা রয়ে গেছে এখানে। মেয়েটাই নেই।

কি করা উচিত এখন? একটা মানুষ আমার কাছে রাত্রে থাকতে এসে সমুদ্রে উধাও হয়ে গেলে নিশ্চয়ই আমার কিছু কর্তব্য থাকে। হঠাৎ মনে হল এত তাড়াতাড়ি আমি কেন ভাবছি ও উধাও হয়ে গেছে। এমন হতে পারে ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল এবং সমুদ্র ওর শরীরটাকে ঠেলে ঠেলে তীরে রেখে দিয়েছে। এখনো সেই শরীরে

প্রাণ আছে। মনে হওয়া মাত্র ছুটলাম।

জলের ধার দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে একবার দক্ষিণে আর একবার উত্তরে ছোটাছুটি করেও কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। এদিকে চাঁদ ডুবে যাওয়ার সময় আসছে। হঠাৎ দূরে মানুষের কথাবার্তা হচ্ছে বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়ালাম। দৌড়াতে দৌড়াতে যে কখন আমি এতটা দূরে চলে এসেছি টের পাইনি।

ওরা জলে নৌকো নামাচ্ছিল। প্রায় গোটা পনের নৌকা। ভোর-রাতে মাছ ধরতে যাচ্ছে সব। আমি পাগলের মত তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ একজন শক্ত হাতে আমার কনুই ধরল, 'কি হয়েছে বাবু, আমাকে বলুন।'

আমি তাকালাম, সুজন। কাল রাত্রে সুজনের সঙ্গে ফিরে এসেছিল মালিনী, তখন সুজন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। এখন ওকে আমার দেবতা বলে মনে হল। যতটা সম্ভব কম কথায় ঘটনাটা ওকে বললাম।

'আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে গেল অত রাত্রে?'

'আমি ভাবিনি ও এমন করবে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'কিন্তু এখানে কোন হিংস্র মাছ নেই। ও ভাল সাঁতার জানতো?'

'আমি কিছুই জানি না।'

ওরা আর কথা বাড়াল না। পটু হাতে নৌকো নামিয়ে ভেসে পড়ল জলে। ঢেউ-এর বাধা কাটিয়ে চটপট ঢুকে যাচ্ছিল সমুদ্রের ভেতরে। সুজন নিশ্চয়ই ওকে খুঁজে বের করবে। ওর ওপর ভরসা করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।

নৌকোগুলো ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল দিগন্তে। শুধু একটা নৌকো ঘুরে বেড়াচ্ছে দৃষ্টিসীমার মধ্যে। ওটা সুজনের নৌকো। বেচারার আজকের রোজগার হয়তো নষ্ট হবে। সেটা কার জন্যে? আমার না মালিনীর? কিন্তু মানুষ হিসেবেই ও এমন কাজ করছে। আমি মনেপ্রাণে চাইছিলাম ও মালিনীকে খুঁজে পাক।

ক্রমশ পূবের আকাশ লাল হয়ে আসছিল। অন্ধকার এই রাতে তেমন ছিল না। চাঁদ ডুবে গেলে ওরা অস্তিত্ব ফিরে পেয়েছিল সামান্য সময়ের জন্যে। এখন নতুন আলো পৃথিবীর মুখে পড়বে। সুজনের নৌকো আর দেখতে পাচ্ছি না। সে কি হতাশ হয়ে চলে গেল তার কাজে? আমি পেছন ফিরতেই সমুদ্রে সূর্য উঠল। ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে শরৎবাবুর ঘুম ভাঙ্গালাম। দরজা খুলে তিনি আঁতকে উঠলেন, 'এ কি! কি হয়েছে আপনার?'

আমার শরীর কাঁপছিল। শরৎবাবু আমাকে বসতে দিলেন। খানিকটা ধাতস্থ হবার পর তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললাম। তিনি চমকে উঠলেন, 'সে কি!'

'হ্যাঁ। আমি এখন কি করব বুঝতে পারছি না। সুজন গিয়েছে ওকে সমুদ্রে খুঁজতে।'

'কোন লাভ হবে না। সমুদ্র নিজেই যদি ফিরিয়ে দেয় তো ডেডবডি পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি সিওর যে ওকে কিছু আক্রমণ করেছিল?'

'হ্যাঁ। যেভাবে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠেছিল মেয়েটা তাতে—।' আমার কথা

বলতে ভাল লাগছিল না। শরৎবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

আমরা অনেকক্ষণ কোন কথা বলছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত শরৎবাবু বললেন, 'আপনি আমার চেয়ে অনেক বিচক্ষণ। এই অবস্থায় আমাদের উচিত পুলিশকে খবর দেওয়া, কি বলেন?'

'পুলিশ?' আমি তাকালাম। 'হ্যাঁ, তা তো দিতেই হবে। কিন্তু কি বলা হবে?'

'সত্যি ঘটনাটা বলব।'

'পুলিশ ওর পরিচয় জানতে চাইলে তো কিছুই বলতে পারব না।'

'আপনি ওকে জিজ্ঞাসা করেননি?'

'করেছিলাম। জবাব দিতে চায়নি। ওর ব্যক্তিগত কোন কথাই আমার সঙ্গে বলতে চায়নি। মেয়েটা প্রথমদিকে সবকিছুর প্রতিবাদ করছিল।'

'প্রথমদিকে?'

'হ্যাঁ। পরে একটু শান্ত হয়েছিল।'

'মুশকিল হয়ে গেল। পুলিশ প্রথমেই জানতে চাইবে, একজন অজ্ঞাতপরিচয় মেয়েকে আমরা আশ্রয় দিলাম কেন?' শরৎবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

'সত্যি কথাটা বলা ছাড়া কোন উপায় নেই। কেউ পরিচয় না দিলে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি পুলিশকেই খবর দিন।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার আপনি ভাবেননি!'

'কি ব্যাপার?'

'ঘটনাটা কাগজে বের হবেই। মেয়েটার পরিচয় জানার জন্যে পুলিশই সেটা বের করাবে। তখন আপনি জড়িয়ে পড়বেন।'

'বুঝলাম না।'

'ওঃ, আপনার বাড়িতে মেয়েটি রাত্রে ছিল এবং সেখান থেকে মধ্যরাতে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। যে বিশ্বাস করবে না সে অন্য গল্প তৈরী করবে। আপনার মত বিখ্যাত ব্যক্তিকে পেলে বদনাম করতে অসুবিধে হবে না অনেকের।' শরৎবাবুকে সত্যিই চিন্তিত দেখাল, 'আর ব্যাপারটাকে লুকিয়ে যাওয়ার এখন প্রশ্ন নেই। আপনি তো সুজনকে বলেই দিয়েছেন।'

'মেয়েটাকে যদি অজ্ঞান অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায় তাই ওদের বলেছিলাম। ওরা মাছ ধরতে যাচ্ছিল। সুজন ছাড়া আরও অনেকে ছিল।'

'ঠিক আছে যা হবার তা হবে। দারোগাবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, দেখি সেটা কাজে লাগাতে পারি কিনা। খুব স্যাড ব্যাপার। কিছু তো করার নেই। যান, আপনি ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করুন।' নরম গলায় বললেন শরৎবাবু।

আমি উঠলাম। শরৎবাবু আবার বললেন, 'নিজেকেই দোষী মনে হচ্ছে। আমি যদি আপনার কাছে মেয়েটিকে না নিয়ে যেতাম, তাহলে এই ঝামেলায় আপনাকে পড়তে হত না।'

আমি কিছু বললাম না। চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম।

যে কোন মানুষের অকালমৃত্যু খুবই দুঃখজনক। মালিনী একটা বিকেল থেকে রাত আমার সঙ্গে ছিল। মাঝখানে সে কোথায় গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে জানি না। কিন্তু ক্রমশ আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এটা সত্যি। মানুষ যখন কারও প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তখনই সে তার আত্মীয় হয়ে যায়। সেই অর্থে মালিনী আমার আত্মীয়। আমার সেই মনের খবর ওর জানার কথা নয়, জানেও না। কিন্তু আমি অস্বীকার করব কি করে? সেই মেয়ে মরে গেলে, চোখের সামনে সেটা ঘটলে আমার স্বস্তিতে থাকার কোন সুযোগ নেই। আমার ভেতরে একটা যন্ত্রণা গুমরে উঠছিল।

কিন্তু এই দুঃখজনক ঘটনা ছাপিয়ে আর এক দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত দিলেন শরৎবাবু। লোকে আমাকে নিয়ে অনেক গুজব ছড়াবে। সাহিত্যিক নিজের সংসার ছেড়ে সমুদ্রের কাছে বাড়ি তৈরী করে তরুণী মেয়ের সঙ্গে এমন জড়িয়ে পড়েছিলে যে বেচারার মৃত্যু ঘটেছে। কেউ কেউ বলতে পারে, এটা খুন। আমিই খুন করে ওকে ভাসিয়ে দিয়েছি। যে যার মত ভাবতে পারে। আর এই ভাবনাগুলো কাগজে ছাপা হলে আমি যতই নির্জনে একা থাকি, আমার ওপর তার আঁচ এসে পড়বে। আমার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী তাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে দ্বিধা করবে না। যে পাঠক-পাঠিকারা এতদিন আমার লেখা পড়তে ভালবাসতেন——। এই অবধি ভেবেই আমি হেসে ফেললাম। জীবনটায় একটু নিজের মত থাকার জন্যে আমি সব ছেড়ে এতদূরে চলে এসেছি। অথচ মনে মনে এখনও সংসারে থাকাকালীন সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে লালন করে চলেছি। তাহলে কি লাভ হল? আমার বাড়ির লোক কি ভাবল অথবা পাঠকরা পড়লেন কি পড়লেন না তাতে আমার কিছু যায় আসে না, এমন মন তৈরী করা উচিত। যা হয় তা হবে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সমুদ্রের ধারে গেলাম। ভোরের সমুদ্র এখন স্থির। ওরই ভেতর কোথাও মালিনী শুয়ে আছে যদি তার শরীরটি অক্ষত থাকে। হঠাৎ চোখে পড়ল আমার পাজামা পাঞ্জাবি দুটোতে। বালির ওপর তেমনি পড়ে আছে। দৌড়ে নিচে নামলাম। ওগুলো ওখানে পড়ে আছে কেন? না মালিনী ওই পরে রাত্রে ছিল।

পুলিশ এই প্রশ্ন করলে উত্তরটা ওই হবে। অর্থাৎ আমার পোশাক যে মেয়েটির পরণে ছিল, তার সঙ্গে যথেষ্ট সখ্যতা হয়েছিল। আমি যার পরিচয় জানি না তাকে নিজের পোশাক পরতে দেব কেন? এর উত্তর দিতে পারব না।

ওগুলো নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম। এখনও মেয়েলি গন্ধ বের হচ্ছে।

এখনো রাধার কাজে আসার সময় হয়নি। অথবা আজই দেরি করছে সে। পুলিশ যদি এই পোশাক পায় তাহলে কি হদিস করতে পারবে যে মালিনী ব্যবহার করেছিল? পুলিশ ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারে। এগুলো ভিজিয়ে দিলে কেমন হয়? গন্ধ চলে যাবে। আমি বাথরুমে গিয়ে বালতিতে ভিজিয়ে দিলাম ওই দুটো। তার পরে গেঞ্জি আর প্যান্টটার দিকে নজর পড়ল। না, এগুলো লুকোবার কোন মানে

হয় না। মালিনীর শরীর যদি পাওয়া যায় তাহলে পুলিশ বুঝতে পারবে ও শুধু অন্তর্বাস পরে জলে নেমেছিল। সেক্ষেত্রে পোশাকের খবর নেবে তারা।

আমি পকেটগুলো দেখলাম। কিছুই নেই—শুধু গোটাকয়েক নোট। সব মিলিয়ে শ'চারেক টাকা। এই পুঁজি নিয়ে মেয়েটা বেরিয়ে পড়েছিল। টাকাগুলো ওর পকেটে ঢুকিয়ে রেখে চেয়ারে বসতেই দরজায় শব্দ হল। রাধা এসেছে।

ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

কি বলব ওকে? আমি মাথা নাড়লাম।

'আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে!'

আমি জবাব দিলাম না। সে ভেতরে চলে গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ফিরে এল রাধা, 'উনি নেই?'

'না।'

'আসবে?'

'জানি না।' চায়ের কাপ নিলাম। একজন মানুষকে জীবনযাপন করতে হলে সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে করতে হয়।

'এই প্যান্ট শার্ট—।'

'ও সমুদ্রে স্নান করতে গেছে।'

'ওমা! কি পরে গেল?'

'কাল রাত্রে, যখন আমি ঘুমিয়েছিলাম তখন স্নান করতে গিয়েছিল। কি পরে গিয়েছিল তা আমি দেখার সুযোগ পাইনি। কিন্তু তারপর আর ফিরে আসেনি।'

আমি কথাগুলো বলামাত্র রাধা মুখে হাত চাপা দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। বোধহয় সমুদ্রে চোখ বোলাল সে। আমার দিকে ফিরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি কি বলছেন?'

'প্রত্যেকটা কথা সত্যি বলছি।' আমি চায়ের কাপে চুমুক দিলাম।

'কাউকে বলেছেন? কাউকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ভোরবেলায় যারা মাছ ধরতে যাচ্ছিল তাদের বলেছি। ওদের মধ্যে সুজনও ছিল।'

আমি চা খাচ্ছিলাম। আমার এখন কিছুই করার নেই।

'এখন কি হবে?'

'আমি জানি না। শরৎবাবুকে জানিয়েছি। তিনি পুলিশে খবর দেবেন। ওর বাড়ির ঠিকানা দূরের কথা, ওর পুরো নাম জানি না। শোন, পুলিশ যদি আমাকে এ্যারেস্ট করে তাহলে তুমি এই বাড়ি দেখাশোনা করবে।' আমি চা শেষ করলাম।

'পুলিশ আপনাকে এ্যারেস্ট করবে কেন?'

'করতে পারে। আমার এখান থেকে মেয়েটা উধাও হয়েছে।'

'কিন্তু আপনি তো কিছু করেননি?'

'সেটা যদি বিশ্বাস না করে—।'

'মেয়েটাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল ও গোলমাল বাধাতে এসেছে।'

'এরকম মনে হল কেন?'

'কেন জানি না। ওর চেহারা দেখে। এর মধ্যে আমাদের গ্রামে গিয়ে সুজনের সঙ্গে আলাপ করেছে। ও রাত্রে খেয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

রাধা আর কথা না বলে ভেতরে চলে গেল। আমি চুপচাপ বসেছিলাম। তারপর উঠে বাথরুমে ঢুকে পরিষ্কার হয়ে ফিরে আসতেই দেখলাম সে দাঁড়িয়ে আছে, 'আমি যদি পুলিশকে বলি রাত্রে এখানে ছিলাম, মানে মেয়েটা ছিল বলে ছিলাম, তাহলে হয়তো পুলিশ আপনাকে দোষ দেবে না।'

'বুঝলাম না—।'

'না, মানে, একা মেয়ে আপনার সঙ্গে ছিল জানলে পুলিশ যা ভাববে—।'

'কি-যা তা বলছ, ও আমার মেয়ের বয়সী।'

রাধার ঠোঁটে এবার হাসির আভাস, 'যতক্ষণ একদম ছাই না হয়ে যায় ততক্ষণ আগুন আগুনই। লোকে বয়স ভুলে যায়।'

রাধার মুখে এমন কথা শুনব আশা করিনি। ওর মত চরিত্রের মুখে যদি আমি এই সংলাপ লিখতাম, তাহলে সমালোচকদের ভ্রূ কুঁচকে উঠত। আমার এর জবাব দেওয়া উচিত। বললাম, 'তাহলে তোমার ক্ষেত্রে লোকে বলছে না কেন? আমি এখানে একা থাকি এবং তুমি সারাদিন এই বাড়িতে কাজ কর!'

'বলছে কি বলছে না তা আপনি শুনতে গেছেন? তাছাড়া আমার সম্পর্কে বলে বলে মানুষের মুখে ব্যথা হয়ে গিয়েছে।'

মাথা নাড়লাম আমি, 'না। তুমি যখন ছিলে না তখন পুলিশের কাছে মিথ্যা কথা বলার দরকার নেই। আমি যখন কোন অন্যায় করিনি তখন কোনকিছুকে পরোয়া করি না।'

॥ ৮ ॥

বেলা যত বাড়তে লাগল তত অসহায় বোধ করছিলাম। এর মধ্যে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছি কয়েকবার। সমুদ্র শান্ত। সূর্য তার সারাশরীরে রোদ ঢেলে দিয়েছে। সেই জায়গাটায় তাকালাম। না, জলের নিচে কোন ছায়া নেই। প্রাণীটা কোথায় গেল ? আমি এখন নিশ্চিত, ওই প্রাণীটাই মালিনীর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। যাকে আমি এই নির্জনে সঙ্গী হিসেবে ভাবতাম সে-ই যে হত্যাকারী হবে তা কে জানত ! মালিনীকে প্রথমে গ্রহণ করতে পারিনি সহজভাবে কিন্তু ক্রমশ ও আমাকে জয় করে নিচ্ছিল। এখনও আমার কপালে ওর উষ্ণ স্পর্শ টের পাচ্ছি। ওঃ, কত দিন বাদে কেউ আমাকে ওভাবে ভালবাসা জানিয়ে গেছে! বুকের মধ্যে ছটফটানি বাড়ল। মনে হল ওই প্রাণীটিকে মেরে ফেলা দরকার। আমার এই হঠাৎ-পাওয়া উত্তাপকে ও-ই হিংস্রতা দিয়ে খুন করেছে যে, তাকে না মারলে আমি শান্তি পাব না। কিন্তু কোথায় পাব ওকে ? এই বিশাল জলরাশিতে ও স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকবে পরবর্তী শিকারের প্রতীক্ষায়। মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছিল।

ঘরে এলাম। মালিনীর ঝোলা থেকে ডায়েরিটা বের করলাম। তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে দেখলাম প্রথমে, কোথাও ঠিকানা লেখা নেই। একেবারে আকাশ থেকে নেমে এসেছিল সে, এসে জলের তলায় চলে গেল। 'পৃথিবীর নরম আঘ্রাণ, পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকের ম্লান নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মত প্রাণ, জানিবে না, কোনদিন জানিবে না।'

ড লেখা শুরু হয়েছে জানুয়ারি মাসের পনের তারিখে। শুরু হয়েই, শেষ। 'দিলদার, মনদার, শরীরদার। আমি কারো দয়া চাই না।' জানুয়ারির আটাশ তারিখে একটি লাইন লেখা, 'কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে।' অবাক কাণ্ড। এই লাইনটা খুব চেনা অথচ কার লাইন মনে করতে পারছি না। মালিনী এমন একটা লাইন লিখে রাখল কেন ? এরপর ডায়েরির বিভিন্ন পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুই-একটা বাংলা এবং ইংরেজি লাইন, প্রতিটি লাইন অর্থবহ কিন্তু তার সঙ্গে মালিনীর কি সম্পর্ক তা আমি বুঝতে পারছি না।

বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ হচ্ছে। কেউ আসছে। ডায়েরি ঝোলায় রেখে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই জিপটাকে দেখতে পেলাম। পুলিশের জিপ। খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছে দেখছি। জিপ থেকে ইউনিফর্ম পরা মধ্যবয়স্ক অফিসারের সঙ্গে শরৎবাবুও নেমে এলেন। আমার সিঁড়ির নিচে এসে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আসতে পারি ?'

বললাম, 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আসুন।'

বসার ঘরে বসে অফিসার বললেন, 'শরৎবাবুর কাছে সব শুনলাম। খুব স্যাড ব্যাপার। আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কি করতে পারি বলুন ?'

'যা করা উচিত তাই করুন।' এছাড়া আর কি বলতে পারি আমি !

অদ্ভুত কিছু শুনছেন এমন ভঙ্গীতে অফিসার মুখ তুললেন। তাঁর মাংসল মুখের গভীরে চোখদুটোকে ঠিকঠাক পাওয়া মুশকিল। এই লোক খুন করে এসে গান গাইতে পারে।

'বেশ, তাহলে আইনমাফিক আপনাকে কিছু প্রশ্ন করি। শরৎবাবু রিপোর্ট করেছেন, গতরাত্রে একটি মেয়ে সাগরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যায়। মেয়েটি কে?'

'আমি জানি না। ওর প্রথম নাম মালিনী।'

'মেয়েটি নাকি বিকেলবেলায় আপনার বাড়িতে এসে উঠেছিল। সে মধ্যরাতে স্নান করতে যায়। এই সময়ের মধ্যে তার পুরো নাম জিজ্ঞাসা করেননি?'

'করেছিলাম কিন্তু সে উত্তর দেয়নি। এমন কি তার বাড়ি কোথায় তাও জানায়নি।'

'অদ্ভুত ব্যাপার। তা এমন অজ্ঞাতকুলশীলাকে আপনি আশ্রয় দিলেন?'

'প্রথম কথা, শরৎবাবু বলেছিলেন। দ্বিতীয়ত, মেয়েটি আর কোথাও যেতে পারত না। আর ওর কথাবার্তায় খুব সহজ ভাব ছিল। আমি ভেবেছিলাম পরে পরিচয় জেনে নেব কিন্তু ও ইচ্ছে করেই সেটা বলতে চায়নি।'

'এত সময় থাকতে ও মাঝরাতে কেন স্নান করতে গেল?'

'জানি না। হয়তো চাঁদনী রাত দেখে। ও বেশ রোমান্টিক ছিল।'

'রোমান্টিক? কিসে মনে হল একথা?'

'কারণ বিকেলবেলাতেও স্নান করেছে সে। শুধু অন্তর্বাস পরে স্নান করেছে। এজন্যে কোন সঙ্কোচ ছিল না ওর। আমি লজ্জা পেয়ে ভেতরে চলে আসি। তাছাড়া যখন একটা মেয়ে স্রেফ একা বেড়াতে বেরিয়ে যায় তখন তাকে রোমান্টিক বলাই সঙ্গত।'

'হুম। আপনি বললেন সে বিকেলেও স্নান করতে গিয়েছিল! আবার মাঝরাত্রে যখন স্নান করতে গেল তখন ওর পরণে কি ছিল?'

'সেসময় আমি ঘুমোচ্ছিলাম। অতএব যাওয়ার সময় তার পোশাক দেখার সুযোগ হয়নি। পরে ওর প্যান্ট গেঞ্জি এখানে নেই দেখে বুঝলাম ওই বিকেলের পোশাকেই জলে নেমেছিল মেয়েটা।

কথাগুলো বলতে বলতে আমি বিকেলের ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম।

'কিন্তু বিকেলে যা ভিজে গিয়েছিল মধ্যরাতে তা শুকোবে না। ও কি ভিজে অন্তর্বাস পরেছিল, না দ্বিতীয় সেট সঙ্গে ছিল?'

'বোধহয় ছিল না, আমি দেখতে পাইনি।'

'আপনি এখানে তো একাই থাকেন?'

'হ্যাঁ। একটি কাজের মেয়ে দুবেলা রান্না করে দিয়ে যায়।'

'গতরাত্রে মেয়েটি আসায় তাকে থাকতে বলেননি?'

'প্রয়োজন মনে করিনি। ও আমার মেয়ের বয়সী।'

'ওর চেহারার বর্ণনা দিন। রেকর্ড রাখতে হবে।'

মালিনীকে মনে করার চেষ্টা করলাম, 'লম্বা, দোহারা, খুব উজ্জ্বল রঙ।'

'আপনি একজন লেখক। আপনার কাছ থেকে আরও ভাল বর্ণনা আশা করছিলাম।'

'ওর মুখে একটা আপাত-কাঠিন্য আছে।'

'ওকে কি আপনার বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা মেয়ে বলে মনে হয়েছিল?'

'না, কখনই নয়।'

এবার শরৎবাবু কথা বললেন, 'আমার মনে হয় মালিনী নামটাও সঠিক নয়।'

অফিসার আমাকে দেখলেন, 'তাই নাকি?'

'জানি না। শরৎবাবু হয়তো বলতে চাইছেন, যে কিছুই বলেনি সে ওইটুকু সত্যি বলবে কেন? কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, ওর আত্মহত্যা করার কোন বাসনা ছিল না। ওরকম মেয়ে আত্মহত্যা করতেই পারে না।'

'তবু তো করল। এরা না জেনেই আত্মহত্যা করে।'

'না অফিসার। আমার মনে হচ্ছে এটা আত্মহত্যা নয়।'

অফিসার চমকে উঠলেন, 'তার মানে?'

'ওকে কিছু আক্রমণ করেছিল জলের নিচ থেকে। আমি ওকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে দেখেছি। তারপর ডুবে গেল।'

'অসম্ভব। এই সমুদ্রে কোন ভয়ঙ্কর জলজন্তু নেই।'

'আছে। আমি শরৎবাবুকে দেখিয়েছি।'

শরৎবাবু বললেন, 'আপনি ওই মাছটার কথা বলছেন? কিন্তু ওটা যে হিংস্র তার কোন প্রমাণ পাইনি। তাই না? তাছাড়া হিংস্র মাছেরা দিনের পর দিন এক জায়গায় শান্ত হয়ে থাকতে পারে না।'

'কি মাছের কথা বলছেন আপনারা?' অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

শরৎবাবু বললেন, 'সামনের সমুদ্রের একটা জায়গায় জলের নিচে একটা বড় মাছকে প্রায়ই দেখা যায়। কি ধরণের মাছ জানি না, কিন্তু রোজ এত জেলে মাছ ধরতে সমুদ্রে যাচ্ছে কখনও কারও মুখে ওটার কথা শুনিনি।'

অফিসার বললেন, 'দেখুন, আপনি যদি খুনের অভিযোগ আনেন তাহলে আমাকে এস. পি. কে রিপোর্ট করতে হবে তা সে মানুষই খুনী হোক অথবা আপনার মাছ। তার মানে ব্যাপারটা ওপরতলায় যাবে এবং খবরের কাগজে বের হবে। এতে অবশ্য একটা সমস্যার সমাধান হবে। মেয়েটির আত্মীয়স্বজন জানতে পেরে খোঁজ নিতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু আপনার মত নামী মানুষ অসুবিধায় পড়বেন।'

'আমি জানি।'

'আপনি আপত্তি না করলে আমার কোন অসুবিধে নেই।'

শরৎবাবু বললেন, 'মেয়েটির মৃতদেহ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি না?'

অফিসার শরৎবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'নিশ্চয়ই পারি।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, 'মেয়েটির পোশাক কোথায়?'

আমি দেখিয়ে দিলাম। গেঞ্জিটা তুলে অফিসার বললেন, 'হুম্। খুব মডার্ন মেয়ে।'

প্যান্টের পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে দেখলেন। পকেট উল্টে হাতে কিছু গুঁড়ো নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটিকে কি সিগারেট খেতে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, ও স্মোক করত।'

'ড্রাগ না শুধুই সিগারেট?'

'না, ড্রাগ খাওয়া চেহারা নয়।'

'কিছু মনে করবেন না, মেয়েটির চরিত্র কিরকম?'

'বুঝলাম না।'

'আপনি কাল রাত্রে ওর সঙ্গে একা ছিলেন। আপনাকে কোন প্রস্তাব দেয়নি?'

'আশ্চর্য! আপনাকে বললাম ও আমার মেয়ের বয়সী!'

'তাতে কি কিছু এসে যায়?' অফিসার একটা গ্লাস তুলে ধরলেন। গতরাত্রে পানের পর থেকে ওটা ওখানেই পড়ে আছে। রাধা পরিষ্কার করার সময় পায়নি। নাকের নিচে নিয়ে গিয়ে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি গত রাত্রে মদ্যপান করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমি নিয়মিত দু পেগ খাই।'

'ভাল। আমি নিজে ডিসিপ্লিন মানতে পারি না। আপনার মদ খাওয়ার সময় সে কি করছিল? ও কি খেয়েছে?'

'না।'

'ভেবে দেখুন। মদ খেয়ে লোকে অনেক কাজ করে ফেলে যা স্বাভাবিক অবস্থায় করে না। হয়তো ওর তখন স্নান করার ইচ্ছে হয়েছিল!'

'আপনাকে বললাম ও মদ খায়নি।'

অফিসার মাথা নাড়লেন, 'মুশকিল হল এসব শুনলে লোকে অন্য কথা বলবে। আমার সেইটে খারাপ লাগছে।'

শরৎবাবু বললেন, 'দাদার কোন ভূমিকাই নেই এ ব্যাপারে।'

'আমিও মানছি। কিন্তু অপরিচিতা এক আধুনিকা মেয়ে, যে সিগারেট খায়, ওঁর সঙ্গে রাত্রে এই নির্জন বাড়িতে ছিল, তাকে সামনে বসিয়ে উনি মদ খেয়েছেন। আর তারপর থেকে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উনি বলছেন সে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়েছিল। কিন্তু তার কোন সাক্ষী নেই। লোকে ভাবতেই পারে মেয়েটিকে উনি কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন!'

'আমি কোথায় লুকিয়ে রাখব?' হতভম্ব হয়ে গেলাম।

'এখানে লুকিয়ে রাখার জায়গা অনেক। বালির নিচে সহজেই গর্ত করে রাখা যায়।' অফিসারের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'আপনি কি বলতে চাইছেন?' আমি রেগে গেলাম।

'এখন আমি কিছু বলতে চাই না। আপনার বিরুদ্ধে যদি এমন অভিযোগ ওঠে যে একটি অসহায় মেয়েকে রাত্রে একা পেয়ে মদ্যপান করে তার ওপর অত্যাচার করেছেন, সেটা করতে গিয়ে মেয়েটি কোনভাবে খুন হয়ে যায়। সেই খুনকে আড়াল

করতে আপনি তাকে বালির নিচে চাপা দিয়ে সমুদ্র-স্নানের গল্পটি তৈরী করেছেন—আপনি কি করে অস্বীকার করবেন?'

'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।'

'হ্যাঁ। কিন্তু মিথ্যেকে মিথ্যে বলে আপনি যতদিনে প্রমাণ করতে পারবেন ততদিন পাবলিক জানবে বিখ্যাত লেখক এই কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে আছে।'

'আপনি কি বলতে চান?'

'মেয়েটি এখানে থাকেনি।'

'তার মানে?'

'মেয়েটি যে এখানে শরৎবাবুর সঙ্গে এসেছিল তার কিছু সাক্ষী হয়তো আছে। কিন্তু শরৎবাবু চলে যাওয়ার পর মেয়েটি আপনার কাছ থেকে উধাও হয়ে যায়। আপনি সকালবেলায় শরৎবাবুকে গিয়ে জানান ঘটনাটা। শরৎবাবু থানায় খবর দেন। ব্যাস।' যেন খুব ভাল সমাধান বের করেছেন এমন ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন অফিসার।

শরৎবাবু বললেন, 'কিন্তু ওর জামাপ্যান্ট, ঝোলা তো এখানেই রয়েছে।'

'ওগুলো আজ সকালে এনক্যুয়ারিতে এসে আমি সমুদ্রের ধারে পেয়েছি।'

শরৎবাবু বললেন, 'এতে অবশ্য উনি জড়িত থাকছেন না।'

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না এঁরা কি চাইছেন? মেয়েটি আমার এখানে রাত্রে ছিল না বললে আমাকে টানা হবে না? এঁদের মাথায় ঢুকছে না কেন যে মালিনী যে ছিল না সেটাও আমার বক্তব্য। আমি সত্যি বলছি তারই বা প্রমাণ কি? নাকি কেউ প্রমাণ চাইবে না আমার কাছে? কিন্তু আমি যে আজ ভোরে মাছ ধরতে যাওয়া মানুষদের বলেছি ও সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে সেটার কি হবে?

বললাম, 'না অফিসার! আমি ওর সঙ্গে কোন অন্যায় করিনি। একটি মেয়ে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, তাকে আশ্রয় দেওয়া যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে আমি অপরাধী হতে রাজী। পৃথিবীতে কে কি এ ব্যাপারে বলছে তা নিয়ে আমি দুশ্চিন্তা করতে একটুও রাজী নই। যা সত্যি তাই বলব।'

'দূর মশাই! আপনি একই সঙ্গে নিজের আর আমার ঝামেলা বাড়াচ্ছেন।'

'আপনার ঝামেলা কিভাবে বাড়বে?'

'বাড়বে না? ওপরতলা থেকে চাপ আসবে, এনক্যুয়ারি কর। কাগজওয়ালারা গল্প লিখবে অনেক রকম। আর আমাকে দিনের পর দিন ছুটে আসতে হবে এখানে। ওঃ! সত্যি কথা ডায়েরিতে লিখতে অসুবিধে ছিল না যদি আপনার স্টেটমেন্টকে সাপোর্ট করার মত আর একজন সাক্ষী পাওয়া যেত।' অফিসার বললেন।

'কোন্ কথা?'

'ওই যে, মেয়েটি রাত্রে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়েছিল!'

'অতরাত্রে আমি সাক্ষী পাব কোথায়? ধারে কাছে কেউ থাকে না।'

এইসময় পেছনের দরজায় শব্দ হল। আমি ফিরে তাকাতেই রাধাকে দেখতে

পেলাম। মাথায় ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু বলবে?'

তার ঘোমটা জড়ানো মাথা নড়ল, হ্যাঁ।

অফিসার প্রশ্ন করলেন, 'কে?'

শরৎবাবু জবাবটা দিলেন, 'এবাড়ির কাজকর্ম রান্না করে দেয়। পাশের গ্রামে থাকে।'

রাধার এভাবে আসা আমার পছন্দ হচ্ছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বলছ?'

'আমি দেখেছিলাম।' খুব নিচু গলায় শব্দদুটো ভেসে এল।

অফিসার উত্তেজিত, 'কি দেখেছিলে?'

'মেয়েটা এ-বাড়ি থেকে নেমে সমুদ্রে গিয়েছিল।'

'তুমি দেখেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমি কোথায় ছিলে?'

রাধা চুপ করে রইল। যেন জবাব খুঁজছিল। অফিসার হাঁকলেন, 'কি হল?'

'আমি এদিকে আসছিলাম।'

'কি যা-তা বলছ? তুমি মেয়েছেলে হয়ে অতরাত্রে এদিকে আসছিলে কেন?'

রাধা জবাব দিল না।

অফিসার গলা তুললেন, 'কথা বল! অতরাত্রে এদিকে আসার কি দরকার ছিল?'

'ছিল।'

'সেটা বলতে হবে।'

'আমাকে একজন বলেছিল মেয়েটা বাবুর সঙ্গে আনন্দ করছে।'

'আনন্দ করছে মানে? কিভাবে আনন্দ করছে?'

'গান শুনছে। হৈ-হৈ করছে।'

'কে বলেছে একথা?'

'সুজন।'

'সে কে?'

'আমাদের গ্রামের ছেলে।'

'তা আনন্দ করে করুক। তাতে তোমার কি?'

'বাবু খুব ভাল মানুষ। এতে যদি বদনাম হয় তাই সতর্ক করতে এসেছিলাম।'

'বাবুর বদনামে তোমার কি এসে যায়?'

রাধা আবার চুপ করে রইল। অফিসার কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক আছে, মেয়েটাকে সমুদ্রে যেতে দেখে তুমি কি করলে?'

'আমি বাড়িতে এলাম। দেখলাম বাবু ঘুমোচ্ছেন। খাওয়া-দাওয়া করেননি, পোশাক ছাড়েননি, মানে বিকেলের পোশাকই পরে আছেন। বাবুর গায়ে একটা চাদর ছড়ানো ছিল। কেউ চেয়ারে বসে ওইভাবে চাদর নেয় না। বুঝলাম মেয়েটাই চাদর টেনে দিয়েছে। যদি বাবু মেয়েটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত তাহলে নিশ্চয়ই সে ওই

কাজটা করত না। আমি ফিরে গেলাম।'

'তোমার সঙ্গে বাবুর কি সম্পর্ক?'

'আমি এখানে কাজ করি।'

'তা করো, তার বাইরে—।'

এবার আমি প্রতিবাদ করলাম, 'অফিসার! আপনি অধিকারের বাইরে যাচ্ছেন।'

'না স্যার। এবার তো গল্পটাকে যে কেউ ত্রিকোণ প্রেমের পরিণতি বলে সাজাতে পারে। আউট অফ জেলাসি মালিনী খুন হয়েছে বললে আপনি কি করবেন?'

'মিথ্যে কথা। আমি তাকে সাঁতার কাটতে দেখেছি।'

'কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। আপনি একজন বিখ্যাত লেখক। এই কাজের মেয়েটির অতরাত্রে ফিরে আসাটাকে আপনি স্বাভাবিক বলে মনে করেন?'

'না, আমি জানতাম না ও এসেছিল। আপনারা এখানে আসার আগে ও কথাটা আমাকে বলেনি। আমি এখনও ওর কথা বিশ্বাস করছি না।'

'কিন্তু আপনার গায়ে কি চাদর চাপা দেওয়া ছিল।'

'হ্যাঁ ছিল।'

'সেটা কি আপনি ওকে বলেছেন?'

'নো। বলিনি। এইটে আমাকে অবাক করছে।'

'বেশ। আচ্ছা শোন ভাই, তুমি মেয়েটাকে যখন সমুদ্রের দিকে যেতে দেখলে তখন তার গায়ে কিরকম পোশাক ছিল?' অফিসারের চোখ ছোট হল।

রাধা মুখ তুলল। যদিও সেই মুখের অনেকটাই ঘোমটায় ঢাকা তবু যেন এক ঝলক তার চোখ আমাকে দেখে নিল। সে জবাব দিল, 'কিছু ছিল না।'

'কিছু ছিল না মানে?' অফিসার যেন আঁতকে উঠলেন।

'ভেতরের জামা ছিল।'

'তাই বল। কিছু ছিল না বললে তো কেস অন্যরকম হয়ে যাবে। ইয়েস, তুমি দেখেছ—ভাল সাক্ষী।' অফিসার আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমি এখন নিঃসন্দেহ যে আপনি এর সঙ্গে জড়িত নন। ব্যাপারটাকে আমার ওপর ছেড়ে দিন। ইন ফ্যাক্ট, মেয়েটির ডেডবডি না পাওয়া পর্যন্ত আমার কিছু করার নেই। কিন্তু—'

ভদ্রলোককে থামতে দেখে আমি তাকালাম। অফিসার এবার হাসলেন, 'আপনার শত্রু আছে।'

'আমার শত্রু? না-না, এখানে আমি কারো ক্ষতি করিনি।'

'তাহলে ওই সুজন নামের ছেলেটি কেন বলবে যে আপনি ফুর্তি করছিলেন? ও কেন এই মেয়েটিকে তাতাবে? কি স্বার্থ ওর?'

'আমি জানি না। আজ ভোরে আমিই সুজনকে বলেছি মালিনীর কথা।'

'আর একটা ঝামেলার বীজ বুনলেন। অবশ্য আমি বাছাধনকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে পারি।' অফিসার রাধার দিকে তাকালেন, 'সুজন তোমার কে হয়?'

'কেউ না।'
'তোমাকে কোন প্রস্তাব কখনও দিয়েছে?'
চুপ করে রইল রাধা। মুখ নামালো।
'তুমি রাজী হওনি?'
মাথাটা দুপাশে নড়ল। মাথা না বলে কাপড় বলাই ঠিক।
'কেন? ছেলে খারাপ?'
'আমার ভাল লাগে না।'
'তোমার এখনও বিয়ে হয়নি?'
শরৎবাবু বললেন, 'ও বিধবা।'

'আচ্ছা! তাহলে তো আরও মুশকিল। বিধবা যুবতী হলেই রহস্য বেড়ে যায়। আচ্ছা উঠি আজ। যদি কোন খবর থাকে আমাকে জানাবেন। আর আমার প্রয়োজন হলে আপনাকে যেতে হবে। জগন্নাথ সেই প্রয়োজন নিশ্চয়ই হতে দেবেন না। নমস্কার।'

অফিসার শরৎবাবুকে নিয়ে নিচে নেমে গেলেন। সঙ্গে মালিনীর সম্পত্তি নিতে ভুললেন না।

আমি কিছুক্ষণ বসে রইলাম। ওঁদের বিদায় জানাবার ভদ্রতাটুকু করতেও ইচ্ছে হল না। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না রাধার ব্যাপারটা। ও কেন কাল রাত্রে এখানে এল? সুজন আমাকে নিয়ে গল্প ফাঁদলে ওর কি এসে যায়? এটাকে কখনও প্রশ্রয় দেওয় উচিত নয়। কিন্তু ও কি সত্যি এসেছিল? পুলিশের কাছে বানিয়ে গল্প বলেনি তো? বানিয়ে যে বলেছে তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। মালিনী এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়েছিল আমার পাজামাপাঞ্জাবি পরে। সেখানে ওগুলো ছেড়ে সে জলে নেমেছিল। আজ সকালে আমি ওইদুটো ফিরিয়ে এনে বালতিতে ভিজিয়ে দিয়েছি। তাহলে ও কেন বলল শুধু অন্তর্বাস পরে মালিনী এখান থেকে সমুদ্রে গিয়েছে? পাজামাপাঞ্জাবির কথা যেমন কেউ জানে না, ওরও জানা নেই। ফলে মিথ্যেটা আমার কাছে ধরা পড়েছে। সত্যি যদি ও দেখত, তাহলে আমার অসুবিধে বাড়ত। আমার পাজামাপাঞ্জাবি মালিনীর পরণে ছিল জানলে অফিসারের গল্প তৈরীর বাসনা আরও বেড়ে যেত।

রাধা এখন এঘরে নেই। আমি উঠলাম। সোজা বাথরুমে যেতেই দেখতে পেলাম বালতিতে ভেজানো পাজামাপাঞ্জাবিটি নেই। অর্থাৎ রাধা ওগুলো কেচে শুকোতে দিয়েছে। আমার রাগ হয়ে গেল। ডাকলাম, 'রাধা!'
'যাই।' নিরীহ মুখে সামনে এসে দাঁড়াল সে।
'তুমি এরকম মিথ্যে বললে কেন?'
অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার দেখে মুখ নামাল রাধা।
'না, চুপ করে থাকবে না। তোমাকে কে বলেছিল পুলিশের সামনে যেতে?'
'ওরা আপনাকে বিপদে ফেলছিল—।'

'ফেললে ফেলবে, তোমার কি ?'
'আমার খারাপ লাগে।'
'বাজে বকো না। কদিন আমাকে চেনো তুমি ?'
'বাঃ, আমি আপনার নুন খেয়েছি না ?'
'তাই বলে মিথ্যে কথা বলবে ?'
'আমি তো কোন মিথ্যে কথা বলিনি।'
'বলনি ? তুমি কাল রাত্রে এখানে এসেছিলে ?'
'হ্যাঁ, এসেছিলাম।'
'ওফ্! আবার মিথ্যে কথা ?'
'না বাবু, মিথ্যে বলছি না। আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন।'
'আর মালিনী তার ভেতরের জামা পরে এখান থেকে বেরিয়েছিল ?'
'হ্যাঁ, তাই।'
'যেহেতু আমি বলেছি ও তাই পরে সমুদ্রে স্নান করছিল, তাই তুমি একই কথা বলে দিলে! তুমি যদি আসতে তাহলে দেখতে পেতে ও আমার পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এখান থেকে বেরিয়ে সেগুলোকে সমুদ্রের ধারে ছেড়ে জলে নেমেছিল।' আমি ওকে স্তব্ধ করার জন্যে কথাগুলো ছুঁড়ে দিলাম।
'না, পাজামা-পাঞ্জাবি ও হাতে করে নিয়ে গিয়ে বালির ওপর রেখেছিল।'
'তার মানে ?' আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।
'ও ওগুলো পরে যায়নি।'
'সে কি! তুমি দেখেছ ?'
'হ্যাঁ।'
'তখন সুজন এখানে ছিল ?'
'জানি না। তবে সন্ধ্যেবেলায় ওর সঙ্গে মেয়েটার আলাপ হয়। তারপর ফিরে গিয়ে আমার পেছনে লাগে। আপনাকে নিয়ে খারাপ রসিকতা করে।' মুখ ফেরাল রাধা।
'আমাকে নিয়ে ও খারাপ রসিকতা করেছে ?' বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি।
'হ্যাঁ। আপনার সামনে স্বীকার করবে কিনা জানি না।'
'তার দরকার নেই। মালিনীর সঙ্গে ওর কি কথা হয়েছিল জানো ?'
'হ্যাঁ। ওকে নিয়ে সমুদ্রের ভেতরে যাবে।'
'বেশ। তাই শুনে তোমার অত রাত্রে এখানে আসার কোন কারণ ছিল কি ?'
রাধা জবাব দিল না। মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।
'কি হল, জবাব দাও ?'
'আপনার জন্যে আমার ভয় করছিল।'
'ভয় ? কেন ?'

'এইসব মেয়েদের বিশ্বাস নেই। আমার বাঁ চোখের পাতা কাঁপছিল খুব। দেখুন, শেষ পর্যন্ত বিপদ তো ঘটিয়ে গেল!' সরল চোখে তাকাল।

আমার ইচ্ছে করছিল রাগে ফেটে পড়তে। আমার মঙ্গল চাইবার কোন অধিকার এই মেয়েটিকে আমি দিইনি। নিজের এক্তিয়ারের বাইরে যাওয়া ওর অন্যায় এটা মুখের ওপর বলে দেওয়া উচিত। এর ফলে ও যদি আমার কাছে কাজ না করে তাহলে কিছু আসে যায় না। কিন্তু হঠাৎই আমার মাথায় অন্য চিন্তা এল। সেটা আসায় আমি উত্তেজিত হলাম। সরাসরি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার সঙ্গে কি সুজন এসেছিল?'

সে চোখ তুলল, 'না তো!'

'ভেবে দ্যাখো।'

'ভাবব কেন? আমার সঙ্গে কেউ ছিল না।'

'ও। মেয়েটা যখন জলে নেমেছিল তখন সুজন কি ওর সঙ্গে নামতে পারে?'

'আমি দেখিনি।'

'শোন, আমি চাই না তুমি আমার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাও।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'আমার খারাপ-ভাল নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে না। এখানে যে কাজ করতে এসেছ তাই মন দিয়ে করলে খুশী হব। যাও।' বেশ উত্তেজিত হয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। রোদ চড়েছে বেশ। সমুদ্র বিলকুল শান্ত। সেই জায়গায় নজর রাখলাম। না, প্রাণীটিকে দেখা যাচ্ছে না। যাকে এতদিন সঙ্গী বলে মনে করতাম সে এখন নিরুদ্দেশ। ওটাকে খুন করতেই হবে। গতরাতের ঘটনার জন্যে ও দায়ী। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। সুজনের জলে নামার ব্যাপারটা মাথায় একটু আগে কেন এল জানি না। আমি তো নিজের চোখে মালিনীকে একাই সাঁতরাতে দেখেছি। সুজন যদি ঢেউ-এর আড়ালে থাকেও, তাহলে সে কেন মেয়েটাকে খুন করবে? খুন করার জন্যে একটা কারণ থাকা তো দরকার!

॥ ৯ ॥

দুপুরে জেলেরা ফিরে এল। ওরা কোন মৃতদেহ দেখতে পায়নি। জলে ডুবে গেলে শরীর চট করে ভেসে ওঠে না। অবশ্য ঢেউ-এর ধাক্কায় তীরের দিকে চলে আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু ওর শরীর না পাওয়া পর্যন্ত ওকে মৃত বলে ঘোষণা করা যাচ্ছে না। বিকেলবেলায় শরৎবাবুর কাছে গিয়ে এসব কথাই হচ্ছিল।

শরৎবাবু বললেন, 'আমি পুলিশকে বলেছি যাতে এই নিয়ে হৈচৈ না হয়।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মেয়েটির কথা ওর বাবা-মায়ের জানা উচিত। ওঁরা তো কখনও জানতেই পারবেন না যে মেয়ে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল!'

শরৎবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হলেন, 'কোন দরকার নেই। যাঁদের মেয়ে এভাবে একা বেরিয়ে পড়ে আর সেটা যাঁরা এ্যালাউ করেন, তাঁদের জন্যে আমার কোন সিমপ্যাথি নেই। উপকার করতে গিয়ে আমরাই বিপদে পড়েছি।'

বললাম, 'এখন মেয়ে বলে আপনি কি আর ওদের আলাদা করতে পারেন?'

'কিছু মনে করবেন না, যতই প্যান্ট শার্ট পরুক আর সিগারেট খাক, সন্তানের জন্ম ওঁদেরই দিতে হয়।' শরৎবাবু এই প্রথম এমন ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বললেন।

আমি মানতে পারছিলাম না। মালিনী আমাকে কোথাও স্পর্শ করেছে। এটা কি ধরনের স্পর্শ তা আমি জানি না। কেবলই মনে হচ্ছিল, ওর সঙ্গে আরও কথা বলতে পারলে আমার ভাল লাগত। অনেক অনেকদিন পরে কেউ একজন আমাকে ওই ভাল লাগা দিতে এসেছিল।

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে দেখলাম সুজন নিচে বসে আছে। আমাকে দেখে উঠে এল সে। ব্যালকনির আলোটা জ্বলছে। রাধাই জ্বালিয়ে রেখেছে, কিন্তু সে কাছাকাছি নেই। মুখ নিচু করে সুজন বলল, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'কেন? তোমার অপরাধ?'

'আমি কাল আপনার বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলেছিলাম।'

'তাই নাকি?'

সে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর একেবারে আচমকাই হাঁটা শুরু করল। আমি ওকে ডাকলাম, 'শোন।'

সে খুব অনিচ্ছায় দাঁড়াল।

'রাধা কি ওপরে আছে?'

'আছে হয়তো।' সে আমার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল।

'ওর যাওয়ার সময় হয়েছে। অন্ধকারে এতটা পথ যাবে, তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'মাপ করবেন।' বলেই হনহন করে চোখের আড়ালে চলে গেল সুজন।

আমি অবাক হলাম। মনে হয়েছিল আমার প্রস্তাব শুনে ও খুশী হবে। হঠাৎ কি হল? ওপরে উঠে এলাম। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকে রাধাকে ডাকলাম। 'এত রাত পর্যন্ত এখানে রয়েছ কেন? তোমাকে বলেছি কাজ শেষ করে

বিকেল-বিকেল ফিরে যেতে!'

'আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত যাওয়া যায় না।'

'তুমি একটু বেশী বুঝে গেছ। সুজনের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'ও কথা বলতে এসেছিল, আমি বলিনি।'

'কেন?'

'কথা বলতে আমার ইচ্ছে হয়নি।'

'ঠিক আছে, সে চলে গেছে, তুমি যেতে পার।'

রাধা চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

আমি তাকালাম। সেটা দেখে সে প্রশ্ন করল, 'আমি এখানে কাজ করায় আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

'একথা তোমাকে বলেছি?'

'বললে আমি কাল থেকে আসব না।'

'তোমার সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই, শুধু আমাকে নিয়ে বেশী ভেবো না!'

'আপনার সম্পর্কে কেউ কখনও ভাবেনি, না?'

'তার মানে?'

'সেই জন্যে কেউ একটু ভাবলে আপনি সহ্য করতে পারেন না।' রাধা চলে গেল।

ঠিক করলাম শরৎবাবুর সঙ্গে ওকে নিয়ে কথা বলতে হবে। এইসব সংলাপ বাড়ির কাজের লোকেব গলায় কিছুতেই মানায় না। আকারে ইঙ্গিতে ও পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে আমার সম্পর্কে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ওর প্রতি আমি কোন আকর্ষণ বোধ করছি না, এর কারণ ও আমার কাজের লোক নয়—আমার রুচির সঙ্গে ওর কোন মিল হতে পারে না। শুধু একটি নারীশরীর আমাকে আর আকর্ষণ করতে পারে না। তার জন্যে অন্যকিছু চাই। সেই অন্য কিছু বয়স প্রচুর কম হওয়া সত্ত্বেও মালিনীর মধ্যে ছিল।

গতরাতে মালিনী এখানে ছিল। এই ঘরে। আমারই পাজামাপাঞ্জাবি পরে সে এখানে ঘুরছিল। আমি চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বসে দেখলাম আমার হুইস্কির বোতলের পাশে জলের জাগ আর গ্লাস রাখা আছে। অর্থাৎ এই কর্মটি রাধা করে গেছে। আমাকে কৃতার্থ করার প্রয়াস হয়তো। আমি গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে জল মিশিয়ে নিলাম। এভাবেই এখানে বসে গতকাল মদ্যপান করেছি এবং মালিনীকে দেখেছি। আচ্ছা, সত্যি কি মেয়েটা মরে গেল? এমনও তো হতে পারে, ও সাঁতরে অন্য কোথাও উঠে উধাও হয়ে গিয়েছে? এই জামাপ্যান্ট অথবা ব্যাগটাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে যেতে ওর কোন অসুবিধে হয়নি। যে কোন মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ও বলতে পারে, 'আমাকে একটা পোশাক দিন, পরব।' তারপর চলে গেছে অন্য কোথাও।

আমি মনে মনে তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করলাম। কখন রাত গড়িয়ে কি

হচ্ছে আমি জানি না। ক্রমশ শূন্য গ্লাসে নতুন তরল ঢালার কথাও মন থেকে হারিয়ে গেল।

পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা/বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা/রূপসীর সাথে এক; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মত রেখা/প্রাণে তার—ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মত কালো;/একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো/নিভে গেছে...।

ভোরবেলায় নিজেকে আবিষ্কার করলাম। আমি বসে আছি আমার চেয়ারে। দরজা খোলা, আলো জ্বলছে। মাথার ভেতরে দপদপানি। গায়ে ঈষৎ তাপ। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল মালিনী নেই। নিজেই হাসলাম। কে মালিনী? পরশুর আগে তাকে আমি চিনতাম না। গতকাল তার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবু এত প্রবলভাবে সে ফিরে ফিরে আসছে কেন আমার মনে? আমার সন্তানের বয়সিনী একজন কি করে এমন বন্ধুব মত উঠে আসছে বুকের কাছে? জীবনানন্দের সেই বোধে কি আমি আক্রান্ত? স্বপ্ন নয়-শান্তি নয়-ভালবাসা নয়, হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়! এর কোন ব্যাখ্যা আমার জানা নেই।

আলো নেভালাম। জানলাগুলো খুলে দিলাম। রোদ এল। এবং সেই সঙ্গে রাধা আমাকে দেখে অদ্ভুত চোখে তাকাল। আর সেই দৃষ্টি দেখে আমি মনে মনে বিরক্ত হলাম। হঠাৎ আমার মনে হল, ওর উপস্থিতি আমাকে বিব্রত করছে। আমার বুকে যে ওম্ মালিনী এনে দিচ্ছে তা রাধা আসায় হারিয়ে যাচ্ছে! এখানে আর কারও উপস্থিতি আমার দরকার নেই। কিন্তু ওকে কি করে বলব চলে যেতে? একটা অজুহাত চাই। সেটা পেলে ওকে আমার দরকার নেই।

একটু বাদে চা নিয়ে এল রাধা। কাপটা হাতে নিতে নিতে লক্ষ্য করলাম ওর পোশাক যেন অন্যরকম। সাগরনীল জামা গায়ে। শাড়ি পরার ধরণ যেন পাল্টেছে আর তার ফলে যৌবন বেশ স্পষ্ট। চা দিয়ে সে চলে গেল। আমি চুপচাপ চা খেলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম বাইরে।

সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাওয়া-দের খেলা সর্বাঙ্গে অনুভব করলাম অনেকক্ষণ। মাথার ওপর রোদ চড়ছে। জলে পা দিলাম। এই জলের কোথাও কি মালিনী শুয়ে আছে? হঠাৎ মনে হল, আমি বোধহয় স্বাভাবিক নই। সুস্থ লোকের মত আচরণ করছি না আমি। আমার চোখ টানছিল। হাঁটতে গিয়ে বুঝলাম শরীর বিকল হচ্ছে। কোনরকমে ফিরে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মনে হল অনন্তকাল ধরে হাঁটছি। দরজা বন্ধ। বেল বাজালাম। বেশ জোরে। এত জোরে কেন বাজালাম জানি না। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। রাধা দরজা খুলে অবাক হল। আমি হাত নাড়লাম, 'সরে যাও। আমি শোব, আমাকে শুতে দাও।'

বিছানায় শোওয়ামাত্র মনে হল আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আমার কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই এবং কেউ হু-হু করে নিচে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম

জানি না, হঠাৎ সমস্ত বোধ ফিরে এল। সেই সঙ্গে যন্ত্রণা। মাথার দুপাশে সেটা যেন মাত্রা ছাড়াল। আমি আঃ ওঃ শব্দ ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। এবার কপালে শীতল স্পর্শ। সেই স্পর্শ স্থির হতে পারছে না। স্থির হলে, কপালের ওপর চেপে বসলে বোধহয় আরাম লাগত। আমি চোখ বন্ধ অবস্থায় বললাম, 'জোরে, আরও জোরে।'

এবার কপালের চারপাশে চাপ পড়তে লাগল। আঙ্গুলের ডগাগুলো যন্ত্রণা সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল যত্ন করে। কী আরাম! ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে, গলা। সমস্ত শরীরে অবসাদ, জ্বর কি আরও বেড়েছে? যন্ত্রণা একটু কমের দিকে। ফুলে ওঠা ভাতের ফ্যান যেমন হাওয়ার স্পর্শে মাথা নোওয়ায় তেমনি ওটা এখনও থাকার জন্যেই আছে। আমার গালে, ঘাড়ে অন্য স্পর্শ। সেই স্পর্শের যেহেতু বিকল্প নেই, পুরুষ হিসেবে আশৈশব আমার চেনা, তাই এত ক্লান্তিতেও চোখ মেললাম। সে আমাকে শিশুর মত প্রায় কোলে তুলে নিয়েছে। তার শরীরের সমস্ত সম্পদ এখন আমার চোখের সামনে। আমি আমার দৃষ্টিক্ষুধা মেটাতে চাইলাম।

হঠাৎ খেয়াল হল এই মানুষটি কে? যেটুকু চৈতন্য ফিরে এসেছিল তাতে উত্তরটা পেতে দেরি হল না। আমি চোখ বন্ধ করলাম। আমি কতক্ষণ শুয়ে আছি? এখন কটা বাজে? রাধা এভাবে আমার সেবা করে চলেছে একা? আমাকে জড়িয়ে ধরে সেবা করতে ওর তো বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হচ্ছে না! কিন্তু এমনভাবে জড়িয়ে ধরার কি দরকার আছে? ও তো বেশ দূরত্ব রেখে আমার মাথা টিপে দিতে পারত! আবার চোখ খুললাম। আমার যে জ্ঞান ফিরে এসেছে তা রাধা জানে না। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না যেমন তেমনি ও আমাকেও বুঝতে পারছে না। কিন্তু আমি সুজনের কথা ভাবলাম। বেচারা সত্যি বেচারা। এমন সম্পদ মুক্ত অবস্থায় দেখেছিল বলেই এতদিন স্মৃতি বহন করে চলেছে। আমি কোনরকমে বললাম, 'ঠিক আছে।'

চাপ আলগা হল। ধীরে ধীরে সরে গেল সেটা। আমি রাধাকে দেখলাম। তার মুখে উদ্বেগ, 'এখন কেমন লাগছে?'

উত্তর দিলাম না। কারণ হঠাৎই মনে হল, এতক্ষণ আমি ভাল ছিলাম এখন নেই। সত্যি কথাটা বলা উচিত হবে না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কটা বাজে?'

'তিনটে।'

জানলা দিয়ে আলো আসছে। এখন শেষ দুপুর। বললাম, 'থার্মোমিটার আছে ওই ড্রয়ারে, নিয়ে এসো।'

রাধা দাঁড়িয়ে রইল। থার্মোমিটার শব্দটা সম্ভবত ওর অচেনা। বললাম, 'ওই টেবিলের ড্রয়ার খুললে দেখবে ছোট সরু কাগজের বাক্স রয়েছে, নিয়ে এসো।'

এবার সে খুঁজে পেল। বগলের উত্তাপ নিলাম, একশ দুই। অর্থাৎ ভালই জ্বর। নিশ্চয়ই আরও বেড়েছিল। সারারাতের উদ্বেগই আমাকে অসুস্থ করেছে। কিন্তু হঠাৎ চৈতন্য চলে গেল কেন? এরকম তো কখনও হয়নি!

বিছানা থেকে নামতে রাধার সাহায্য নিতে হল। কলকাতায় থাকতে মাঝে মাঝে প্রেসার বাড়ত, কমত। এখন সেটা কি অবস্থায় আছে জানি না। এই সমুদ্রসৈকতে

ডাক্তার নেই। একটা হেলথসেন্টার আছে মাইল কুড়ি দূরে। তার দরজা আবার প্রায়ই বন্ধ থাকে। রাধা আমার মাথা ধুইয়ে দিল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে পা মুছিয়ে দিলে ভাল লাগল খানিকটা। হাল্কা কিছু খেয়ে জ্বরের ট্যাবলেট গিললাম। তারপর আবার বিছানায় গিয়ে ঘুম। সেই ঘুম ভাঙ্গল অনেক রাত্রে। ঘাম হচ্ছে এবং রাধা আমার পাশে বসে যত্ন করে ঘাম মুছে দিচ্ছে। অদ্ভুত কাণ্ড! উঠে বসতেই সে সোজা হল।

'এসব করার দরকার নেই। তুমি বাড়িতে যেতে পার।'

'না।'

'না মানে? তুমি রাত্রে থাকবে নাকি?'

'এখন বাড়িতে যাওয়া যায় না। বারোটা বেজে গেছে।'

'সর্বনাশ! আমাকে ডাকোনি কেন?'

'আপনার শরীর খারাপ।'

'তাতে কি হয়েছে! ছি ছি ছি!'

'আপনি এমন করছেন কেন?'

'খামোকা তুমি এখানে রাত্রে আছ। লোকে কথা বলতে ছাড়বে না।'

'যে যাই বলুক, আমার কিছু এসে যায় না। আপনার অসুখ দেখে আমি যেতে পারব না।'

'রাধা, আমি এসব পছন্দ করছি না।'

হঠাৎ সে শব্দ করে হাসল।

'তুমি হাসছ কেন?'

'আপনি জ্বরের ঘোরে আমার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলছিলেন, যেও না যেও না।'

'আমি?' নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

'সত্যি বলুন তো, জেগে উঠলে আপনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন কেন?'

'তুমি এখনই চলে যাও।'

'এতরাত্রে যেতে পারব না।'

'তাহলে এমন রাত্রে গ্রাম ছেড়ে এখানে একা এসেছিলে কি করে?'

'ভাগ্যিস এসেছিলাম! নইলে আপনার কথার সাক্ষী পুলিশ পেত না।'

'তুমি কি চাইছ? এইসব করে আমাকে জয় করবে?

'মোটেই না। আপনি যদ্দিন একা আছেন তদ্দিন আমি এখানে থাকলে আমার ভরসা হয়। যে মেয়ের কেউ নেই তার মাথার ওপরে একজন এসে গেলে সে কি পায় তা আপনি বুঝবেন না। কিছু খাবেন? সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি।'

'না, আমাকে একা থাকতে দাও।'

রাধা চলে গেল। আমার ঘুম আসছিল না তার কারণ খিদে পাচ্ছিল। হঠাৎ

খেয়াল হল, আমি যেমন খাইনি রাধাও কি তেমনি অভুক্ত আছে? আমার স্ত্রী হলে কি করতেন? না খাওয়া এক ধরনের বোকামি—যা শরৎচন্দ্রের নায়িকারা করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

আমি চোখ সরালাম বাইরে। জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখলাম। আজও তেমনি জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে সমুদ্র। সব ঢেউ সব কিছু ঠিকঠাক। অথচ আজ সে নেই। কিন্তু কাল ছিল। সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না। সে সমুদ্রের ঢেউ নিয়ে, যে খেলায় মেতেছিল তা দেখার জন্যে আকাশে উৎসব শুরু হয়েছিল। অথচ আমি, আমার মনের পাপ—তাকে টেনে নিয়ে আসতে চাইছিলাম মাটিতে। আর।

বিছানা থেকে নিচে নামলাম। সমুদ্রের শব্দ ছাড়া কোন আওয়াজ নেই কোথাও। পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। রাধা বসে আছে চুপচাপ তার জানলার পাশে। মাথার ওপর আড়াআড়ি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। এ রাধাকে আমি চিনি না।

শান্ত গলায় বললাম, 'তুমি কিছু মনে করো না।'

'আপনি উঠে এলেন কেন?' সে চমকে উঠল।

'এই কথাটা বলতে। আসলে তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'কেন?'

'মালিনী এসেছিল বলে।'

'কি ছিল মালিনীর যা আমার নেই?'

'সেটা তুমি কখনও বুঝবে না।'

'আমি জানি।'

'কি জানো?'

'আমার বয়স।'

'দূর। বললাম তো, তুমি বুঝবে না।' ঘুরে দাঁড়ালাম, 'তাছাড়া, আমি নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না আর।'

'আপনি অবিশ্বাসের কাজ করলে আমার বিশ্বাস বাড়বে।'

হতবাক হয়ে গেলাম। ওর দিকে তাকালাম, 'একি কথা বললে তুমি?'

'কেন?'

'তুমি জানো না কোন্ গভীর থেকে বোধ উঠে এলে এমন অর্থপূর্ণ কথা বলা যায়। আমি যদি লাবণ্যের মুখে এই কথা বসাতাম, লোকে বলত ঠিক হয়েছে। কিন্তু আদর্শ হিন্দু হোটেলের পদ্ম কখনও এটা বলতে পারে না। তুমি বললে কি করে?'

'ওরা কারা?'

'এইখানেই—এইখানেই পার্থক্য। মালিনী জানত ওরা কারা, তুমি জানো না। তুমি জানো না বলেই তোমার সঙ্গে কথা বলে কোন সুখ নেই আমার।'

ফিরে এলাম নিজের ঘরে। কিন্তু ওর বলা কথাটা যেন আমাকে আঁচড়াচ্ছিল।

নিজের কানে শুনেছি বীরভূমের দরিদ্র গ্রামবাসী এমন সব সংলাপ বলতে পারেন যা কলমের ডগায় চট করে আসে না। বাউল-আউলদের কথায় যে আধ্যাত্মিক মশলা থাকে তাতে যেন তাদের অধিকার আছে বলে আমরা মেনে নেই। লেখার সময় তারাশংকর ওদের মুখে যে সংলাপই বসান না কেন, আমরা তা নিয়ে কোন প্রশ্ন করি না। কিন্তু সাধারণ মানুষের গল্প লিখতে গেলে শ্রেণীবিভাগ না করলে সমালোচক বিরক্ত হন। চাকর বাবুর গলায় কথা বলবে না। ব্রিটিশ অথবা ওলন্দাজ যাই হোক না কেন, হামি টুমি বলে কথা বলতে হবে তাকে। আমরা নিয়মটা বানিয়ে নিয়েছি। তাই রাধার মুখে এই সংলাপ আমি কখনই লিখতে পারব না। অথচ শুনতে হল।

॥ ১০ ॥

সকালবেলায় শরৎবাবু এলেন। সঙ্গে একটি খবরের কাগজ। তাঁর মাতৃভাষার কাগজটি আমার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। আমি চুপচাপ ঘরে বসেছিলাম। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে আপনার ?'

'হঠাৎ জ্বর এসেছিল। এখন ঠিক আছি।'

'আপনার টেনশন বুঝতে পেরেছি। তবে সেটা করার দরকার নেই।'

'কি রকম ?'

'এই দেখুন, আজকের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে। লিখেছে কলকাতা থেকে একটি মেয়ে এখানে বেড়াতে এসে হঠাৎ উধাও হয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে যে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেছে। মেয়েটির চেহারা বর্ণনা মোটামুটি দেওয়া আছে।'

'আর ?'

'আর কিছু নেই। আপনার বা আমার নাম কোথাও ছাপা হয়নি।'

'খবরটা ওরা পেল কি করে ?'

'বোধহয় দারোগাবাবুই দিয়েছেন।'

'কিন্তু মালিনী যে কলকাতা থেকে এসেছিল তার কোন প্রমাণ নেই।'

'আমাকে তো তাই বলেছিল।'

আমি চুপ করে রইলাম। একটু কি হাল্কা লাগছে এখন ? ওই খবর যদি কলকাতার কাগজে বের হয়, তাহলে লোকে আমাকে জড়াতে পারবে না। কেউ জানবে না ঘটনাটা। কিন্তু।

শরৎবাবু বললেন, 'আপনার এই চিঠি এসেছে।'

আমি ওঁর হাতে খাম দেখলাম। খুলে জানলাম আমার মোটরবোট তৈরী। যে কোনদিন ওরা এখানে পাঠিয়ে দেবে। ওঁকে বললাম কথাটা।

শরৎবাবু বললেন, 'ভালই হল। একঘেয়েমি কাটবে।' এইসময় রাধা চা নিয়ে এল। সে চলে গেলে আমি বললাম, 'আপনার সঙ্গে রাধাকে নিয়ে কিছু কথা ছিল।'

'কোন গোলমাল করছে ?' শরৎবাবু চায়ে চুমুক দিলেন।

'না, ঠিক তা নয়। আসলে একজন মেইড-সার্ভেন্টের যেরকম থাকা উচিত ও তা থাকছে না। সব ব্যাপারে ইনভলভ্ড হতে চাইছে। ওকে কিভাবে চলে যেতে বলা যায় ?'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না। যদি ওর কোন কাজ পছন্দ না হয় সেটা করতে বারণ করুন।'

'তার চেয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া ভাল। আপনি ওকে এনেছেন, আপনিই বলতে পারেন—।'

'না মশাই, আমি এনে দিয়েছি ঠিকই কিন্তু আপনার অসুবিধে হলে আপনি ওকে

বরখাস্ত করবেন। আমি অবশ্য অপরাধটা স্পষ্ট জানি না।' শরৎবাবু গম্ভীর গলায় বললেন।

আমার মনে হল শরৎবাবু উষ্ণ হয়েছেন। দু-দুবার লোক দেখে দিয়েছেন তিনি, আর আমি তাদের বেশীদিন ধরে রাখতে পারছি না—উনি উষ্ণ হতে পারেনই। রাধা চলে গেলে নতুন লোক পেতে অসুবিধে হবে। আমার আর একটু ভাবা উচিত।

'ঠিক আছে, আর একটু দেখি।' আমি কথা শেষ করতে চাইলাম।

এইসময় বাইরে কিছু লোকের কথা শোনা গেল। শরৎবাবু বললেন, 'আপনি বসুন, আমি দেখছি।' উনি ব্যালকনিতে চলে গেলে আমার মনে হল, ওরা বোধহয় মালিনীর দেহ খুঁজে পেয়েছে। এখানে ওরকম কোন ব্যাপার না হলে মানুষের উত্তেজিত হবার মত ঘটনা ঘটে না।

শরৎবাবু তাঁর মাতৃভাষায় প্রশ্ন করছিলেন, জবাবও তাই আসছিল। ভাষাটা আমি ঠিক বলতে না পারলেও বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। আমি ধীরে ধীরে শরৎবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দীনবন্ধু এবং আরও জনাচারেক মানুষ সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখে দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু, কাল রাত্রে রাধা কি বাড়ি গিয়েছিল ?'

শরৎবাবু বললেন, 'তোমাদের তো বললাম উনি খুব অসুস্থ ছিলেন বলে ও বাড়ি যায়নি।'

'আমরা বাবুর মুখে শুনতে চাই।' দীনবন্ধুকে বেশ রাগী দেখাচ্ছিল।

'কেন ? কি হয়েছে ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'গ্রামে কেউ কেউ বলছে, ও নাকি এখানেও ছিল না।' দীনবন্ধু জবাব দিল।

'এখানে না থাকলে কোথায় যাবে ?'

'অনেকেই তো বদনাম দেয় ওকে।'

আমার হঠাৎ রাগ হয়ে গেল, 'যাদের ওর ওপর খারাপ নজর আছে তারাই বদনাম করে। রাধা কাল রাত্রে এখানে ছিল। আমার খুব জ্বর এসেছিল দেখে ও বাড়ি যেতে পারে নি।'

দীনবন্ধু তার সঙ্গীদের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলল। সম্ভবত উত্তেজনা কমাতে চাইল। আমি বললাম, 'শোন দীনবন্ধু, তোমাদের যদি মনে হয় রাধা এখানে থেকে অন্যায় করেছে তাহলে আমি এখনই ওকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি। কলকাতা ছেড়ে এখানে আমি এসেছি শান্তিতে থাকব বলে, নতুন সমস্যায় জড়াতে চাই না। তবে সেক্ষেত্রে তোমাদের কর্তব্য হবে রাধার যাতে কোন অসুবিধে না হয় তা দেখা।'

দীনবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল, 'ছি ছি ছি! এখানে থাকলে সে অন্যায় করবে কেন ? আপনি ওর বাবার মত। আপনি আসায় মেয়েটা একটা ভাল আশ্রয় পেয়েছে। এ নিয়ে আমরা কেউ কোন কথাই বলিনি। ওই কে রটিয়ে দিল সে রাত্রে গ্রামের বাইরে গেছে, ব্যাস, সবাই সেটাই বিশ্বাস করতে চাইল। আপনি যখন বলছেন তখন আর কোন কথাই ওঠে না। আসি বাবু, নমস্কার।' দীনবন্ধুরা চলে গেল।

এবার শরৎবাবু হাসলেন, 'আপনি কিন্তু সুযোগ পেয়েছিলেন।'

‘কিসের ?’

‘রাধাকে সরিয়ে দেবার। না দিয়ে উল্টে ওকেই সাপোর্ট করলেন।’

‘হ্যাঁ। খামোকা ওকে দোষী করছে ওরা, এটা অবশ্য সব জায়গায় হয়ে থাকে।’

‘আমি চলি। আপনি এখন কদিন বিশ্রাম করুন।’

‘মেয়েটার কোন খবর নেই ?’

‘না। মনে হয় সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে। চোরা ঢেউ বডি নিয়ে গেছে মাঝ-সমুদ্রে।’

শরৎবাবু পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেলেন, ‘আপনার সেই মাছটা কোথায় ?’

আমি তাকালাম। অত কড়া রোদে জলে চোখ রাখতে অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু সেই জলপ্রাণীটিকে এখনও দেখতে পেলাম না। বললাম, ‘এখন তো দেখছি না। এক জায়গায় আর কদিন থাকবে!’ শরৎবাবু চলে গেলেন।

মাছটা সত্যি নেই। আমি চোখ মেললাম। দিগন্ত বলে কিছু নেই। জল আর জল সমস্ত আকাশটাকে টেনে নিয়েছে বুকে। এই বিপুল জলরাশির কোন্ কোণে মাছটা এখন খেলে বেড়াচ্ছে কে জানে! কিন্তু হঠাৎ ও চেনা জায়গা ছেড়ে পালালো কেন ? অপরাধীরাই সাধারণত এমন কাজ করে। ওই মাছটাই মালিনীকে খুন করেছে এবং এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। যদি কোনদিন সুযোগ পাই— !’

‘বাবু!’

ফিরে দেখলাম রাধাকে। সে বলল, ‘আমি এখন কি করব ?’

‘কি করব মানে ? যা করার তাই কর।’

‘না! আমি কি কোন অন্যায় করেছি ?’

‘অন্যায় করলে নিজেই বুঝতে পারবে।’

হঠাৎ সে হেসে ফেলল। স্বস্তি ফিরে পেলে মানুষ এইভাবে হাসতে পারে, ‘আপনার চা একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর এক বার করে দেব ?’

‘দাও।’

বলামাত্র সে যেন পাখির মত উড়ে গেল। মন বলল, থাক। পুরুষমানুষের জীবনে একটু স্নেহ দেখানোর জন্যে কারো থাকা প্রয়োজন। আমি এখানে একদম একা থাকতে পারি, নিজে রান্না করে খেতে পারি। কিন্তু সেই পারাটা পারতে গিয়ে আমি নিজেকে ঠিকঠাক রাখতে পারব কিনা জানি না। বরং এই ভাল।

॥ ১১ ॥

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে, বসন্তের রাতে, বিছানায় শুয়ে আছি, এখন যে কত রাত। ঝটপট বিছানায় উঠে বসলাম। কানের পর্দায় অবিরত ঢেউ-এর আওয়াজ। এই লাইনগুলো কিভাবে মনের গভীর থেকে উঠে উঠে এল ? আমি নিশ্চিত, জীবনানন্দের কবিতাটি পড়েছি অন্তত পঁচিশ বছর আগে। পঁচিশ বছর পরে এই মনে পড়া লাইনগুলোর প্রতিটি শব্দ ঠিকঠাক আছে। আজকের এই গভীর রাতের আমার সঙ্গে লাইনগুলোর কি চমৎকার মিল। জীবনানন্দ কি আমার কথা ভেবে কবিতাটা **লিখে**ছিলেন ? এখন বাইরে জ্যোৎস্না খান খান হয়ে রয়েছে। রাত কত জানি না। আমার ঘুম আসছে না। বাড়িতে কেউ নেই। সন্ধ্যে নামার আগেই রাধা তার গ্রামে ফিরে গিয়েছে। শুধু হাওয়া আর আমি। কিন্তু ওই পরের লাইনটা যে আধা সত্যি, সেই যে, জানলার থেকে ওই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে, চোখ আর চায় না ঘুমাতে ; সাগরের জলের বাতাসে আমার হৃদয় সুস্থ হয়।

কোথায় হল ? সুস্থতার জন্যে চলে এসেছিলাম এই সমুদ্রের ধারে। বেশ ছিলাম। আসলে বেশ থাকার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ মেয়েটা এসে কেমন যেন নাড়িয়ে দিয়ে গেল আমাকে। কোন শরীরের স্বাদ বিনিময় নয়, মনের সঙ্গে মনের কোন ওস্তাদি মিলন নয়, অন্য কিছু, একেবার অন্যরকম একটা আনন্দ ফিরে পেলাম আমি যখন ঘুম ভেঙ্গে দেখেছিলাম সে সমুদ্রে সাঁতার কাটছে জোৎস্নায় ভেসে ভেসে। একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়——

নিঃসঙ্গ বুকের গানে/ নিশীথের বাতাসের মতো/ একদিন এসেছিল/ দিয়েছিল এক রাত্রি দিতে পারে যত।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটু শীত শীত লাগল। কিন্তু সামনে শঙ্খনীল আকাশ, আর কি আরাম। যেদিন আমি মরে যাব সেদিন যেন আকাশ এমন থাকে। আমি জানি না আজকাল মৃত্যুর কথা প্রায়ই মনে আসে কেন ? কোন সুন্দর জিনিষ দেখলে, ভাল গান শুনলে অথবা আকাশের নক্ষত্রেরা যখন ঝুঁকে আসে তখন আমার মরে যাওয়ার কথা মনে আসে। যেতে তো হবেই। সেটাকে একপাশে রেখে একটু বেঁচেবর্তে থাকতে ক্ষতি কি ? সমালোচকরা বলবেন, এও একধরনের রোমান্টিসিজম ! আমার রামদাকে মনে পড়ে। অমন সন্ন্যাসী মানুষ আমি দেখিনি। সংসারে থাকতেন, খুব খেতে ভালবাসতেন, কোন অনুরোধে না বলতেন না সেটা অসম্ভব হলেও এবং ওঁর দুবার হৃদয় আক্রান্ত হয়েছিল। সাবধান হতে বললে বলতেন, 'দূর মশাই, মরার আগে তো মরব না। আর একবার যদি মরেই যাই তাহলে এই বডিটার কি হল দেখতে আসব না।'

'আপনি নিজেকে বডি বলছেন ?'

'প্রাণ চলে গেলে সেটা তো তাই। একবার ভেবে দেখুন, জন্মেছিলাম সাত পাউণ্ড ওজন নিয়ে। নরম চামড়া, বোধহীন। শুধু খিদে ছাড়া কিছু বুঝতাম না।

একটু একটু করে শরীরের সব হল। তাতে রেখা পড়তে লাগল। মোটা হতে হতে চামড়ার দাগ দাগ-রাগ হয়ে গেল। এখন ঝুনো নারকোল। সবই তো দেখতে হল মশাই। তবু প্রাণ আছে বলে বহন করে চলেছি। আপনারা আবার তাই নিয়ে কাব্য করেন।'

বলেছিলাম, 'রামদা, আপনি অদ্ভুত!'

'সেটা হতে পারলে কিছু হওয়া যেত। এই যে আপনার দাদা সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু—কোথায় গেলেন তাঁরা? তারাশংকর বিভূতিভূষণ আছেন? হেমন্তবাবু কি আর গান শোনান? এমন কি অত সুন্দর চেহারার উত্তমকুমার, সেটাও তো পুড়ে ছাই। তবু যতদিন বাঙালির শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ থাকবে ততদিন ওঁরা বেঁচে থাকবেন। আমাদের বাঁচার কোন চান্স নেই। মরে যাওয়ার পরের বছর ছেলেমেয়েরা হয়তো ফটোতে ফুলের মালা ঝোলাবে তারপর ঝুল।' গলা নামিয়ে বলতেন রামদা, 'তাই বলি, ভগবান যখন ক্ষমতা দিয়েছেন তখন একখানা লেখা লিখুন যা আপনার আয়ু অন্তত শ'খানেক বছর বাড়িয়ে দেবে।'

আজ রামদা নেই। এই জ্যোৎস্নালোকে লোকটির কথা মনে এল। রাত এগারোটায় আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে শীতের রাস্তায় তৃতীয়বার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে চলে যান তিনি। ওঁর শরীর আবিষ্কার করি হাসপাতালের মর্গে। তখন সেটা বডি হয়ে গেছে। রামদা অবশ্যই সেটা দেখতে আসেননি।

সমুদ্রের ওপর নজর রাখলাম। ওর কোথাও কি মালিনী শুয়ে আছে? আর তাহলে এতক্ষণ ওর নরম শরীরটা রামদার ভাষায় বডি হয়ে গেছে। মাছেরা নিয়ত খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে ওকে। এখনও কি কিছু অবশিষ্ট রয়েছে?

আমি ঠোঁট টিপে নিজেকে সামলালাম। আরও বছর পঁচিশ আগে যদি ওর সঙ্গে দেখা হত তাহলে এভাবে মরতে দিতাম না। কেন যে ও পঁয়তাল্লিশ বছর আগে জন্মাল না!

পঞ্চাশে পৌঁছে আমি যতই আধুনিকতার সঙ্গে বসবাস করি না কেন, পিতা পিতামহের রক্ত আমাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমি অনেক সত্যি উচ্চারণ করতে পারি না, অনেক অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হই, অনেক ইচ্ছেকে টুঁটি টিপে মারি। আমার এক কাকা খুব খারাপ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। আমরা তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। এই যে চন্দ্রবিন্দু লিখলাম তাও অভ্যেসে। সেই কাকা একদিন আমাদের বাড়িতে এলে আমি সমীহ করার ভান দেখিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম। এইসময় ছেলে এল। তাকে বললাম, কাকাকে প্রণাম করতে। সে একটু ইতস্তত করে বলেছিল, 'অসুবিধে আছে।' আমি লজ্জা পেয়েছিলাম আর কাকা অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি চলে গেলে ছেলেকে ডেকে যখন আমি বকাবকি শুরু করেছি তখন সে বলেছিল, 'যে লোকটাকে তোমরা খারাপ বলে ভাবো তাকে আমি প্রণাম করি কি করে? কালোকে সবসময় কালোই বলা উচিত।'

ছেলে যেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সেটাকে সত্যি বুঝেও মেনে নিতে

ইচ্ছে করছিল না আমার। এবং এইটেই সত্যি। আমার রক্তে সবার সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে থাকার যে প্রবণতা আছে তা বাস্তব থেকে আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। আমার পিতা অন্যায় করলেও তাই আমি স্ত্রীর পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারিনি। মনে হত এই ভদ্রলোক যদি আমার পিতা না হতেন তাহলে আমি পৃথিবীর আলো দেখতে পেতাম না। ইনি যাই করুন, এঁর কাছে সারাজীবন একটা জীবনের জন্যে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আর সেটা করতে গিয়ে আমি স্ত্রীর ওপর অবিচার করেছি। তাঁকে মানাতে বলেছি। তিনি সেটা পারেন নি। ফলে আমার পিতা এবং সেইসঙ্গে মাতার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়েছে। একথা ঠিক আমি এবং আমার সময়ের স্বামী অথবা পিতারা সময়ের শিকার। আমরা না সেই যুগের, না এ যুগের!

আজ এই সমুদ্রের ধারে, নগ্ননির্জন রাতে একা দাঁড়িয়ে মনে হল, সংসার ছেড়ে চলে এসে আমি অন্তত নিজের ওপর একটা সুবিচার করেছি। এখানে না এলে তাকে দেখতে পেতাম না। তারপরেই হাসি এল। যাকে নিয়ে এত ভাবছি সে কি করেছে? কি দিয়েছে আমাকে? একটা বিকেল, একটা সন্ধ্যে, একটা রাত সে ছিল আমার সঙ্গে। তাও পুরো নয়। সন্ধ্যের কিছুটা সময় আর রাতের শেষভাগ তাকে পাইনি আমি। সে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল, আমাকে টিজ্ করেছিল, এইমাত্র। আর হ্যাঁ, সে আমাকে আমার প্রিয় গান শুনিয়ে গিয়েছিল। সেটা ক্যাসেটে হলেও, সেই তো ক্যাসেট বাজিয়েছিল। ব্যাস, এইটুকু। এটুকুর জন্যে আমি তাকে ভাবতে বসেছি।

হঠাৎ অন্য কথা মনে এল। আমার যখন বছর তেরো বয়স, নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে সবে ভাবতে আরম্ভ করেছি, লুকিয়ে লুকিয়ে চরিত্রহীন এবং অবশ্যই কিরণময়ীকে পড়া হয়ে গিয়েছে, তখন এক সকালে আমাদের পাশের ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদারের স্ত্রী কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে স্নান করছিল। মেয়েটি নেপালি হলেও লম্বা এবং সুগঠিত শরীর ছিল তার। আমাকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে দেখে সে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেছিল, 'এখনও তো গোঁফ বের হয়নি।' তারপর সেই নারীর সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু আমি জানি, আমৃত্যু তাকে মনে রেখে দেব। যখনই কোন নারী আমাকে উপেক্ষা করবে তখনই সেই অজ্ঞাতনাম্নী মহিলা সামনে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু মালিনী তো আমাকে উপেক্ষা করেনি, তাহলে ওই নেপালী মেয়েটির কথা মনে এল কেন? তাহলে কি শরীর শরীরকে টেনে আনল? এখনও আমি চোখ বন্ধ করলেই সেই মেয়েটির সোনালী চামড়ায় পিছলে যাওয়া জলের চিক্কণ দেখতে পাই। বিকেলের কন্যাসুন্দর আলোয় শুধু অন্তর্বাস পরে স্নান করা মালিনী কি আমার বুকের ভেতর ঢুকে গেছে? এর জন্যে ও মনে আসে? জানি না। কিন্তু তেরো বছর বয়সের চোখ সেই মেয়েটিকে শুধু দর্শক হিসেবে দেখেছিল আর পঞ্চাশে এসে আমি স্নানরতা মালিনীকে দেখতে চাইনি বয়সের গাম্ভীর্যে অথচ বাসনা ছিল অনেক বেশী। একে আমি বাসনাই বলব—তা যত খারাপ শোনাক না কেন! এই বাসনা শুধু শরীরের নয়, শুধু মনের নয়, এসব মিলিয়ে এক পরিবেশের। নৈবেদ্য

সাজানো, ধূপধুনো জ্বালানো, কাঁসর ঘণ্টা বাজানো যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে তখনই পুজো পুজো গন্ধ বের হয়, প্রতিমার দিকে না তাকালেও সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বাসনা ওই গন্ধটুকুর জন্যে।

॥ ১২ ॥

আমার মোটরবোট এসে গেল। যাদের অর্ডার দিয়েছিলাম তারাই পৌঁছে দিয়ে গেল। আর তারপর যেন ওটাকে ঘিরে মেলা লেগে গেল। গ্রামের সব লোক এতটা পথ ঠেঙিয়ে রোজ দেখতে এল বস্তুটিকে। দীনবন্ধু দেখে শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা ঢেউয়ে উল্টে যাবে না?'

হেসে বললাম, 'যাবে না তা বলি কি করে?'

দীনবন্ধু বলল, 'আজকাল তো নৌকোয় উঠতে পারি না। আপনার কলের বোট যদি না ওল্টায় তাহলে একদিন মাঝসমুদ্রে যাব।'

'বেশ তো! কিন্তু গিয়ে নতুন কিছু দেখবে? সারাজীবন তো দেখলে!'

'না বাবু, সমুদ্র কখনও পুরোনো হয় না।'

যেদিন প্রথম ট্রায়াল দিলাম সেদিন তীরে প্রচুর মানুষের ভিড়। লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারি না আমি। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি কাউকে চাপা দিলাম অথবা ধাক্কা খেলাম! এখানে সেসব বালাই নেই। সমুদ্রে ট্রাফিক বলতে কেবল ঢেউ। সেটা তেমন মারাত্মক না হলে এই বোটটি হার মানবে না।

প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গেলে শরৎবাবু একদিন বললেন, 'চলুন, এক ভোরে ওটা নিয়ে বেরিয়ে যাই, ছয়ঘন্টা যাব আবার ফিরে আসব।'

হেসে বললাম, 'ততক্ষণ তেল থাকবে না।'

'হিসেব করে নিন। বাড়তি তেল সঙ্গে নেব। শুনেছি কাছাকাছি একটা দ্বীপ আছে। জেলেরা যেতে পারে না সেই পর্যন্ত। এটা যখন আছে, ঘুরে আসা যাক।'

'তারপর যদি ফেরার পথ হারিয়ে ফেলি, খাবার শেষ হয়ে যায়, জল না থাকে—।'

শরৎবাবু ভয় পেলেন, 'তা বটে—।'

আমি কিন্তু উৎসাহিত হলাম। একটা কম্পাস সঙ্গে থাকলে দিক হারাবার কোন ভয় থাকে না। আর আমরা তো কোন অভিযানে যাচ্ছি না। একটা দ্বীপ দেখে চলে আসব। একে নিশ্চয়ই অভিযান বলে না।

নতুন জিনিষের প্রতি মানুষের যে আগ্রহ তার আয়ু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কম হয়। মোটরবোটের বেলাতেও তাই হল। আবার সব সুনসান। বাড়ির নিচে ওটাকে রেখে দিয়েছি। জলে নামাবার সময় অসুবিধে হয় না। বালির ওপর দিয়ে একটু ঠেললেই নিচে নেমে যায়। ওপরে তোলার সময় রাধা আমাকে সাহায্য করে। মোটরবোটে চেপে কাছাকাছি সমুদ্রে ঘোরা আমার এক নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু রপ্ত হবার পর আমি জলের দিকে স্থির চোখ রাখি। কিন্তু মাছটাকে দেখতে পাচ্ছি না এখনও।

কলকাতা থেকে প্রকাশকদের তাগাদা আসছে। বই চাই। নিজের মনে লিখবেন

বলে আপনি সাগরের ধারে গেলেন, কিন্তু লেখা কোথায়? এটা ঠিক, কলকাতায় থাকতে নানান চাপের মধ্যেও আমাকে রোজ চারপাতা লিখতে হত। যোগ করলে সংখ্যাটা কম হয় না। এখানে সেই বালাই নেই। ইচ্ছে হলে লিখি, না হলে নয়। নাঃ, এভাবে হবে না, নিয়ম করে লিখতে হবে। এটা ভাবতেই মন বিদ্রোহ করল। নিয়ম মানব না বলেই তো আমি এখানে এসেছি। লেখার চাকরি করতে হলে তো কলকাতায় থাকতে পারতাম। অতএব ইচ্ছে না হলে কলম ধরা নেই, তা যে যা বলুক।

আজ যখন রাধা জলখাবার নিয়ে এল তখন চোখে পড়ল সে ছেঁড়া শাড়ি পরেছে। পায়ের নিচে বেশ দুর্দশা। এরকম কখনও দেখিনি। পোশাকের বেলায় ও খুব সতর্ক। অবশ্য একটি গ্রামের বিধবার পক্ষে যতটা সতর্ক থাকা সম্ভব ততটাই। আমি যে মাইনে দিই তার অনেকটাই ওর বেঁচে যায়। রাত্রের খাওয়া ও বাড়িতে খায়। খরচ তো ওটুকুর জন্যে। জলখাবার খেয়ে ওকে ডাকলাম। সে দরজায় এসে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার শাড়ি কিনতে কত টাকা দরকার?'

সে ফিক করে হাসল। জবাব দিল না।

বললাম, 'দুটো শাড়ি কিনে নেবে। কত টাকা দেব?'

'আপনি কখনও শাড়ি কেনেন নি?'

প্রশ্নটা শুনে চিন্তা করলাম। আমি কি কখনও শাড়ি কিনেছি? হ্যাঁ, বিয়ের পর অল্পবয়সে একবার কিনেছিলাম বটে, কিন্তু স্ত্রী আমার রুচি ও বাজারজ্ঞান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর আর কখনও কিনিনি।

'না। কিনিনি। তোমাকে আমি বলেছি, কখনও আমাকে প্রশ্ন করবে না।'

'মুখ বুজে থাকতে আমি যে পারি না।'

'তুমি ছেঁড়া শাড়ি পরেছ বলেই কেনার কথা বললাম।'

'ও, এই জন্যে! ঠিক আছে, কাল থেকে আমি পরব না এটা।' সে চলে গেল।

বিকেলে সে যখন বাড়ি যাচ্ছিল তখন টাকা দিতে চাইলাম, নিল না। বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমার এখনও অনেক শাড়ি আছে। কিন্তু—।'

আমি চুপ করে রইলাম বাকিটার জন্যে। লজ্জার ঢেউ কাটিয়ে সে বললে, 'আমার খুব শখ একটা সালোয়ার কামিজের।'

'ঠিক আছে, তাই কিনে নাও।'

'কিনব যে পরব কোথায়? গ্রামের লোক দেখতে পেলে শেষ করে ফেলবে। একে বিধবা তার ওপর বদনাম তো লেগেই আছে, এর সঙ্গে ওই পোশাক দেখলে আর কথা নেই!'

'ও। শখ যখন হয়েছে তখন এখানে পরতে পার। গ্রামের লোক দেখতে পাবে না।'

'হ্যাঁ, সেটা হয়। কিন্তু আমি কিনতে গেলে তো সবাই জেনে যাবে।'

'তা অবশ্য। আচ্ছা দেখি।'

মোটরবোটটার ব্যাপারে কথা বলতে আমাকে বালেশ্বর যেতে হয়েছিল। আধঘণ্টা চলার পর ইঞ্জিনটা বেশ গরম হয়ে যাচ্ছে। গ্যারান্টি পিরিয়ড থাকার সময় এসব ঠিক করে নেওয়া দরকার। ইঞ্জিনটাকে খুলে সঙ্গে আনিনি শুনে ওরা বলল লোক পাঠাবে। ততদিন আমি ওটা ব্যবহার না করলেই ভাল।

যে মানুষ শাড়ি কেনে না তার পক্ষে সালোয়ার কামিজ কিনতে অসুবিধে নেই। তবে দোকানদার যখন আমার পছন্দের জিনিসের দাম বলল তখন চমকে গেলাম। আটশো টাকা দামের পোশাক কি কাজের মেয়েকে দেওয়া যায়? স্ত্রী থাকলে হার্টফেল করতেন। কিন্তু দামের সঙ্গে পছন্দও একটা গুরুত্ব পায়। অনেক চেষ্টা করেও আড়াইশোর নিচে নামতে পারলাম না। দোকানদার জিজ্ঞাসা করল, 'আর কিছু দেব?'

'এর সঙ্গে আর কি লাগে?'

'ওড়না নিতে পারেন।'

'হ্যাঁ, দিন।' সালোয়ার কামিজের সঙ্গে ওড়না ব্যবহার করতে দেখেছি আমি।

'আণ্ডার-গার্মেন্টি কিছু দেব স্যার?'

আমি ধন্দে পড়লাম। শাড়ির সঙ্গে যা পরা উচিত তা নিশ্চয়ই রাধা পরে, কিন্তু সেগুলো কি সালোয়ারের সঙ্গে চলে? আমার মা-ঠাকুমারা কখনই প্যান্টি পরেননি। ব্রেসিয়ারের চলও শুরু হয়েছিল মায়েদের আমল থেকে। তার আগে সেমিজই ছিল অল পারপাস অন্তর্বাস। এখন যে হারে প্যান্টির বিজ্ঞাপন দেখি এবং মেয়েদের প্যান্ট ব্যাবহার করা থেকেও বোঝা যায় যে ওটা প্রয়োজনীয় পোশাক হয়ে গেছে। সালোয়ারের নিচে কি প্যান্টি পরে? দোকানদারকে বললাম দিয়ে দিতে। মাপটাপ জানি না, ফ্রি সাইজ হলেই চলবে। ভদ্রলোক হাসলেন। অন্যের অজ্ঞতা উপভোগ করতে কার না ভাল লাগে! প্যাকেট নিয়ে ফিরে এলাম।

আজ রাধাকে ছুটি দিয়ে গিয়েছিলাম। বাস থেকে নেমে শরৎবাবুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে চিঠি পেলাম। আমার স্ত্রীর চিঠি। ওঁর সামনে খুললাম না। চা খেয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। এখন বিকেল। ভদ্রমহিলা হঠাৎ চিঠি লিখলেন কেন? নির্জন বালুচরে হাওয়ার দোলায় দুলে সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে খাম খুললাম। আমার পেছনে এখন শেষ সূর্যের আলো।

> তোমাকে বিরক্ত করতে খুব ভাল লাগে না। কিন্তু তোমার অনুপস্থিতির জন্যে কিছু সমস্যা তৈরী হয়েছে। তোমার ছেলে-মেয়েরা সেই সমস্যার শিকার হোক তা আমি চাই না। যদ্দূর মনে হয় তুমিও চাইবে না। তাই ওরা তোমার কাছে যাবে। চেষ্টা করবে সেদিনই ফিরে আসতে। কাগজে দেখলাম তোমার ওখান থেকে একটি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে সমুদ্রে। নিশ্চয়ই গল্প পেয়ে গেলে! শুভেচ্ছা রইল।

একেবারে নিরীহ্ চিঠি। কিন্তু আমি মহিলাকে অনুভব করলাম। আমার সম্পর্কে অদ্ভুত নিরাসক্তি নিয়ে তিনি একসঙ্গে সারাজীবন কাটিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু কি এমন সমস্যা হয়েছে যে ছেলেমেয়েরা এখানে আসবে ? আমি চলে আসার সময় শুনেছিলাম, ওরা কেউ নাকি কখনও আমার পেছনে ছুটবে না। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বভাবমত সমস্যার কথা লেখেননি। কিন্তু ওরা কবে আসবে তাও জানাননি।

বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখনও কালচে আলো রয়েছে পৃথিবীতে। সিঁড়ির মুখে সুজন বসেছিল। দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত জড়ো করে বলল, 'নমস্কার।'

মাথা নাড়লাম। খেয়াল হল, ছেলেটাকে অনেকদিন বাদে দেখছি। আমার নতুন বোট আসার পর প্রায় সকলেই এখানে ঘুরে গেছে কিন্তু সে আসেনি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় ছিলে ? অনেকদিন দেখিনি ?'

'এই তো ! সারাদিন সমুদ্রে থাকি,' সে মাথা ফিরিয়ে বোটটাকে দেখল, 'আপনার নতুন নৌকো দেখলাম। অনেক দাম, না বাবু ?'

'হ্যাঁ। তা একটু—।'

'আর আপনাকে আমার নৌকোয় সমুদ্র দেখতে যেতে হবে না। ঢেউ-এর জন্যে সেবার তো খুব কষ্ট হয়েছিল আপনার।'

'তা হয়েছিল। কিন্তু তুমি এখানে কেন ?'

'আপনি আমার উপকার করুন বাবু।'

'আমি ? আমাকে তুমি পছন্দ করো না।'

'না না। এ কি কথা বলছেন আপনি ?'

'যে মেয়েটা সমুদ্রে হারিয়ে গেল তাকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে তুমি রাধার কাছে নিন্দে করোনি ? তাকে উত্তেজিত করোনি ?'

'আমি তো তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে গেছি বাবু। মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল।'

'হুম। এখন কি মতলব ?'

'মতলব না বাবু, প্রার্থনা বলতে পারেন।'

হেসে ফেললাম, 'কি সেটা ?'

'রাধাকে রাজী করান। আমি যদি বিয়ে করি তাহলে তাকেই করব।'

'খুব ভাল। কিন্তু বিয়ে তো একা করা যায় না। ওর যদি ইচ্ছে না থাকে তো তুমি ওকে বিয়ে করতে পার না। আমি বললেও কাজ হবে না।'

'হবে, আপনাকে ও দেবতার মতো ভক্তি করে।'

'কিন্তু সুজন, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। রাধা বিধবা, খারাপ মেয়েমানুষ হিসেবে বদনামও আছে। এমন মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে চাইছ কেন ?'

মুখ নামাল সুজন, 'আপনি তো সব জানেন। ওর মত মেয়ে আমি কোথাও পাব না।'

'আচ্ছা ! তুমি শরীর দেখে বিয়ে করতে চাইছ ?'

'হ্যাঁ বাবু। মেয়েমানুষের মনের নাগাল শুনেছি জগন্নাথও পান না। আমার সেই চেষ্টা করে লাভ কি ? ঠিক কিনা বলুন ?'

'বেশ। আমি ওকে তোমার কথা বলব। এখন যাও, আমি রেস্ট নেব।'

'আপনার শরীর কি খুব খারাপ ?'

'খুব না। বালেশ্বর গিয়েছিলাম, তাই টায়ার্ড।'

সে সরে দাঁড়ালে ওপরে উঠে এলাম। দরজা খুলে আলো জ্বাললাম। প্যাকেটটা টেবিলে রাখতে মন বিরক্ত হল। জীবনে কখনও ঘটকালিগিরি করিনি, এখানে সেটাও করতে হচ্ছে। স্নান করে পরিষ্কার হয়ে দেখলাম অন্ধকার নেমে গেছে। খিদে ছিল না। বালেশ্বরের হোটেলে বেশ মশলাদার রান্না খেতে হয়েছে। রাতের খাবার রাধা গতকালই ফ্রিজে রেখে গেছে। কিন্তু সেগুলো বের করে খেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি সেইসব মানুষদের একসময় অপছন্দ করতাম যাঁরা সংসার ছেড়ে সবাইকে বিপদগ্রস্ত করে শুধু নিজের স্বার্থে লোকালয়ের বাইরে চলে যেতেন। তিনি যতবড় সন্ন্যাসী অথবা মহামানব হোন না কেন আচরণে স্বার্থের গন্ধ বড় প্রকট। কিন্তু যে মানুষ সব দায়িত্ব পালন ক'রে, সবাইকে ভাল থাকার ব্যবস্থা ক'রে চুপচাপ বাকি জীবন থাকতে পারে একদম আলাদা হয়ে, তার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। বিদেশের অনেক সফল লেখক অথবা শিল্পীকে ওইরকম আচরণ করতে আমি দেখেছি। পুত্রকন্যা স্বাবলম্বী হবার পরও নিজের গড়া সংসারে যাঁরা এঁটুলির মত লেগে থাকেন, সংসার যাঁকে প্রায় পাপোষের মত ব্যবহার করে শেষবয়সে, তাঁদের জন্যে আমি কোন মমতা অনুভব করতাম না। কারণ তাঁরা নিজেরাই ওই পরিস্থিতি ডেকে এনেছেন। কিন্তু এখন এই নিরালা সাগরবেলায় এসে ক্রমশ বুঝতে পারছি, বেঁচে থাকার সমস্যাগুলো কখনই মানুষকে ছেড়ে দেবে না। জল থিতিয়ে গেলে ময়লাগুলো যেমন তলায় জড়ো হয় তেমনি এসে জুটবে।

ভদ্রমহিলার চিঠিটা যে প্রাণখোলা আনন্দে লেখা নয় তা বুঝতে পারছি। একটি মেয়ে এখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে, কাগজে খবরটা পড়ে তিনি বুঝে গেছেন আমি গল্পের রসদ পেয়ে গেছি। মেয়েটির বয়স চল্লিশ হলে তাঁর রসনার ধার বাড়ত। কিন্তু আমার স্ত্রীপুত্র কন্যাদের নিয়ে আমি ততটা ভাবিত নই। এই এখানকার মানুষেরাই আমাকে জড়িয়ে ফেলছে। এই যে সুজন, আমার বাড়ির সিঁড়িতে বসেছিল স্বার্থ নিয়ে, আমার কি দায় পড়েছে তা মেটানোর ?

হুইস্কি হাতে নিলে আমি কখনই লিখি না। সমরেশদা বলতেন, 'ও-দুটোকে কখনও এক করো না।' ওঁর নিষ্ঠা ছিল, পেরেছেন। লেখার প্রতি এমন সততা ছিল বলেই তিনি তিনি। দার্জিলিং-এ রাত দুটো পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কাটানো যে মানুষটাকে বিছানায় প্রায় চৈতন্যরহিত অবস্থায় শুইয়ে দিয়েছিলাম, তাঁকেই ভোর পাঁচটায় স্নান করে কলম ধরতে দেখেছি। মাত্র তিনঘণ্টা পরে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। এই লোকটির মধ্যে একজন সন্ন্যাসী বাস করতেন কিন্তু তিনিও তো সমস্যা দুহাতে সরিয়ে স্থির হতে পারেননি, আমি কোন্ ছার !

টিভি খুললাম। খবর হচ্ছে। এখানে আমি খবরের কাগজ পড়ি না। শরৎবাবু বাসি কাগজ আনিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আমি রাজী হইনি। কোন খবর না জেনে বাস করা ঢের ভাল। তাতে আরামে থাকা যায়। পরিচিত কেউ দেহ রাখলেও তিনি আমার কাছে জীবিত থাকবেন। হঠাৎ সংবাদ-পাঠকের গলার স্বর বদলে যেতে কান পাতলাম। বঙ্গোপসাগরে ভয়ঙ্কর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টায় সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উপকূলের মানুষদের দ্রুত নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে বলা হচ্ছে। প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের আশংকা করা হচ্ছে। টিভির পর্দায় যে ম্যাপটা ফুটে উঠল তাতে বুঝলাম আমি যেখানে আছি, ঝড় সেখানেই আসবে।

টিভি বন্ধ করলাম। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখন চাঁদের রাত নয়। অন্ধকারে সমুদ্র মোটেই আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু ঢেউ-এরা যেন আজ তেমন ক্ষিপ্ত নয়। ঝড় এলে তো সেটা আরও প্রকট হত। আকাশে তাকালাম। দু-একটা তারা এখনও দেখা যাচ্ছে। মেঘ আছে কিন্তু সেগুলো বেশ পলকা। চিরকাল মানুষ আবহাওয়ার সতর্কবাণীকে অবিশ্বাস করে এসেছে, কারণ বেশীরভাগ সময় তা মেলেনি। কিন্তু এই যে সতর্ক হতে বলল, একজন গরীব ধীবর কোথায় গেলে সতর্ক হবে? যে মানুষটি এইমুহূর্তে সমুদ্রে আছে সে তো খবরই পাবে না।

এই বাড়িটা সমুদ্রের ধারে মুখ করে দাঁড়িয়ে। যদিও সামনে একটা টিলা আছে, কিন্তু তাই বা কতটা আড়াল তুলবে! ঝড়ে আক্রান্ত বাড়িঘরের দুর্দশা ছবিতে দেখেছি। কিন্তু আমাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল এই বাড়ি অটুট থাকবে। যদি নাই থাকে তাহলে ক্ষতি কি!

আপাতত সমুদ্রে ঝড়ের কোন চিহ্ন নেই। আগ বাড়িয়ে আশংকিত হবার কোন মানে হয় না। ঘরে ফিরে এলাম। তেমন কিছু ঘটলে নিচে নেমে যাব। জীবনে সব কিছু শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়, এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। আপাতত চোখ বন্ধ করে বসে থাকা ঢের ভাল।

ভোর হল না। সূর্যদেব ওঠেননি আজ। ঝড়ের খবর নিয়ে এল হাওয়ারা আর সেইসঙ্গে সাগরের ছটফটানি শুরু হল। আকাশে শিষে-ঢালা মেঘ। তার ছায়া পড়েছে জলে। ঢেউগুলো এখন বাচ্চা সাপের মত কিলবিল করছে। হাওয়ারা যদিও ঝড় হয় নি তবু চাবুকের ধার এসেছে তার ঝটকায়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস কিছুটা মিলে গেল দেখছি।

ঘুম ভেঙ্গেছিল অন্ধকার থাকতেই। সূর্য না উঠলেও যে সকাল তাতে স্যাঁৎসেতে গন্ধ। ভিজে ভিজে হয়ে আছে যেন চারপাশ। সেইসময় বাতাস সামলে রাধা এল। তাকে দেখে আতঙ্কিত হলাম, 'এই অবস্থায় তুমি বের হলে কেন?'

'কাজে আসব না?'

'ওঃ, তোমাকে কেউ বলেনি যে আজ খুব ঝড়বৃষ্টি হবে?'

'শুনেছি কিন্তু তেমন খারাপ হলে তো গ্রামের বাড়ি উড়ে যাবে। তার চেয়ে

এখানে থাকলে ভাল থাকব। মুশকিল হল, আপনাকে বাজারের কথা বলতে একদম ভুলে গেয়েছিলাম। ঘরে ডিম আর আলু ছাড়া আর কিছু নেই।' ওকে চিন্তিত দেখাল।

'চাল-ডাল তো আছে। খিচুড়ি বানাও। আজ বাজারে যেতে হবে না।'

'বাজার আজ বসবে না।' সে ভেতরে চলে গেল।

ব্যালকনিতে আর দাঁড়ানো গেল না। হাওয়া আমাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। তার ওপর বালি উড়ছে ওপরে। একটু একটু করে ক্ষ্যাপা হাওয়া ঝড় হয়ে যাচ্ছে। দরজায় শব্দ হচ্ছে তার। ঠিক কতটা দাপট বাড়লে এই বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে তা আমার জানা নেই। একমাত্র দরজা ছাড়া আর কোন কাঁপুনি টের পাচ্ছি না।

রাধা চা নিয়ে এল। লম্বাটে বাড়িটার অনেকটাই টিলার আড়ালে। শুধু ব্যালকনির দিকটাতেই সমুদ্র সামনাসামনি। ঝড়ের আঘাত তাই পুরো বাড়িটার ওপর পড়ছে না। রাধাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ কেউ সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়নি তো?'

'তা কি যাবে না? লোভ যে বড়!'

'সে কি? টিভিতে নিষেধ করেছে যেতে!' আঁতকে উঠলাম আমি।

'টিভি তো কেউ শোনেনি। আর এর আগে অনেকবার রেডিওতে বলেছে, কিন্তু কিছু হয়নি। তবু আসার সময় শুনলাম দীনুবুড়ো হাহুতাশ করছে।'

'সুজন আছে নাকি ওদের মধ্যে?'

'কে জানে কে আছে!'

রাধা চলে যাচ্ছিল। আমি তাকে ডাকলাম, 'ওই প্যাকেটটা নিয়ে যাও।'

সে প্যাকেটটা দেখল, 'কি আছে ওতে?'

'নিজেই দ্যাখো।'

বেশ সঙ্কোচের সঙ্গে সে প্যাকেটটা নিল। তারপর আড়ষ্ট পায়ে চলে গেল। এই ধরণটা আমার ভাল লাগল। খুব স্বাভাবিক।

ঘরে বসে ঝড় দেখতে কার না ভাল লাগে! কিন্তু সময় যত এগোচ্ছিল তত সমুদ্রকে বদলে যেতে দেখলাম। এখন শুধু চারপাশ বালির আড়াল। আমার কাঁচের জানলায় সেগুলো যেভাবে আছড়ে পড়ছে তাতে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। সমুদ্র থেকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন ক্রমাগত স্থলভূমির দিকে ছুটে আসছে। ব্যালকনির দরজা খোলার চেষ্টা করেছিলাম একবার, পারিনি। এই ঝড়ে যে কোন মানুষ বালির ওপর গিয়ে দাঁড়ালে তাকে আর অটুট পাওয়া যাবে না। আমার কিছু করার নেই।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া চুকেছিল ঠিক সময়ে। কাজকর্ম শেষ করে রাধা বোধহয় পাশের ঘরে। জানলার যে পাশ দিয়ে সমুদ্র দেখা যায় সেখানে চোখ রেখে দেখেছিলাম জল অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। কালো হিংস্র অজগরের চেহারা নিয়েছে ঢেউগুলো। প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির কি দারুণ মিলমিশ! অন্ধকার নামছে যত তত এই হিংস্রতা বাড়ছে। এবার জলের সপাং সপাং আওয়াজ কানে এল। ঘড়িতে মাত্র সাড়ে তিনটে। এইসময় রাধা এল, 'আমি কি ফিরে যাব?'

‘পাগল! এই সময় বের হলে তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে নাকি?’ চমকে উঠেছিলাম।

‘কি জানি, আমি ভাবলাম হয়তো আপনি চলে যেতে বলবেন।’

‘তোমার কি করে মনে হল এই আবহাওয়ায় কেউ কাউকে যেতে বলতে পারে!’

‘আপনি সব পারেন।’ বলেই সে বন্ধ জানলার দিকে মুখ ফেরালো। যদিও সেদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সেই একই বিদ্রূপ। পৃথিবীর যাবতীয় নারী কখনও-সখনও এই গলায় কথা বলে। আর দুর্ভাগ্য আমার, আমাকেই বারংবার সেটা শুনতে হয়।

বললাম, ‘তোমার আজ সকালে বেরোনোই উচিত হয়নি।’

‘সকাল দেখে কি বোঝা যায় বিকেলে কি হবে?’

‘তুমি মাঝে মাঝে এমন ভাবে কথা বল যে—।’ বাকিটা বলতে সঙ্কোচ হল। ও যে অশিক্ষিত, গ্রাম্যমহিলা সেটা ওকে মনে করিয়ে দিতে ভাল লাগল না।

‘কিভাবে কথা বলি?’

‘জানি না। এখন ভাবো, যেভাবে ঝড় বাড়ছে তাতে এই বাড়ি উড়ে গেলে কি হবে?’

‘মরে যাব।’ হাসল রাধা, ‘গ্রামের কোন বাড়ি আস্ত আছে বলে মনে হয় না।’

‘সে কি!’

‘দেখুন না, একটু পরেই জল ঢুকে পড়বে।’

‘জল? এত ওপরে?’

‘এখানে না আসুক, গ্রামে তো ঢুকবেই। অনেকবছর আগে শুনেছি একবার হয়েছিল, সে আর কথা বলল না। ছায়া-ছায়া হয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে এখন তাণ্ডব বেড়ে চলেছে। এখন কি করব তা ভেবে পাচ্ছি না। আসলে কিছুই যে করার নেই সেটা বুঝে আরও অসহায় লাগছে নিজেকে।

ঘরের জানলা দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ঝড়ের শব্দ কানে প্রবল হয়ে বাজছে। যদিও বৃষ্টি নামেনি তবু একে প্রলয় ছাড়া কি বলা যেতে পারে! একবার মনে হল এই বাড়ি থেকে আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত। যেমন করেই হোক কোন ফাঁকা জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লে বেঁচে যেতে পারি। ইঞ্জিনিয়াররা যাই বলুক, যে-কোন মুহূর্তে বাড়িটা ধ্বসে যেতে পারে। আমি জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুই ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকাতে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এক পলকে যেটুকু নজরে এল তা আমার কল্পনার বাইরে। সমুদ্রের জল কোথায় উঠে এসেছে! টিলাটাকে মাঝখানে রেখে বিশাল ফণা তুলে ছোবল মারছে যেখানে সেখান থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় সমুদ্র অনেক দূরে থাকে। সর্বনাশ! এখন এই বাড়ি থেকে বের হবার কোন উপায় নেই। দরজা খুললেই ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যাবে অনেকটা দূরে।

কিছুই যখন করা যাবে না তখন বিপদ নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল। যা হবার তা হবে। একবার ভাবলাম ক্যাসেট চালাই। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর আওয়াজে তো কিছুই

শোনা যাবে না। মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'আলো জ্বালাও।'

রাধা যেন সম্বিৎ পেল। এগিয়ে গিয়ে সুইচ অন করল কিন্তু আলো জ্বলল না। বুঝতে না পেরে ও অন্য সুইচগুলো টিপলো, 'কি হল?'

'নিশ্চয়ই তার ছিঁড়ে গেছে। হ্যারিকেনটা জ্বালাও।'

রাধা চলে গেল। আর বাকি কি রইল। বিদ্যুৎ গিয়েছে, ঝড় সব কিছু গ্রাস করতে এখন তৈরী। জল উঠে আসছে প্রবলবেগে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কত উঁচুতে ওঠে তা আমার জানা নেই, কিন্তু এই বাড়িটাকে যদি ডুবিয়ে দেয়? মৃত্যু যখন এগিয়ে আসছে তখন স্বাভাবিক ভাবে তাকে মেনে নেওয়াই ভাল।

আবছা অন্ধকারে তাকালাম। উপন্যাসের অনেকটাই লেখা হয়ে গেছে কিন্তু শেষ করা বোধহয় গেল না। পাতাগুলো সাজানোই ছিল, একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে এমনভাবে ঢুকিয়ে রাখলাম যাতে জল লাগলেও নষ্ট না হয়। মরে গেলে অপ্রকাশিত উপন্যাস হিসেবেও ছাপা হতে পারে।

আলো নিয়ে এল রাধা। টেবিলের ওপর রাখতে বললাম। এই আলোয় বেশ জীবন-জীবন গন্ধ মাখানো আছে, ভরসা বাড়ে। রাধা আবার সরে গিয়ে দাঁড়াল, 'কিছু খাবেন?'

খাওয়ার কথা ভাবছে ও? আমার হাসি পেল। মাথা নাড়লাম, 'শোন, তোমাকে বলতে বাধা নেই, আর বোধহয় আমাদের খেতে হবে না।'

'মানে?'

'এই অবস্থা চললে আমরা কেউ বাঁচবো না।'

সে জবাব দিল না। কিন্তু প্রচণ্ড শব্দে জানলার কাঁচ ভেঙ্গে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ঢুকে পড়ে তছনছ করতে লাগল সব। হ্যারিকেনের আলো দপদপ করতে লাগল। রাধা ছুটে গেল জানলার কাছে। আমি চিৎকার করলাম, 'সাবধান, কাঁচ পড়ে আছে।' তারপর একটা ভারি চাদর তুলে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাত্র একটি কাঁচ ভেঙ্গেছে কিন্তু তাই দিয়েই যে গতিতে বাতাস ঢুকছে তাতে সামনে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। চাদরটা ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, যাতে আড়াল তৈরী হয়। কিন্তু সেটা ওই হাওয়ার কাছে এমন পলকা যে উড়তে লাগল। অনেক চেষ্টার পর আমরা চাদরটাকে চার কোণায় বাঁধতে পারলাম। পেটের কাছটায় ফুলে উঠতে লাগলেও বাতাস চারপাশ থেকে চুঁইয়ে বেরুনো ছাড়া প্রবল হতে পারল না। মনে হচ্ছিল চাদরটা ছিঁড়ে যেতে পারে। আলমারিটাকে ঠেলে ঠেলে জানলার সামনে আনলাম এবং তখনই বৃষ্টি নামল।

রাধা বলল, 'বাঁচা গেল।'

'মানে?'

'বৃষ্টি পড়লে হাওয়ার জোর কমে যায়।'

'কমলে ভাল।' আমি হ্যারিকেনটা এক কোণে সরিয়ে দিতেই ওর শিখা সোনা হল। এখন সন্ধ্যে হয়েছে কি হয়নি, কিন্তু এখানে মধ্যরাতের আবহাওয়া। জলের

শব্দ স্পষ্ট কানে আসছে। আমি আমার চেয়ারে বসে গ্লাসে হুইস্কি ঢাললাম। রাধা জিজ্ঞাসা করল, 'জল এনে দেব?'

'নাঃ।' মনে মনে বললাম, আজ জল ছাড়াই খাব। বিদেশে কেউ জল মিশিয়ে মদ খায় না।

এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। অ্যালকোহল যখন আমার রক্ত অধিকার করল তখন বাইরের ওই আওয়াজকে আর বীভৎস মনে হল না। আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি, শুধু আমার মন থেকে আতঙ্ক ভাব চলে গিয়েছে। মরে যেতে হলে আর কোন দুঃখ নেই। উপন্যাস শেষ করতে পারলাম না, কজনই বা সব কিছু শেষ করে যেতে পারে? এ জীবন নিয়ে আমার কোন আক্ষেপ নেই। যা চেয়েছিলাম তার সব পাইনি, কজন পায়? যা পেয়েছি তাও তো আমার ছিল না, কজন পায়? আমি কি পাইনি? সারাজীবনের তৃষ্ণা কি আমার? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাকে বলা যায়, পরাণ-সখা। শুধু পরাণের সখা নয়, বন্ধুও। একই সঙ্গে দুই রূপ, কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয়ে রইল আমার জীবনে। এখন আর হা-হুতাশ করে লাভ কি!

'আপনি আরও খাবেন?' রাধার গলা ভেসে এল।

'আমি তো মাতাল হইনি। তাছাড়া যদি মারাই যাই, তাহলে তো অসুস্থ হবার ভয় থাকবে না।'

'মারা গেলে তো অনেক কিছু হবে না।'

'ঠিক ঠিক। আর হবে না বলে আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু তোমার বয়স অল্প, তোমার থাকতে পারে। আছে নাকি?' আমার গলা তো এখনও ঠিকঠাক আছে।

'আছে।'

'বলে ফেল। ভেবে নাও এটা একধরণের কনফেশন। কনফেশন মানে বোঝ? বোঝ না। দরকার নেই বোঝার। ওহো, তোমাকে আসল কথাটাই বলা হয়নি।' মুখ তুললাম। রাধা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যারিকেনের আলোয় কি আমি ওর দৃষ্টি বুঝতে পারছি না?

'সুজন এসেছিল। ও আমাকে খুব ধরেছে—তোমাকে বিয়ে করবে বলে। আমি বলি কি, যদি ভাগ্যক্রমে বেঁচে থাক তাহলে ওকে নিরাশ করো না।' বলে বেশ ভাল লাগল।

রাধা কোন জবাব দিল না।

'কি হল? শুনতে পেয়েছ?'

'যদি বেঁচে থাকি তাহলে ভেবে দেখব।'

'গুড। হ্যাঁ, তোমার দুঃখটা কি?'

'আপনার দেওয়া পোশাকটা পরা হল না।'

'এ্যাঁ? এইটুকু দুঃখ! পরে ফেল, চটপট। তাহলে আর দুঃখ থাকবে না।'

'পরব ?'

'হ্যাঁ।' আমার মন এখন বেশ ভাল।

রাধা চলে গেল। বৃষ্টি পড়ছে প্রচণ্ড শব্দে। ঝড়ের আওয়াজ, বৃষ্টির শব্দ আর সাগরের ঢেউ-এর ফোঁসফোঁসানি মিলে পৃথিবীটা যেন নোয়ার আমলে চলে গিয়েছে। অথচ এসব আর আমাকে একটুও ভাবাচ্ছে না। উঠে বাথরুমে যেতে গিয়ে পা টলল। এটা কি রকম হল ? এ জীবনে প্রথমবার নিজেকে মাতাল দেখে যেতে হবে নাকি ? ইম্পসিব্‌ল্‌! বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই যেন টলতে লাগলাম। জানলা খোলা। হাওয়া এসে মাতামাতি করছে এখানেও, সেইসঙ্গে জলের ছাঁট। কোনরকমে হালকা হয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজা চেপে দাঁড়ালাম। এদিকের সবটাই অন্ধকার। মাতাল হলে আলোর দরকার হয় না কিন্তু আমি তো মাতাল নই। সতর্ক পায়ে ফিরে এলাম চেয়ারে।

আর খানিকটা খেলেই ঘুম এসে যাবে। একটু বেশী পরিমাণ খেলেই আমার ঘুম পেয়ে যায়। মদ খেয়ে ভয়ঙ্কর হবার ধাত আমার নেই। তাই ঘুম পেলে ক্ষতি কি! মরতে হয় ঘুমের মধ্যেই মরে যাব। আমি চুমুক দিলাম। এখন অ্যালকোহলের কোন স্বাদ পাচ্ছি না, কোন প্রতিক্রিয়া টের পাচ্ছি না। হুইস্কির বদলে জল খেলেও একই অনুভূতি হত।

হঠাৎ চোখের সামনে ঝাপসা কিছু নড়ে উঠতেই চোখ বড় করলাম। রাধা এসে দাঁড়িয়েছে। রাধা তো ? একদম অচেনা হয়ে পড়েছে ওর চেহারা। টানটান যুবতীর মত দেখাচ্ছে ওকে। মত বলছি কেন, ও তো তাই! আরে, চুলটাও অন্যরকম করে বেঁধে ফেলেছে এর মধ্যে! প্রায় পিতামহের গলায় বললাম, 'আরে, এগিয়ে এসো, দেখি।'

'না, আমার লজ্জা করে।'

'আশ্চর্য, এখানে কাকে লজ্জা করছ! এসো দেখি।'

সে এগিয়ে এল। হ্যারিকেনের আলো পড়ল তার শরীরে। বললাম, 'বাঃ!'

'আমার আর দুঃখ নেই।'

'সত্যি ? দ্যাখো, কত সহজে তোমার দুঃখ চলে গেল!'

'আমার খুব ভাল লাগছে।'

'কিন্তু তোমার মৃতদেহ যদি ওরা এই পোশাকে পায়, তাহলে খুব অবাক হয়ে যাবে।'

'জানি। বদনাম দেবে।'

'তাহলে ? খুলে ফেলে শাড়ি পড়ে নাও।'

'না, কক্ষনো না। এখন আমি এটাই পরে থাকব। বেঁচে থাকতেই বদনাম দেয়, মরে গেলে দিলে আমার কি!' বলেই সে হাসল।

'আবার হাসি কেন এল ?'

'আমি ইজেরটাও পরেছি। আমাদের কেউ বড় হলে ইজের পরে না।'

'ওঃ, ওটাকে ইজের বলে না। প্যান্টি বলে।'

'প্যান্টি?'

'হুঁ। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

আমি উঠে বিছানায় চলে গেলাম। শরীর এলিয়ে দেওয়ামাত্র ঝাঁপিয়ে এল ঘুম। আঃ, কি আরাম। পৃথিবীতে এর চেয়ে আরাম আর কিছুতেই নেই। কিন্তু এ কেমন ঘুম? আমি সব কিছু অনুভব করছি, অথচ শরীর নাড়ার ক্ষমতা যেন নেই, সেই ইচ্ছেও চলে গিয়েছে। রাধার গলা পেলাম, 'এ কি! এরকম সময়ে কেউ ঘুমায়?'

আমি হাসলাম। সেটা হাসি বলে ওর মনে হল কিনা জানি না।

'আপনি খুব খারাপ লোক।'

আমি কথা বললাম, কিন্তু শব্দ বের হল না। বললাম, আমাকে সবাই তাই বলে। পৃথিবীর সব মেয়েরা ঘনিষ্ঠ হবার পর ওই অভিযোগ করে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, বাল্যপ্রেমে অভিশাপ থাকে। আমি তো বালক নই। আমার জীবনে যখন প্রেম নিবিড় হয়ে ওঠে তখন বিচ্ছেদ এসে যায়। আর সবসময় তার দায় আমাকেই বহন করতে হয়।

'আপনি একটা মাতাল।' হেসে উঠল রাধা।

'নো। নট এ্যাট অল!'— মনে মনে বিড় বিড় করলাম আমি, 'আমার ঘুম পাচ্ছে বলে ঘুমাচ্ছি। মাতাল হতে যাব কেন?'

'আপনি ঘুমিয়ে পড়লে আমার কি হবে?' অদ্ভুত আবদারে গলা কানে এল। এবং আমার শরীরে চাপ-চাপ আরাম অনুভব করলাম। আঃ! সে কোন্ শৈশবে মায়ের কোলে অথবা পুরুষের জীবনে যে নারী প্রথম সর্বস্ব নিয়ে আসে তার আলিঙ্গনে যে উত্তাপ এবং মধু, নিদ্রার গহীনে ডুবে যেতে যেতে আমি তাদের ফিরে ফিরে পেতে লাগলাম। মনে হল আমার বুকের ওপর অনেক জলের চাপ, অথচ সেই চাপে মরণের সুখ কিলবিল করছে। এবং তখনই সেই আবছায়া অথবা অস্পষ্ট জগৎ থেকে ভেসে এল যে তাকে দেখে চমকে উঠলাম। অদ্ভুত গলায় সে বলে উঠল, 'শেষ পর্যন্ত নামতে পারলেন? আসুন সাঁতার কাটি!'

তখন বিস্ময় আমার মন চেপে ধরেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?'

'এখানে। এই সমুদ্রের নিচে। আপনি একদিন না একদিন আমার সঙ্গে সাঁতার কাটবেন বলে অপেক্ষা করছিলাম। হাত ধরবেন?'

'তুমি,— তুমি মরে যাওনি?'

সেই গভীর জলে সে এমনভাবে হাসল যে আমার শরীর সর্বাঙ্গে তা শুনতে পেল, 'আমি কখনও মরতে পারি? আপনার কি মনে হয়?'

'তুমি মরনি?'

'না। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।' সে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে স্বপ্নের ডানা মেলে জলের ভেতর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল।

॥ ১৩ ॥

সকাল হয়েছিল কিন্তু রোদ ছিল না। ঘুম ভাঙ্গার পর মনে হল আমি মরিনি। ঘরে কেউ নেই। জানলা বন্ধ। কিন্তু ব্যালকনির দিকের দরজা খোলা। আমি উঠলাম। রাধা দাঁড়িয়ে আছে গালে হাত দিয়ে। ঝড় থেমে গেছে কিন্তু হাওয়া বইছে বেশ। পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও সে মুখ ফেরালো না। সমুদ্রের জল এখনও ভয়ঙ্কর। ঢেউগুলো পাকিয়ে উঠছে। জলের রঙই বদলে গেছে। আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা। তবে কালকের মত নয়।

বালির চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে শুধু বৃষ্টিতে ভেজেনি, সমুদ্রের জল অনেকটা উঠে এসেছিল। বললাম, 'তুমি গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো।'

'কি খোঁজ নেব ? কেউ বেঁচে নেই।' রাধা বিড়বিড় করে বলল।

আমি নিচে নেমে এলাম। এবং তখনই স্পষ্ট বুঝলাম কাল কিরকম কাণ্ড ঘটে গেছে। আশেপাশের বালিয়াড়ির চেহারাই পাল্টে গিয়েছে। যেহেতু আমার বাড়ির অনেকটাই টিলার আড়ালে ছিল তাই কাঁচের জানলার ওপর দিয়েই যা যাবার গিয়েছে। কিন্তু এখানে ওখানে বিরাট গর্ত করে বালি তুলে নিয়ে গিয়েছে ঝড়। বাড়িটার মুখোমুখি বইলে আমাদের চাপা পড়ে মরতে হত। পেছনের রাস্তায় ইলেকট্রিকের খুঁটিগুলো নেই। একটু এগোতে দুই-একটাকে ভাঙ্গা অবস্থায় দেখলাম। যে পথটাকে আমরা পথ হিসেবে ব্যবহার করতাম সেটা নিশ্চিহ্ন।

হঠাৎ দূরে একজন মানুষকে আসতে দেখলাম। কাছাকাছি হতেই শরৎবাবুকে চিনতে পারলাম। উনি হাত নেড়ে দৌড়ে কাছে এলেন, 'আপনার কিছু হয়নি তো ?'

'না।' মাথা নাড়লাম আমি।

'বাড়িটা— ?'

'ঠিকই আছে। শুধু জানলা ভেঙ্গেছে।'

'আমাদের ট্যুরিস্ট লজ বেঁচে গেছে। দোকানগুলো ছত্রাকার।' করুণমুখে বললেন ভদ্রলোক, 'আর গ্রামটার যে অবস্থা হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারব না।'

'কেউ মারা যায়নি তো ?'

'গেছে। তবে সংখ্যাটা বোঝা যাচ্ছে না। যে আটজন সমুদ্রে গিয়েছিল তারা তো কখনই ফিরবে না।'

'সমুদ্রে গিয়েছিল ?'

'পেটের টানে ভয়কে জয় করতে চেয়েছিল। কাল সন্ধ্যেবেলাতেই বুঝে গিয়েছি ওরা ফিরবে না। গ্রামে যা শুনলাম, জনাদশেক তো হবেই। আপনার রাধা বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। ওদের দিকের সবকটা ঘর দেড়মাইল দূরে চলে গিয়েছে।'

'রাধা কাল আমার ওখানে গিয়ে আর ফিরতে পারেনি।'

'লাক্ মশাই, লাক্! আমি তো ভেবেছিলাম মেয়েটা মরে গেছে।'

'কিন্তু শরৎবাবু, আমাদের এখন একটা কিছু করা উচিত।'

'কি করতে পারি? ইমেডিয়েটলি রিলিফ দরকার—চালডাল থেকে শেল্টার, আমার মত মানুষ কি দিতে পারে বলুন আর দেবই বা কোত্থেকে?'

হঠাৎ মনে হল আমরা কিছুই করতে পারি না। টাকা থাকলেও ওইসব জিনিষ এখানে পাওয়া যাবে না। কিন্তু জেলাসদরে খবরটা পাঠানো দরকার। শরৎবাবু বললেন, সেটা তিনি পাঠিয়েছেন। কিন্তু বাসপথ বন্ধ থাকবে। কারণ রাস্তা উড়ে গেছে, ব্রিজ ভেঙ্গেছে। সাইকেলে চেপে লোক গিয়েছে থানায় খবর দিতে।

আর একটু এগোতেই নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কিছু মানুষের সামনে পড়লাম। আক্রান্ত হবার পর যে অসাড় ভাব আসে তা এখনও কাটেনি এদের। জানা গেল সমস্ত গ্রামটায় একটাও বাড়ি আস্ত নেই। যদিও প্রায় প্রতিটি বাড়ি মাটির তৈরী, কিন্তু এখনই আবার সেগুলোকে খাড়া করার সামর্থ্য এদের নেই। কেউ কেউ মাটিতে শুয়ে অথবা বসে প্রাণ বাঁচিয়েছে। না, গ্রাম পর্যন্ত জল ওঠেনি। জল বেরিয়ে গেছে গ্রামের পাশ দিয়ে। রাধাদের দিকটায় তাকালে মনে হবে কেউ যেন মাটি চেঁচে সব ঘর তুলে নিয়ে গিয়েছে। মাছধরার নৌকোগুলো উড়ে গেছে বাতাসে। এখন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো। জালগুলোও আর ব্যবহার করা যাবে না। মাথায় ছাদ হয়তো দেওয়া যাবে কিন্তু পেটের খাবার যোগাড় করার পথ এখন বন্ধ। বয়স্ক পুরুষরাও কাঁদতে লাগল, মেয়েদের মুখ বন্ধ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'দীনবন্ধু কোথায়?'

একজন জানাল, 'ও বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছে বাবু, নাহলে আর বেঁচে নেই।'

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? কি হয়েছিল ওর?'

'পরশু ভোররাতে যারা মাছ ধরতে গিয়েছিল ও তাদের খুব নিষেধ করেছিল। তখন হাওয়া ছিল কিন্তু ঝড় তো ছিল না—তাই ওরা নিষেধ শোনেনি। দলে ওর ছেলেও ছিল। বিকেলে যখন ঝড় উঠল আর নৌকোগুলো ফিরে এল না তখন উনি পাগলের মত ছুটে সমুদ্রে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। আমরা আটকাতে পারিনি। পাগল না হলে কেউ ওইসময় সমুদ্রে যেতে চায়? উনি আর ফিরে আসেননি। ঝড় ওঁকে খেয়ে নিয়েছে।'

হয়তো। দীনবন্ধুর মুখ মনে পড়ল। একমাত্র অলৌকিক কিছু না ঘটলে দীনবন্ধু বাঁচতে পারবে না। উন্মুক্ত সমুদ্রের সামনে কোন মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু যারা মাছ ধরতে গিয়েছিল তারা যে মারা গেছে এমন বলা ঠিক কি? কাগজে পড়েছি ঝড়ে পথ হারিয়ে ফেলা ধীবরদের কয়েক সপ্তাহ পরেও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারা মাছ ধরতে গিয়েছিল?'

নামগুলো শুনতে শুনতে চমকে উঠলাম, 'কি বললে? সুজনও গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' লোকটা জানাল।

চোখের সামনে ছেলেটার চেহারা ভেসে উঠল। এই পরশু সন্ধ্যায় আমার বাড়ির

সিঁড়িতে বসে অনুরোধ করে গেল রাধাকে বিয়ের জন্যে রাজী করাতে। ও যদি ফিরে না আসে, তাহলে রাধার কি কোন ক্ষতি হবে? আমার অনুরোধে রাধা তো সায় দেয়নি। কিন্তু একটা জলজ্যান্ত ছেলে সমুদ্রে ডুবে মারা যাবে? যতই ভাল সাঁতার জানুক, ওই ঝড়ে ভেসে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

শরৎবাবু তখন ওদের বোঝাচ্ছিলেন, আপাতত সবাই ট্যুরিস্ট লজের আশ্রয়ে চলুক। যতক্ষণ না সাহায্য আসে ততক্ষণ মাথার ওপর ছাদ থাকল। ঠাসাঠাসি করে হলেও খোলা আকাশের নিচে তো পড়ে থাকতে হবে না। আকাশের অবস্থা এখনও স্বাভাবিক নয়। বৃষ্টি আবার নামতে পারে। আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শরৎবাবু ওদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। দূরের সমুদ্রকে ক্ষ্যাপা মোষের মত দেখাচ্ছে। এবার বিদ্যুৎ চমকালো। দুপুরের আগেই এমন অবস্থা যে বিকেল হবার আগেই সন্ধ্যা নামবে। কিন্তু গতকাল যে ভয়ঙ্কর ঝড়টা বয়ে গেছে, তার পরেও কি আজ নতুন করে ঝড় আসবে? এরকম তো কখনও শুনিনি? যা হবার তা একবারেই হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে ফিরে আসছিলাম। চারপাশে সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত শরীর। জলের সঙ্গে উঠে এসেছিল, জল নেমে যেতে থেকে গিয়েছে। বাড়িটার কাছে এসে দেখলাম টিলার ডানদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে জল রয়েছে। ওখানকার বালি উড়ে যাওয়ায় সমুদ্রের জল দখল নিয়েছে। জল গভীর নয় কিন্তু ওটা আর একটু বিস্তৃত হলে টিলাটা ধ্বসে পড়বে। বাড়িটাকে বাঁচানোর জন্যে ওই জায়গাটাকে ভরাট করা দরকার।

সিঁড়িতে পা রাখতেই গায়ে জলের ফোঁটা পড়ল। দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকে বাইরের ঘরে একটু বসলাম। রাধা নিশ্চয়ই ভেতরে। কি ভাবে ওকে খবরগুলো দেওয়া যায়? মিনিট পাঁচেক বাদেও যখন সে এল না তখন তার নাম ধরে ডাকলাম। কোন সাড়া এল না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে রান্নাঘরে উঁকি দিলাম, শোওয়ার ঘরেও। রাধা বাড়িতে নেই। অর্থাৎ আমি বেরিয়ে যাওয়ার পর সে বেরিয়েছে। আমিই ওকে গ্রামে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু সবকিছু খোলা রেখে বেরিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। তখন তো নিস্পৃহ গলায় বলেছিল, কি খোঁজ নেব? .

খালিপায়ে নেমেছিলাম বালিতে। পায়ে কাদা লেগে শুকিয়েছে। ধোওয়ার জন্যে বাথরুমে গেলাম। সালোয়ার কামিজ এবং প্যান্টি ঝুলছে। ওগুলো যে ব্যবহৃত তা বোঝা যাচ্ছে। পা ধুয়ে বাইরে এসে ধন্দে পড়লাম। ওগুলোকে এখানে রেখে গেল কেন রাধা? ধোওয়ার জন্যে? প্যান্টির কথা আলাদা, কিন্তু বাকিগুলো তো নতুনই। মনে পড়ল গতরাতে রাধার পরণে সালোয়ার কামিজ ছিল। আমি শুয়ে পড়ার একটু আগে ওগুলো পরে দেখাতে এসেছিল সে। অথচ আজ সকালে ওকে যখন দেখি তখন পরণে শাড়ি। অভ্যেস নেই বলে ওগুলো ছেড়ে শাড়ি পরেছিল নাকি? হয়তো।

আমি খাটে বসলাম। কাল রাত্রে শোওয়ার পর রাধা কি যেন বলেছিল? অস্পষ্ট, খুব অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ছে, ও কি আমাকে মাতাল বলেছিল? অসম্ভব। আমাকে

অমন কথা বলার সাহস ওর কখনও হবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এবং জলের নিচে যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম সেটা এখন মনে এল। কিন্তু এটা কি হল? মালিনীকে নিয়ে আমার মন কোন গোপন আনন্দের কথা ভেবেছিল? মানুষের অবচেতন আকাঙ্ক্ষাই তো স্বপ্ন হয়ে ফুটে ওঠে। আমি কি কখনও মালিনীকে আশরীর গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম? নইলে অমন স্বপ্ন দেখব কেন? হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলাম আমি। ব্যাপারটা কি শুধুই স্বপ্ন ছিল? আমি এখন একটু একটু করে কিছু স্পর্শের কথাও যে মনে করতে পারছি। সেটা তো বাস্তব হতে পারে। আর তাই যদি হয়, তাহলে আমি এ কি করলাম? আমার রুচি, মূল্যবোধ মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে স্রেফ জন্তুর মত আচরণ করেছি। এবং তাই মেয়েটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল গালে হাত রেখে, তাই সে আমার দেওয়া পোশাক ফেলে রেখে দিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি কি করব?

বৃষ্টি পড়ছে না। মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত। আমার খিদেতেষ্টা বোধ নেই। স্বস্তি পাচ্ছি না কিছুতেই। আমি বুঝে গিয়েছি, রাধা আর ফিরবে না। নিজেকে একটা কামুক মাতাল বলে মনে হচ্ছিল। এই বয়স পর্যন্ত কলকাতায় যা করিনি বা যা করার কথা চিন্তাও করিনি, তাই করে ফেললাম? আর অদ্ভুত ব্যাপার, আমার কোন কিছু খেয়ালে নেই? কেউ বিশ্বাস করবে একথা? বুকের ভেতর তোলপাড় হচ্ছিল।

বর্ষাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে গেলাম রাধাদের গ্রামে। হাওয়ায় আমার শরীর ঈষৎ দুলছিল। আমি কেন যাচ্ছি জানি না। শুধু মনে হচ্ছিল আমার যাওয়া উচিত। গ্রামের কাছে এসে চমকে গেলাম। যেন কয়েকশো বুলডোজার দিয়ে গ্রামটাকে পিষে ফেলা হয়েছে। কোন বাড়িঘরই আস্ত নেই। মানুষজনের শব্দ আসছে না কোনখান থেকে। গতরাতের ভয়ঙ্কর ঘটনার পর সবাই যে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে তা নয়। ভাঙ্গাঘর কোনমতে খাড়া করার চেষ্টা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। বোঝা যাচ্ছে মানুষেরা সেখানেই মাথা গুঁজে আছে।

রাধা ঠিক কোন্ দিকটায় থাকে আমি জানি না। আমাকে বিভ্রান্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুকুরেরা ডেকে উঠেছিল। ওদের ডাক শুনে কয়েকজন বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে চিনতে পারল তারা। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের মাঝখানে পড়ে গেলাম। অনেককাল আগে, কৈশোরে, বন্যাপ্লাবিত কোন এক গ্রামে রিলিফ নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন যে দৃশ্য দেখে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, এখন তাই ঘটল। প্রত্যেকেই কাতর গলায় আমার কাছে আশ্রয় এবং খাবার চাইছে। আমার ক্ষমতা অক্ষমতা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না ওরা। যেহেতু গতরাতে ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করেছেন এবং আমাকে অটুট রেখেছেন তাই ওরা মনে করে আমার অসীম ক্ষমতা আছে আর সেই ক্ষমতা দিয়ে ওদের সমস্ত অভাব দূর করতে পারি। আমি ওদের বোঝাতে পারলাম না, অত মানুষের খাবার আমার কাছে নেই। শুধু আলু আর চাল ডাল ছাড়া কোন সঞ্চয় নেই এবং তাও যা আছে তা দুজন মানুষের কিছুদিন চলার মত।

মনে হল অভাবী মানুষের সামনে টিঁকে থাকতে হলে শক্ত হওয়া দরকার। কোথায়

যেন পড়েছিলাম এরকম লাইন। আমি চিৎকার করে ওদের থামতে বললাম। আমার রাগী মুখ, গলার স্বর ওদের হকচকিয়ে দিল। বললাম, 'তোমাদের জন্যে সব ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তার আগে বল, রাধা কোথায়? তোমাদের গ্রামের রাধা যে আমার ওখানে কাজ করত?'

সবাই চুপ করে গিয়েছিল। হঠাৎ একটি প্রৌঢ়া এগিয়ে এল হাত নাড়তে নাড়তে, 'দুদিন ফুর্তি মেরে আজ সকালে এসেছিল দর্শন দিতে। ভাগিয়ে দিয়েছি। এমন প্রলয় হল, অথচ তার কাপড়ে একটুও দাগ নেই। ছ্যাঃ!'

'কোথায় গিয়েছে সে?'

'বাংলোবাড়ির পথে গিয়েছে।'

আমি আর দাঁড়ালাম না। ভিড় সরিয়ে জোরে জোরে পা ফেললাম। ওরা কিছু ভেবে ওঠার আগে অনেকটা দূরে এগিয়ে গিয়েছি আমি। শিশুসমেত এতগুলো মানুষ অভুক্ত থাকবে কতদিন? সরকার বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো এদের কাছে আসতে কত দেরি করবে? এসব চিন্তা মনে উঠেও মিলিয়ে গেল। এরা খাবার এবং আশ্রয় খুঁজছে—আর আমি রাধাকে! এদের কিছু লোক স্বচ্ছন্দে আমার বাড়িটা দখল করে নিয়ে থাকতে পারত—করেনি। আর আমি যাচ্ছি রাধাকে খুঁজে বের করতে, কেন যাচ্ছি তাও ভাল জানা নেই, কিন্তু দখল নেবার কোন বাসনা আমারও নেই।

ট্যুরিস্ট অফিসকে স্থানীয় মানুষ বাংলো বাড়ি বলে। দূর থেকেই দেখতে পেলাম, সেখানে বেশ ভীড় জমেছে। এই ঝিরঝিরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে, বাকিরা বাড়িটার ভেতর ঠাসাঠাসি। আমাকে দেখে শরৎবাবু এগিয়ে এলেন, 'সুখবর আছে। আজ বিকেলেই রিলিফপার্টি এসে যাবে। দারোগাবাবু খবর

'ভাল।' আমি শুকনো গলায় বললাম।

'মুশকিল হল আজকের রাতটা সবাইকে রাখা নিয়ে। একটা ছাদ তো দরকার। এখানে এক ফোঁটা জায়গা নেই।' ভদ্রলোককে চিন্তিত দেখালো।

'এই অঞ্চলে আর একটি বাড়ির ছাদ অক্ষত আছে—সেটা আমার।'

'না, আপনার ওখানে এই পঙ্গপালকে ঢোকালে বাড়িটা শ্মশান হয়ে যাবে।'

'আমার কিছু বলার নেই।'

'আমি ভাবছি শিশু ও মেয়েদের যদি আপনার বাড়ির নিচে পাঠিয়ে দিই। ওই যে গাড়ি রাখার জায়গাটা, যেখানে বোট রেখেছেন, সেখানে তো প্রচুর জায়গা আছে। ওখানে থাকলে হাওয়া লাগবে বটে, তবে মাথার ওপর ঘর থাকায় জল পড়বে না। আপনাকে না জিজ্ঞাসা করে আমি রাধাকে বলেছি মেয়ে আর শিশুদের নিয়ে যেতে।'

'রাধা এখানে আছে?'

'হ্যাঁ। ওই তো উদ্যোগ নিয়ে খিচুড়ি রান্না করল।' শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করলে,

'আজ আপনার খাওয়া হয়েছে?'

আমার খেয়ালই নেই। এমন কি সকাল থেকে পেটে চা পড়েনি। উত্তরটা বুঝতে পেরে তিনি হতাশ গলায় বললেন, 'আমারও খাওয়া হয়নি। খিচুড়ি যা হয়েছিল তাই সবার মুখে পড়ল না।'

শরৎবাবু আবার অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি রাধাকে খুঁজতে লাগলাম। সে যদি বাড়িটার ভেতরে থাকে তাহলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কারণ ওখানে পা ফেলার জায়গা নেই। কিন্তু তাকে আমি বাইরেই পেয়ে গেলাম। ভাঙ্গা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে আরও কয়েকজন মহিলার সঙ্গে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে। এখন আর তার শরীর অক্ষত নেই। গ্রামের সেই প্রৌঢ়া দেখলে নিশ্চয়ই আরাম বোধ করত। আমি ডাকলাম, 'রাধা!'

সে মুখ তুলে আমাকে দেখল এবং একটুও অবাক হল না।

আমি আবার ডাকলাম, 'রাধা, এদিকে এসো।'

বেশ বাধ্য মেয়ের মত সে চলে এল সামনে। কোন কথা বলল না।

ওর গম্ভীর এবং নত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার গলা বুঁজে এল। কি বলব?

'আপনি কিছু খেয়েছেন?' সে জিজ্ঞাসা করল।

আমি কথা খুঁজে পেলাম, 'কি করে খাব? তুমি না বলে চলে এসেছ!'

সে কোন কথা বলল না। তেমনই দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, 'রাধা, আমি—আমি কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'আপনাকে কিছু বলতে হবে না।'

'না, আমি শান্তি পাচ্ছি না—।'

'এখানে এত মানুষের সর্বনাশ হয়ে গেল, তার কাছে তো ওসব কিছু না।'

'সেটা আমি ভাবতে পারছি না। আমি যা করেছি একেবারে অজান্তে করেছি। বিশ্বাস কর, আমার কোন পরিকল্পনা ছিল না। নিজের জ্ঞানে কিছুই করিনি আমি।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?' সে মুখ তুলল।

'আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তুমি যা বলবে তাই করব আমি।'

'অন্যায় করলে তো লোকে প্রায়শ্চিত্ত করে। আপনি তো কোন অন্যায় করেননি।'

'নিশ্চয়ই করেছি। তোমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে—।'

হঠাৎ শব্দ করে হাসল রাধা, 'ঠিক কথা বলছেন না, আপনি যা করেছেন তা আপনার স্বপ্নের মানুষের সঙ্গে করেছেন।'

'কি বলছ তুমি?'

'আমার এই শরীরটাকে চুরমার করে আপনি অন্য একজনকে উপভোগ করেছেন।'

'আমি—আমি—।'

'আমাকে অপমান করেছেন আপনি—আর একজনকে পেতে একটা শরীর দরকার ছিল আপনার—আপনি তাই পেয়েছিলেন।'

'বেশ। তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। তোমার যে ক্ষতি করলাম—।'

'আমার শরীরের কোন ক্ষতি করেননি আপনি।'

'তার মানে ?'

'আমার শরীরের ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা ছিল না আপনার। আমার শরীর থেকে একটা সুতো খোলার প্রয়োজন আপনি অনুভব করেননি। আমি যা যা পরেছিলাম তাই পরে সারারাত কেঁদেছি। ওগুলো আপনার ওখানে খুলে রেখে চলে এসেছি আমি। আমি এতখানি অচ্ছুৎ আপনার কাছে ? ছি ছি ছি!'

'রাধা!'

'আপনি ফিরে যান।'

'তুমি যাবে না ?'

'না। কালকের পর আর না।' সে ছুটে চলে গেল ভিড়ের দিকে। পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকলাম। এ কি শুনলাম আমি ? এতক্ষণ যে অপরাধ-বোধে আক্রান্ত হয়েছিলাম, তা হঠাৎ মাথার ওপর থেকে সরে গেলেও কেন হালকা হতে পারছি না ? কেন মনে হচ্ছে আমার যা করা উচিত ছিল তা করিনি!

চুপচাপ ফিরে এলাম বাড়িতে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নিজের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। কিছুই করার নেই আমার। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে যায় তা না ঘটলে বোঝা যায় না। যদি যেত জীবনটা অন্যরকম হত। কি দরকার ছিল মালিনীর এখানে আশ্রয় নিতে আসার ? কি দরকার ছিল তার বিকেল এবং মধ্যরাতে সমুদ্রে স্নান করার ? আর ওই অল্প সময়টুকুতেই আমার মনে যে ঘুমিয়ে থাকা মন ছিল তাকে জাগিয়ে দেবে সে তাই বা কে জানত। আর কোন কিছু না ঘটিয়ে পরদিন যদি মালিনী ফিরে যেত তাহলে সে হয়তো আমার বুকের মধ্যে এভাবে ঢুকে পড়ত না। ওর চলে না যাওয়ার জন্যে দায়ী এই সমুদ্র। না, সমুদ্র নয়, সেই প্রাণীটি। আমার দিকে জলের গভীর থেকে একদৃষ্টিতে যে তাকিয়ে থাকত। আমি ওকে খুন করব। আই মাস্ট।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গল যখন তখন বৃষ্টি পড়ছে। এখন কত রাত ? ঘড়ি দেখলাম। মাত্র সাড়ে আটটা। সমুদ্র একই রকম গর্জন করছে। আমার ঘর অন্ধকার। কবে আবার ইলেকট্রিকের লাইন ঠিক হবে কে জানে। পেট গোলাচ্ছে। খিদে-খিদে বোধটা থেকেও নেই। সমস্ত শরীরে অদ্ভুত ক্লান্তি। আজ যদি আবার প্রলয় আসে তো আসুক। সব উড়িয়ে নিয়ে যাক। ভেঙ্গে ফেলুক। এক জীবনে বারংবার মরার কোন মানে হয় না।

চুপচাপ অন্ধকারে বসে আমার মনে শরৎবাবুর কথা এল। ভদ্রলোক বলেছিলেন, এই বাড়ির তলায় তিনি নারী ও শিশুদের আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। তারা কি এসেছে ? তারা এল অথচ কেউ আমাকে ডাকল না ? এখন সমুদ্রের ভয়াল আওয়াজে কোন মানুষের শব্দ অনেক কান পেতেও শোনা যাচ্ছে না। তবে কি তারা আসেনি ? শরৎবাবু বলেছিলেন দায়িত্বটা রাধাকে দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই রাধা ওই দায়িত্ব নেবে না।

তবু কৌতূহল হল। উঠতে গিয়ে দেখলাম শরীর টলছে। কোনমতে বাইরে এলাম। এ কি ব্যাপার? আকাশে এখন একফোঁটাও মেঘ নেই। যাকে বলে নক্ষত্রখচিত আকাশ, ঠিক তাই মাথার ওপরে। সমুদ্র যেন মেনে নিতে পারছে না বলেই অশান্ত। ঝড় নেই, বৃষ্টি ঝরার কোন উপায় নেই। কিন্তু আর কোন শব্দ কানে আসছে না। ধরে ধরে নিচে নেমে এস চমকে উঠলাম। অনেকগুলো শরীর প্রায় এক হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে আমার বাড়ির নিচে। নৌকো ও সিঁড়ির আড়াল ওদের বাতাসের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। এখানে যেন পৃথিবীর সব নারী একত্রিত। এদের মধ্যে আলাদা করে রাধাকে খুঁজে বের করার কোন উপায় নেই!

॥ ১৪ ॥
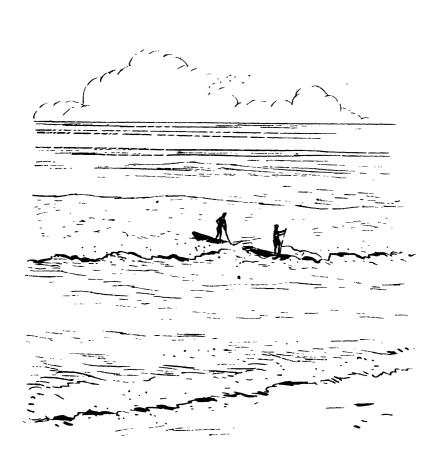
ক্রমশ আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

যেভাবে ঝড়ের পর ধীরে ধীরে আবার গ্রামটা গ্রামের মত তৈরী হয়ে গেল, মানুষের মানুষ হারানোর শোক যেমন সময় ধীরে ধীরে চাপা দিয়ে গেল তেমনি আমি একা থাকার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। এখন নিজের যা কিছু কাজকর্ম নিজেই করি। এক কাপ চায়ের জন্যেও অন্য কারোর ওপর নির্ভর করার প্রবণতাও চলে গেছে। সেই যে বলে, ঠেলার নাম বাবাজী, এও তাই। সকালের চা থেকে যা কিছু নিজের মত করে নিতে নিতে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়ে গেছে।

রাধা আর আসেনি। তার খোঁজ নেবার মানে হয় না বলে নিইনি। সরকার ও সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কল্যাণে এই গ্রামের মানুষের অবস্থা ফিরে গেছে। বিদেশ থেকে কত হাজার ডলার সাহায্য হিসেবে এসেছিল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বলা যায়, এদের কাছেও ভাল অঙ্ক টাকায় রূপান্তরিত হয়ে পৌঁছেছিল। একটু একটু করে অভাব যদি এদের খেয়ে ফেলত, তাহলে কেউ একটি আঙ্গুলও এগিয়ে ধরত না কিন্তু একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এদের জীবনকে অন্য মাত্রা এনে দিল। স্বজন-হারানোর ব্যথা যে ভুলতে পারছে না তার কথা আলাদা।

আমার সময় কাটে ঘরে এবং সমুদ্রে। বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ি প্রায়ই। জলের ভেতর তন্নতন্ন করে খুঁজি। একটা ধারালো বর্শা যোগাড় করেছি। দেখা পেলেই ওটাকে ঘায়েল করব। কিন্তু আমার চোখের সামনে ওটা আসছে না। এখন সমুদ্র অদ্ভুত শান্ত। সামান্য ঢেউ ডিঙ্গিয়ে অনেকটা যেতে অসুবিধে হয় না। যদিও বোটটা একনাগাড়ে খানিকটা চললেই গরম হয়ে যাচ্ছে। মেকানিকের আসার নাম নেই। ওদের আবার চিঠি লিখেছি।

এক দুপুরে সবে খাওয়াদাওয়া শেষ করেছি এমন সময় মানুষের গলা পেলাম। শরৎবাবু ছাড়া কেউ আসেন না আমার কাছে। গলা শুনে কৌতূহল হল। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হল। আমার পুত্র ও কন্যা এগিয়ে আসছে। বড়টার বয়স চব্বিশ, ছোটটার কুড়ি। ওপব থেকে এই দুই যুবক-যুবতীকে দেখে নিজের অতীতকেই যেন দেখতে পেলাম। চোখাচোখি হতে ছেলে মাথা নাড়ল, মেয়ে কিরকম একটা হাসি হাসল।

আমি ডাকলাম, 'এসো।'

ছেলে আগে উঠে এল। আমার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকল। এই ছেলের সঙ্গে আমার মনের দূরত্ব অনেক দিন থেকে তৈরী হয়েছে। ও শতকরা একশ ভাগ মায়ের ছেলে। কিন্তু মেয়ে— ? ও যখন সামনে এল তখন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আমার যা কিছু আনন্দ এই একে ঘিরে বেঁচে ছিল। ওর চুমু না খেলে একটা দিনও আমার কাটতো না।

'কেমন আছ বাবা?' মেয়ের চোখ আমার ওপর।

'আছি। ভাল থাকার জন্যেই তো এসেছি। যাও, ভেতরে গিয়ে বসো।' সভ্যতা আমাকে নির্লিপ্ত হতে শিখিয়েছে। ওরা বাধ্য সন্তানের মত ভেতরে গিয়ে বসল। ওদের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাসে এলে?'

ছেলেই জবাব দিল, 'হ্যাঁ। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে এতটা দূরে ভাবতে পারিনি।'

'জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর। তবে বেশী নির্জন।' মেয়ে বলল।

'আমি তো নির্জনতাই চেয়েছিলাম।' হাসলাম আমি, 'তোমাদের সঙ্গে ব্যাগ নেই?'

'না। আমরা আজই ফিরে যাব।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ। খবর নিয়ে এসেছি তিনটে নাগাদ বাসটা ফিরে যায় এখান দিয়ে।'

'ঘোড়ায় লাগাম দিয়ে কেন এলে? কদিন থেকে যেতে পারতে!'

'অসুবিধে আছে।' ছেলে ঘরের চারপাশে নজর বোলালো।

'খাওয়াদাওয়া করেছ?'

'হ্যাঁ। ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'বেশ। তোমাদের আসার কারণটা বলো।'

'তুমি নিশ্চয়ই মায়ের চিঠি পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। তিনি সমস্যার কথা লিখেছিলেন।'

'তুমি চলে এসেছ, অনেক প্রকাশক রয়ালটির টাকা ঠিকমত দিচ্ছেন না। কেউ কেউ পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি দেখতে চাইছেন। তাছাড়া ইনকামট্যাক্স নিয়েও ঝামেলা হয়েছে। তোমার নিজের নামে যেসব ফিক্সড ডিপজিট আছে সেগুলো নিয়েও প্রব্লেম হবে। তার ওপর তুমি তো কখনও ফিরে যাবে না। হঠাৎ যদি তোমার কিছু হয়ে যায় তাহলে আমরা জলে পড়ে যাব।'

'আমার বয়স এখনো একান্নও হয়নি।'

'জানি। কিন্তু আমার এক বন্ধুর কাকা চল্লিশ বছরেই মারা গেছেন।'

'ও।'

'মায়ের ইচ্ছে, তুমি এই কাগজপত্রে সই করে দাও।'

'কি ওগুলো?'

'পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি, গিফট ডিড, উইল—এইসব।'

'এগুলোতে সই করলে তোমাদের আর কোন সমস্যা থাকবে না?'

'মনে হয়।'

'দাও।' আমি সবকটা কাগজে একটার পর একটা সই করে গেলাম। যে কাগজটায় আমার সমস্ত বই-এর তালিকা রয়েছে তার দিকে নজর দিতেই শরীরটা কেঁপে উঠল। এই এত বই আমি লিখেছি? এত? নামগুলোর দিকে চোখ বোলাতেই আমি আমার সংগ্রামের দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছিলাম। যে বইটি আমার প্রিয় সেই বইটির নামের দিকে তাকাতে মনে কেমন মায়া এল। এখন থেকে এসবই আমার

দুই সন্তানের অধিকারে রইল।

ছেলে বলল, 'তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন যে প্রকাশক তোমাকে টাকা পাঠান, পাঠিয়ে যাবেন। কোন অসুবিধে হবে না। উনি বলছিলেন তুমি নতুন লেখা লিখছ, লেখা হয়েছে?'

'না।' অসাড় গলায় বললাম।

'নতুন লেখা যা হবে সেগুলো নিয়ে নাহয় পরে একটা ডিড করা যাবে।'

'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'এটা কিন্তু আমার একার কথা নয়।' ছেলে জবাব দিল।

আমি মেয়ের দিকে তাকালাম। ওর পনের বছর বয়স অবধি ও আমাকে চুমু না খেয়ে স্কুলে যেত না। সেই মেয়ে এখন আমার সামনে মুখ নিচু করে বসে আছে। মালিনী কি ওর বয়সী ছিল? ও যদি গেঞ্জি প্যান্ট পরে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেত, তাহলে কি ওকে মালিনী বলে কেউ ভুল করত? বুকের ভেতর কেঁপে উঠল।

মানুষের সঙ্গে মানুষের যেসব সম্পর্ক তৈরী করে লালিত হয় সেগুলো যখন ভাঙ্গে তখন অনেকেই স্বাভাবিক বলে মনে করেন। সেই সম্পর্কের শরীরের হাড় নাকি মজবুত হয় না। বিবাহ নামক একটি দণ্ড দিয়ে সেই সম্পর্ককে বাঁধা হয় কিন্তু তেমন চাপে পড়লে সেই দণ্ডও ভেঙ্গে যায়। কিন্তু যেসব সম্পর্ক জন্মসূত্রে আসে, যেসব সম্পর্কের জন্ম মানুষ দেয়, তা নাকি ভাঙ্গা মুশকিল। কিন্তু আমি, এই মুহূর্তে, এই দুটি মানুষের জনক হয়েও সেই সম্পর্ককে ধরে রাখতে পারছি না কেন? না পারার পেছনে আমারও কিছু দায়িত্বহীনতা কাজ করছে। কিন্তু শুধুই দায়িত্বহীনতা, না, মানতে না পারার স্বভাবও।

'তোমার আর কিছুর প্রয়োজন আছে?' ছেলে উঠে দাঁড়াল।

'নো। আই অ্যাম ফাইন্।' হাসলাম আমি।

'তাহলে আমরা যাই?' ছেলে ঘড়ি দেখল।

এইসময় মেয়ে বলল, 'আমি একটু টয়লেটে যাব।'

'তাড়াতাড়ি কর।' ছেলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল।

টয়লেট কোন্ দিকে তা মেয়ে ঠাওর করার চেষ্টা করছিল, আমি তাকে সাহায্য করলাম। সে আমার পাশ দিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

'তোমাদের এখানে খুব ঝড়টড় হয়েছিল, না?' ছেলে চিৎকার করে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।'

'কাগজে দেখেছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। সমুদ্রের পাশে থাকলে ওইরকম ঝড় দেখা যায়।' ছেলে নিচে নামতে নামতে কথাগুলো বলল। আমার খুব মজা লাগছিল।

মেয়ে বেরিয়ে এল টয়লেট থেকে, 'তুমি একদম একা থাক এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'নিজে রান্না করতে পার?'

'কোনরকমে।'

উত্তরটা শুনে সে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকল। হয়তো ওর দেখা মানুষটাকে খুঁজে পেল না।

'তুমি কি এখানেই থেকে যাবে?'

'সেইরকম তো ইচ্ছে।'

সে ঠোঁট কামড়ালো। আর ওই ঠোঁটের মোচড় দেখামাত্র আমার মন ওকে স্পর্শ করার জন্যে ছটফটিয়ে উঠল। গাঢ় গলায় বললাম, 'একটু কাছে আসবি?'

সে এগিয়ে এল। এর মধ্যে বেশ লম্বা হয়ে গেছে সে। শেষবার দেখেছি কাঁধের কাছে, এখন কান ছুঁই-ছুঁই। ওর কাঁধে হাত রাখলাম, 'ভাল থাকিস।'

এইসময় নিচ থেকে ওর দাদা চিৎকার করে ওকে ডাকল—দেরি করলে বাস মিস্ করবে। সে দ্রুত দরজার কাছে চলে গেল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কোন দোষ ছিল?'

'কিছু না, বিন্দুমাত্র না।'

'তাহলে আমার কথা ভাবলে না কেন?'

'ভাবি তো। তবে তুই মায়ের কাছে থাকলে ভাল থাকবি মা।'

সে কয়েক পা এগিয়ে এল, 'তোমার খুব কষ্ট, না বাবা?'

'কে বলল?' হাসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আচমকা শরীর তার সব জল অশ্রুতে রূপান্তরিত করছে বুঝতে পেরে বাঁধ দিতে চেষ্টা করলাম।

'জানি—তুমি বড় একা।'

এইসময় ছেলের অসহিষ্ণু গলা ভেসে আসতেই মেয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেল। আর তখনই ঢল নামল। এত কান্না আমি জীবনে কখনও কাঁদিনি। আমি বসে পড়লাম। নিজেকে সামলাবার শক্তি বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। মনে হচ্ছিল ওর শেষ প্রশ্নটি আলতো করে আমার নিঃশ্বাস টিপে ধরল।

যখন স্থির হতে পারলাম তখনই নিচে ছুটে গেলাম। অনেক দূরে বালির ওপর দিয়ে দুটি মূর্তি হেঁটে চলেছে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে। ওরা আমার সন্তান। দুজন আমার সম্পত্তির দুরকম দখল নিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমি হাঁটতে লাগলাম। দূরত্বটা কমছিল না। স্ট্যাণ্ডে গিয়ে যখন পৌঁছালাম তখন বাস চলে গিয়েছে। আর একটু দেরি হলে বাস ওরাও মিস্ করত। শূন্য স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে নিজেকে অদ্ভুত বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল। আজ আমার এ কি হল? আমার যে কষ্ট ছিল, আমি যে একা এমন কথা কখনও স্বীকার করিনি আমি। মেয়েটার এমন কথা মনে হল কেন? আমার কোন ব্যবহারে? প্রশ্নটা আমি আগামীকালই কলকাতায় গিয়ে ওকে করতে পারি। কিন্তু কি দরকার? মেয়ে বলেই ওর এখনও

মনে হয় এসব কথা। মেয়ে বলেই ও একসময় ভুলেও যাবে কথাগুলো। হঠাৎ মাথায় যন্ত্রণা শুরু হল। বাঁদিকে কনুই থেকে অদ্ভুত টনটনানি। আমি ধীরে ধীরে নিজের বাড়িতে ফিরে আসছিলাম। হাঁটতে ভাল লাগছিল না।

না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়িনি কখনও। তবে কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। রাস্তা অথবা বালির ওপর থেকে গ্রামের লোকেরা আমাকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল বাড়িতে। শরৎবাবু খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে এসেছিলেন। এখানে কোন ডাক্তার নেই। একজন বই পড়ে শেখা হোমিওপ্যাথ আছেন পাশের গ্রামে, তাঁকেই ডেকে এনেছিলেন। তা সেই ভদ্রলোক যদি আমার প্রাণ না বাঁচাতেন তাহলে আমি আর সমুদ্র দেখতে পেতাম না।

আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু কিছুই আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। বুকের বাঁ দিকে যে অসম্ভব যন্ত্রণা তা হৃদ্‌রোগজনিত তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কলকাতায় থাকলে কোন নামী নার্সিংহোমের ইনটেন্সিভ কেয়ারে থাকতাম আমি। অক্সিজেন ইত্যাদি চলত। ডাক্তাররা ঘনঘন শরীর পরীক্ষা করতেন। এখানে একটা সামান্য ইসিজি করানোর উপায় নেই। হোমিওপ্যাথি গুলি হৃদয়কে কতখানি সক্রিয় রাখার ক্ষমতা ধরে তা আমি জানি না কিন্তু যন্ত্রণাটা তো একসময় চলে গেল।

শরৎবাবুর কাছে আমি প্রতিদিন ঋণগ্রস্ত হচ্ছি। এই ঋণ বেড়েই চলেছে। উনি ওঁর সব কাজ ফেলে দিনের বেলায় তো বটেই, রাত্রেও আমার কাছে থেকেছেন। প্রথম দুদিন কোন পথ্যের প্রয়োজন হয় নি, তৃতীয় দিনে সেই দায়িত্ব শরৎবাবু নিয়েছিলেন। আমার দৃষ্টি দেখে তিনি নিজেই বলতেন, 'আমি কিছুই করছি না। আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল কিন্তু হোমিওপ্যাথ বলছেন নড়ানো নিষেধ তাই পারছি না। আরে আমরা মরে গেলে কারও কোন ক্ষতি হবে না কিন্তু আপনার কাছ থেকে পাঠকরা তো এখনও অনেক অনেক আশা করে। আপনাকে আবার লিখতেই হবে।'

যখন একা থাকি তখন অদ্ভুত বিষাদে মন আক্রান্ত হয়। এই পৃথিবীতে আমার কোন সঙ্গী নেই। শুধু সমুদ্রের গর্জন ছাড়া কোন আওয়াজ নেই। আমি বুঝতে পারছি হোমিওপ্যাথি বড়ি আমার শরীরের সব সমস্যা দূর করতে পারছে না। কিন্তু এখন তো হেঁটে বাথরুমে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। এসবই শরৎবাবু করছেন। গতকাল বললেন, 'আপনি যদি চান তাহলে কলকাতায় খবর পাঠাতে পারি।'

মাথা নেড়ে না বলেছিলাম। ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার বিষয়টি তোলেন নি।

বিপদ তো কেটে গেল কিন্তু আমার আরও সেবাযত্নে থাকা দরকার। একজন ভাল ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার। শরৎবাবু বালেশ্বরে গেলেন। ফিরে এলেন একজন ডাক্তারকে নিয়ে। তিনি ফেরার বাসেই ফিরে যাবেন। ভদ্রলোক পরীক্ষা করলেন। ইসিজি করা হল। জানালেন এখন আর ভয়ের কিছু নেই। আমার

মনের জোর নাকি ধাক্কাটাকে সামলাতে সাহায্য করেছে। তিনি ওষুধপত্র আর কিভাবে থাকতে হবে সব জানিয়ে ফিরে গেলে শরৎবাবু বিমর্ষভাবে আমার পাশে বসলেন, 'একটা খারাপ খবর আছে।'

'বলুন!'

'অনেকদিন আগে আমি ট্র্যান্সফারের আবেদন করেছিলাম। বালেশ্বরে গিয়ে শুনে এলাম সেটা মঞ্জুর হয়েছে। আমাকে ইমিডিয়েটলি সেখানে গিয়ে কাজে যোগ দিতে হবে।'

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। এই লোকটার জন্যে আমি এখানে বেঁচে আছি। ঈশ্বর তাঁর খেয়াল অনুযায়ী ঠিক খেলা খেললেন। ভদ্রলোক কারো ভাল বেশীদিন সহ্য করতে পারেন না। আমি লেখালেখি করি বলেই শরৎবাবু আমার সম্পর্কে দুর্বল। হঠাৎ খেয়াল হল, ভদ্রলোক অনেকদিন আগে বলেছিলেন উনিও কিছু লিখেছেন, যেটা আমাকে শোনাতে চান। অথচ আমার তা শোনা হয়নি। দ্বিতীয়বার আর নিজে থেকে উনি বলেননি। ভদ্রলোক বলেই বলেননি। কিন্তু এই অবস্থায় আমি শুনে কি করব ? আমি তো বেশীক্ষণ কিছু ভাবতেই পারি না। বললাম, 'এ তো ভাল খবর।'

'এখন সেটা মনে হচ্ছে না। আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে যাই কি করে ?'

'আমি তো ভাল হয়ে গেছি।'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। আমি যে কেমন আছি তা উনি জানেন। ইদানিং আর একটি উপসর্গ দেখা দিয়েছে। বেশীক্ষণ কিছু চিন্তা করলে মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। সে কি দুঃসহ তা বর্ণনা করা যায় না। বললাম, 'আপনি যান, মাঝে মাঝে কিন্তু আসবেন।'

'আমি একটা কথা বলব ?'

'অবশ্যই।'

'আপনার সেবা দরকার। ভুবনেশ্বর থেকে নার্স আনানো যায়। কিন্তু তাঁরা সবাই প্রফেসনাল। এতদূরে বেশীদিন থাকতেও চাইবেন না তাঁরা। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে একবার রাধার সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

রাধার নামটা শুনে মনে পড়ল ওর কাজ ছেড়ে দেওয়া নিয়ে আমি কখনও শরৎবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিনি যদিও উনিই ওকে আমার কাছে এনে দিয়েছিলেন। একবারও প্রশ্ন করেননি কেন ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন ওঁর বলার ধরণে মনে হল কিছু নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমি চুপ করে আছি দেখে বললেন, 'হয়তো ও অন্যায় করেছিল কিন্তু—।'

'না, কোন অন্যায় করে নি।'

'যাই হোক, আপনার অসুস্থতার খবর পেয়ে সে দুদিন খোঁজ নিতে এসেছিল।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। বলছিলাম, ও তো সব জানে, তাই—।'

আমি চোখ বন্ধ করলাম। জবাব দিলাম না।

আমার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হচ্ছিল। সেটা বুঝতে পেরে শরৎবাবু উঠে গেলেন। আমি কিছু ভাবতে চাইছি না। কিন্তু না চাইলেও ভাবনারা আসছে। মানুষের মন থেকে সব কিছু স্লেটের মত মুছে দেওয়া যদি যেত! আমি নিশ্চিত রাধা আসবে না। তার বদলে আর কাউকে আনবেন শরৎবাবু। কিন্তু সে যাই হোক, কলকাতায় ফিরছি না আমি। শরীরের কারণে আমি আবার ফিরে এলাম এটা বলতে আমি রাজী নই। আশিতে যেটা স্বাভাবিক শোনাবে পঞ্চাশে তা মানায় না।

শরৎবাবু যাকে নিয়ে এলেন তার নাম বনমালী। বয়স ষাটের ওপর। রান্না করতে পারে। ওকে আমার কৈফিয়ৎ হিসেবে জানালেন, 'বনমালী এককালে বিয়ে-বাড়ির রান্না রাঁধতো।'

আমার যে রুগীর পথ্য চাই এটা উনি জানেন।

শরৎবাবু বললেন, 'বনমালীকে আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনার কোন চিন্তা নেই, মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা সংসারের কাজ মন্দ করে না।'

রাধা যে প্রত্যাখ্যান করেছে তা লুকোবার জন্যে ভদ্রলোক এইসব বাহানা দিলেন এবং আমিও তা চুপচাপ মেনে নেবার ভান করলাম।

বনমালীর কাজ কি রকম জানি না তবে মুখ যে বন্ধ হয় না তা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে টের পেলাম। ক্রমাগত কথা বলে লোকটা। আমি যে অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে আছি তার অন্যতম কারণ এখানে একা পড়ে আছি। স্ত্রীপুত্রকন্যার সঙ্গে থাকলে তারা যে সেবা করত তাতে অসুস্থতা দূর হয়ে যেত। নুন ছাড়া যেমন রান্না খাওয়া কষ্টকর তেমন স্ত্রীলোক ছাড়া পুরুষের জীবন। আমি কোন্ সাহসে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গার চেষ্টা করেছি তা আমিই জানি।

শেষ পর্যন্ত ওকে বলতে বাধ্য হলাম, 'তুমি একটু কম কথা বল।'

'আমি আবার বেশী কথা বললাম কোথায়? মানুষের যা বলা উচিত তাই বলি। একটা গরু বা ছাগল তো হাজার চেষ্টা করলেও কথা বলতে পারবে না।'

'তুমি এক কাজ করো। শরৎবাবুকে গিয়ে বলো আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'কেন?'

'এত কথা বললে তোমাকে আমার দরকার নেই।'

'ও। তা বাবু, শরৎবাবুকে কি দরকার, আমিই চলে যাচ্ছি। কেন মিছিমিছি লজ পর্যন্ত আমাকে হাঁটাবেন? এটুকু কথা না বললে আমি পারব না। দুটো টাকা দিন, আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।' টাকা নিয়ে চলে গেল বনমালী।

শরৎবাবু এসে সব শুনলেন। বললেন, 'লোকটা একটা শয়তান। বলে কিনা মেয়েছেলের কাজ ব্যাটাছেলেকে দিয়ে করানো যায়? পারবে কোন ব্যাটাছেলে বাচ্চা পেটে ধরে বিয়োতে উনি? বাড়িতে যে কাজের লোক চান সে শুধু কাজের লোকই হবে না তাকে স্নেহ দেখাতে হবে। মাতৃস্নেহ। ও আমার দ্বারা হবে না।'

'দরকার নেই। আপনি অনেক চেষ্টা করলেন আমার জন্যে। শুধু ঋণী হয়ে

যাচ্ছি।'

'কি বলছেন, ছি ছি ছি। আমি আমার কর্তব্য করছি।'

'কর্তব্য?'

'বাঃ, আপনার মত একজন শ্রদ্ধেয় লেখককে এটুকু যদি না করি তাহলে কলম ধরায় কোন অধিকার আমার নেই।' লাজুক হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

'ওহো। আপনার উপন্যাসটা—।'

'ওটার কথা ছেড়ে দিন। আবার লিখতে হবে। ওটা ভাল লেখা হয় নি। কিন্তু আমি ভাবছি কি করা যাবে আপনার সংসার নিয়ে? লজ থেকে খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করে যাবো?'

'যাবো মানে?'

'আমাকে কালই চলে যেতে হবে।'

'ও।'

'দুবেলার জন্যে ওখানে বলে যাই আর ছেলেটাকে বলি ঘরদোর পরিষ্কার করে দিতে।'

'ঠিক আছে।'

'ওষুধপত্র ঠিকঠাক খাবেন।'

আমি হাসলাম। যাওয়ার সময় শরৎবাবু আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরলো। খুব খারাপ লাগছিল। বললেন, 'সুযোগ পেলেই চলে আসব।'

॥ ১৫ ॥

শরৎবাবু মাসখানেকের মধ্যে আসতে পারেননি। ভদ্রলোকের ওপর আমার একটুও বিরাগ নেই। মানুষ যখন কিছুদিন কোথাও বাস করে তখন সে একটা বৃত্ত তৈরী করে নেয়। সেই বৃত্তের মধ্যে সে জড়িয়ে যায়। যখন সে স্থান-পরিবর্তনে বাধ্য হয় তখন আর একটা নতুন বৃত্ত তৈরী করে নেয়। নতুন বৃত্তে একবার ঢুকে গেলে সে পুরোন বৃত্তের প্রতি আগের টান খুঁজে পায় না। এই সত্যিকে স্বীকার করা ভাল। একমাত্র জন্মসূত্রে অর্জিত সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে এটা হয়তো প্রযোজ্য নয়। তবু আমার জন্যে ভদ্রলোক যা করেছেন তা অনেক।

টুরিস্ট লজের বাচ্চা ছেলেটা আসে তার সময়মত। তবু ওর আনা খাবার খেয়ে আমি মোটামুটি হাঁটাচলা করছি। এতদিন বাড়ির ভেতর ছিলাম, আজ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে জলের গায়ে গিয়ে বসেছি। এখন সমুদ্র শান্ত। সেই বীভৎস চেহারার কণামাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। সমুদ্রের দিকে তাকালেই আমার মনে হয় প্রাণীটার কথা। ওকে খুন করা হয়তো অসম্ভব। এই শরীর নিয়ে তো সম্ভবই নয়। তাছাড়া জলের কোন্ অঞ্চলে ও লুকিয়ে আছে তা জানা যাবে না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে মালিনীকে খুন করার পর ও লুকিয়ে আছে। আমার সামনে আসার সাহস ওর নেই। অবশ্য সমুদ্রের যে জায়গাটায় এলে আমি আগে দেখতে পেতাম সেখানে এখন এলেও আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমার এই দুর্বলতার খবর তো ওর জানা নেই।

আমার মনে হচ্ছিল দুটো কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার পৃথিবীতে থাকা খুব প্রয়োজন। একটা ওকে বধ করা, দ্বিতীয়টা হল উপন্যাস শেষ করা। একজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ লেখক নিজের একটি উপন্যাসকে শেষ উপন্যাস হিসেবে বিজ্ঞাপন দিয়ে চমক সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। আমার সেরকম বাসনা নেই। আমাকে শুধু লেখাটাকে পরিণত করতে হবে। কদ্দিন লাগবে তা ঈশ্বর জানেন।

আমি উঠলাম। ফুরফুরে বাতাস বইছে। কয়েক পা হাঁটতেই দুর্বলতা টের পেলাম। বালির ওপর দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোতে হাঁটু ভেঙ্গে গেল। বসে পড়লাম। বুঝলাম শরীরের শক্তি নিঃশেষ। সেগুলো ফিরে পেতে সময় লাগবে।

খাবার দিতে এসে ছেলেটা দেখল আমি বালির ওপর শুয়ে আছি। বোধহয় ভেবেছিল মরে গেছি তাই চিৎকার করতে লাগল। আমি তাকে কাছে ডাকতেই সে চুপ। বললাম, 'খাবারটা ওপরে রেখে দিয়ে আয়।'

'আপনার শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ। একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। তুই যা।'

ছেলেটা ওপরে উঠে খাবার রেখে এসে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। বেশ অবাক হয়ে গিয়েছে সে। তারপর হঠাৎই দৌড়াতে লাগল।

আমার বেশ মজা লাগছিল। বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছি আমি। এভাবে আকাশ আমি কতকাল দেখিনি। চোখের সামনে আকাশের ওপর আকাশ। জীবনানন্দকে খুব মনে পড়ে এই রকম সময়ে। বাতাসের ওপারে বাতাস— আকাশের ওপারে আকাশ।

হঠাৎ দেখি ছেলেটা ফিরে এসেছে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। তারা ব্যস্ত হয়ে আমার প্রতিবাদ না শুনে পাঁজা-কোলা করে ওপরে তুলে দিল। বিছানায় শুইয়ে জিজ্ঞাসা করল এবার তাদের কর্তব্য কি? বললাম, 'আর কোন দরকার নেই। আমি ঠিক আছি, তোমরা যেতে পার।'

ওরা কিন্তু কিন্তু করেও শেষ পর্যন্ত চলে গেল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। দুর্বল হলেও আবার কিছুটা শক্তি ফিরে পেয়েছি। ছেলেটার রেখে যাওয়া খাবার অল্প খেলাম। ওরা আমার জন্যে প্রায় মশলাবিহীন রান্না করে। স্বাদ মারাত্মক। কিন্তু তাই বা দিচ্ছে কে? এটুকুর জন্যেও আমি শরৎবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ।

বিকেলে ঘুম ভাঙ্গলে আমি অবাক হয়ে দেখলাম রাধা দাঁড়িয়ে আছে। আমি কি এখনও ঘুমিয়ে আছি? না। বিছানায় উঠে বসলাম, 'কি ব্যাপার?'

'আপনার শরীর আবার খারাপ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, ওই আর কি!'

'আপনি কলকাতায় ফিরে যান।'

'সেটা আমি বুঝব।'

'তাহলে আমি এখানে থাকব!'

'থাকব মানে?'

'আপনার এখানে থাকব।'

লোভ হল। রাধা থাকা মানে নিশ্চিন্তি। সকালের চা থেকে রাতের খাবার, বাড়ির প্রতিটি কাজ ঠিকঠাক হওয়া। আমি ঘাড় নাড়লাম, 'বেশ।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি চা পেলাম। চা খাওয়ার পর সে আমার ওষুধের তালিকা বুঝতে এল। দেখলাম একজন নিরক্ষরও চেহারা দেখে অনায়াসে ওষুধ আলাদা করে নিতে পারে। আমি তাকে একবারও জিজ্ঞাসা করলাম না কেন অতকাণ্ডের পর এতদিন বাদে সে ফিরে এল? সে নিজেও কোন জবাবদিহি করল না।

ব্যালকনিতে চেয়ার পেতে সে আমাকে ধরে ধরে বসিয়ে দিল। বলল, 'সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে বসবেন।' আমি মান্য করলাম।

হঠাৎ মেয়ের মুখ মনে এল। মেয়েটা এখনও নরম রয়েছে। ওকে জড়িয়ে ধরতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু সে তো কলকাতায়। যখন আমার কাছে এসেছিল তখন নিজেকে লোহার মত শক্ত মনে হচ্ছিল। মনের সঙ্গে দেহের কোন যোগাযোগ ছিল না।

সন্ধ্যে নামতেই রাধা আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। বালিশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই এখন আর মদ খান না?'

'না। তবে দুর্বলতা কাটাতে একটু আধটু খাব বলে ভাবছি।'

'একদম না। সবাই মদ খেয়ে শক্তি পায় না।'

'আমি পাই।'

'বাজে কথা। মদ খেলে আপনার হুঁশ থাকে না।'

সে চলে গেল ভেতরে আর আমি আমার ছেলেমেয়ের মায়ের গলা পেলাম। তিলকে তাল করে বলায় তার কোন জুড়ি ছিল না। রাধা একদম সেই গলায় কথা বলছে। কলকাতা থেকে চলে এসে আবার সেই গলা শোনার ইচ্ছে আমার নেই।

আটটার মধ্যে রাতের খাবার খাইয়ে শুতে বলল রাধা। আমি প্রতিবাদ করলাম। সে শক্ত মুখে বলল, 'যদি আপনি আমার কথা না শোনেন তাহলে আমি আর এখানে থাকব না।'

একবেলাতে বুঝে গিয়েছি প্রয়োজনটা কার এবং কতখানি। পৃথিবীতে কোন জিনিসটা বেশী ব্ল্যাকমেলড্ হয় তার খতিয়ান আমার জানা নেই। বোধহয় স্নেহ প্রথমে তারপর প্রেম। এবং তৃতীয় জায়গায় রয়েছে বেঁচে থাকার সুযোগ-সুবিধে। এই বেঁচে থাকা হরেক রকমের হতে পারে। খ্যাতির জন্যে বেঁচে থাকা, অর্থের জন্যেও। রাধা আমাকে তৃতীয়টিতে ব্ল্যাকমেল করছে। খ্যাতি বা অর্থ নয় একটু তাৎক্ষণিক সুখের জন্যে। বেঁচে থাকতে এই সুখটুকুর প্রয়োজন খুবই।

দুদিনে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। যে রাধা প্রথমদিন ঘোমটা পরে এসেছিল তার সঙ্গে এই রাধার কোন মিল নেই। এবার সে যেন শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে ঢুকেছে। সে সবই করছে আমার ভালর জন্যে কিন্তু সেই করার ধরণটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। ইতিমধ্যে আমার শরীরে যেন বল এসেছে সামান্য। আমি সহ্য করছিলাম আর একটু সুস্থতার জন্যে।

এই রকম একটা শাসিত হবার সময়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি ফিরে এলে কেন?'

'এলাম। আসতে ইচ্ছে করল, তাই।'

'আমি তো তোমাকে অপমান করেছি।'

'সেটা আমি বলেছি বলে আপনার মনে হয়েছে। তখন তো কোন জ্ঞান ছিল না।'

'তার মানে?' আমি অবাক, 'অন্য কাউকে ভেবে তোমাকে অপমান করিনি আমি?'

'আমি যা বলেছি সেটা সত্যি বলে ভাবছেন কেন?'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'সব কিছু বুঝতে হবে না আপনাকে। চুপচাপ শুয়ে থাকুন।' সে চলে গেল।

এ কি রকমের হেঁয়ালি? আমি কি সত্যি সত্যি—! উঠে গেলাম রান্নাঘরে।

'তোমাকে বলতে হবে।'

'কি?'

'আমি তোমাকে বেইজ্জত করেছি কিনা?'
'বেইজ্জত? না। করেননি।'
চাপ, পাহাড়ের চেয়ে ভারি চাপটা সরে গেল। আমি ফিরে এলাম।
রাতের ওষুধ খাইয়ে রাধা বলল, 'আমি যখন ফিরে এসেছি তখন আপনি কি করেছিলেন আর করেননি তা ভেবে কি লাভ! যদি বলতাম আপনি আমাকে ভোগ করেছেন তাহলে কি প্রায়শ্চিত্ত করতেন? বিয়ে করতেন আমাকে? পারতেন না। আর ভোগ তো পুরুষ একা করে না। আমারও সায় ছিল বলতে হবে। যদি বলি করেন নি তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা উঠে গেল? আমি কি আপনাকে কখনও বিপদে ফেলেছি? একটুও ভাল চাই নি? যে ভাল চায় তাকে অপমান করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না? ঘুমিয়ে পড়ুন।'
কদিনে আবিষ্কার করলাম এই সংসার আমার নয়। রাধা সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে বসে আছে। তার হাতেই সব। আমি পুতুল মাত্র। আমার শরীর অনেকটা সুস্থ করে তুলেছে সে এবং তার বদলে তাকে ওই কর্তৃত্ব দিতে হয়েছে আমাকে।
আজ সকালে চটপট কাজ সেরে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করে রাধা বেরিয়ে গেল কেনাকাটা করতে। বাড়ির সাংসারিক জিনিষপত্র নাকি তলানিতে ঠেকেছে। ও চলে যাওয়া মাত্র মনে হল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কোন কারণে কলকাতাতেই একা থাকার সুযোগ ঘটলে এমনটা মনে হত। আমি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। এখন সকাল দশটা। হঠাৎ শান্ত সমুদ্রের জলে কেউ যেন জল ছুঁড়ল। কোন বড় মাছের লেজের ঘাই? এতখানি জল? আমার মনে হল প্রাণীটি ফিরে এসেছে। অনেক অনেক লুকোচুরির পর আর নিজেকে আড়ালে রাখতে পারছে না। আমি সতর্ক চোখে তাকালাম। না। জলের নিচে ওটা স্থির হয়ে নেই কোথাও।
মাথায় ঢুকে গেল। প্রাণীটা ফিরে এসেছে। এত বড় ঘাই সমুদ্রে তোলার মত মাছ এ অঞ্চলে নেই। ওটাকে খুন করার এই শেষ সুযোগ। আবার যদি গভীর জলে চলে যায় তাহলে কোনদিন হদিশ পাব না। রাধা নেই, সুযোগটাও এসে গেল।
রান্নাঘরে ঢুকলাম। ময়দা বের করে জল দিয়ে মেখে বল তৈরী করলাম। গোটা পাঁচেক। তারপর অনেকদিন আগে কেনা ছিপ আর বড়শি বের করলাম। সেই সঙ্গে বর্শাটা। তার পর অস্ত্রগুলো নিয়ে নিচে নামলাম। একটা খাবার জলের বোতল নিয়ে নিলাম। খুব ভাল না হলেও শরীর কোন প্রতিবাদ করছে না। জিনিসগুলো নৌকোয় রেখে বাঁধন খুলে ঠেলতে লাগলাম। সেই যে প্রলয়ের আগে খবর দিয়েছিলাম সারাবার জন্যে, এখনও মিস্ত্রি আসে নি। বেশীক্ষণ এক নাগাড়ে না চালালে গরম হবে না জানি। তেল ভরাই আছে। ঠেলতে ঠেলতে কোন রকমে জলের গায়ে নিয়ে এলাম মোটর বোটটাকে। অদ্ভুত একটা জেদ আমাকে পেয়ে বসল। সুস্থ একজন মানুষের পক্ষে যা রীতিমত কষ্টসাধ্য তা আমার কাছে কদিন আগেও ছিল কল্পনার বাইরে। কিন্তু হাঁপিয়ে পড়লেও এক আসুরিক শক্তি বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্যে

আমাকে ভর করেছিল।

জলের ওপর বোটটাকে নিয়ে এসে একটু বিশ্রাম নিতেই শরীর ঠিক হয়ে গেল। অনেক অনেকদিন বাদে আজ সমুদ্রে নামলাম। কোমর জলের কাছে পৌঁছে উঠে বসলাম বোটে। দড়িতে টান দিয়ে বোটটাকে চালু করতে চেষ্টা করলাম। আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু ইঞ্জিন জাগছে না। অথচ ঢেউ-এর মৃদু ধাক্কায় নৌকো সরে আসছে তীরের দিকে। বোটের তলা বালিতে ঠেকে যাওয়ার আগে ইঞ্জিন চালু হল। আঃ, আরাম।

বোটটাকে বড় বড় ঢেউ পেরিয়ে নিয়ে এলাম সেইখানে যেখানে প্রাণীটাকে এর আগে ঘাই মারতে দেখেছিলাম। আমার হাতের পাশে ধারালো ফলাওয়ালা বর্শা রয়েছে। দৃষ্টিসীমায় আসা মাত্র ওটা ছুঁড়ে মারতে হবে। যা কিছু শক্তি শরীরে রয়েছে ওইটুকুর জন্যে সেটা জমা রাখতে হবে। চেষ্টা করতে হবে মাথা, খুব ভাল হবে চোখের ভেতর যদি বর্শাটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারি। বোটটাকে ঘোরাতে লাগলাম। এখানে জল অনেকটা স্থির। অনেকটা নিচ দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেখানে কোন প্রাণী নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম বোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে। জায়গাটা চিনতে কোন অসুবিধে হয় নি, এখানেই মাছটা জল ছিটিয়েছিল। আমি ময়দার বলের টোপ বঁড়শিতে পরিয়ে সেটা জলে ফেললাম। না, এখানে জল মোটেই গভীর নয়। এত অগভীর জলে অত বড় প্রাণীটা এসে কি বালিতে বুক চেপে বসে থাকত? আমার বাড়িটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যাচ্চলে! তাড়াহুড়োয় দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছি। আমার ধরনটাই ওই রকম। একবার স্টেশনে গিয়ে খেয়াল হয়েছিল টিকিট বাড়িতে ফেলে এসেছি। যদিও এখানে চুরি-চামারি হয় না তবু অস্বস্তি থাকল।

না, আমার ফেলা টোপ কেউ ঠোকরাচ্ছে না। মিনিট পনের পরে বেশ হতাশ হয়ে এপাশ ওপাশ তাকাচ্ছি এমন সময় নজরে পড়ল দূরে সমুদ্রের ভেতরে জল ছিটকে উঠছে। পর পর দুবার। অর্থাৎ ওইখানে প্রাণীটা ঘাই মারছে। সঙ্গে সঙ্গে হুইল ঘুরিয়ে সুতো গুটিয়ে ছিপটাকে নৌকোয় রেখে ইঞ্জিন চালু করলাম। এবার একবারেই চালু হল। একবার গরম হয়ে গেলে বোধ হয় কর্ম-ক্ষমতা বেড়ে যায়।

বেশ দ্রুত গতিতে সমুদ্রের অনেকটা ভেতরে নিয়ে এলাম বোটটাকে। আমি আসা মাত্র সব শান্ত হয়ে গেছে এখানে। বর্শা হাতে জলের ওপর তীব্র দৃষ্টি রাখলাম। ছোট ছোট দু তিনটে মাছ পাক দিয়ে গেল। তারা লম্বায় এক ফুটও হবে না। ইঞ্জিনের আওয়াজে হয়তো প্রাণীটা সরে গেছে এখান থেকে। সেটা খুবই সম্ভব। এই সমুদ্রে মোটর বোটের আওয়াজ প্রথম শুনছে জলের প্রাণীরা। অনেক দূরে কলার ভেলার মত নৌকো ভাসছে। মাছ ধরার নৌকো। মাথার ওপর সিগ্যালেরা এখনও চমৎকার। ইঞ্জিন বন্ধ করে আবার বঁড়শি ফেললাম জলে। এখানে জল বেশ গভীর। বোট রয়েছে স্থির হয়ে। দূরে আমার বাড়িটাকে দেশলাই বাক্সের মত দেখাচ্ছে।

মাথার ওপর রোদ তখন বেশ চড়া। চার পাশে জল, জলের ওপর বোট, বোটের ওপর আমি, তবু বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। মুখ তুলে ওপরে তাকানো যাচ্ছে না।

পাঞ্জাবিটা খুলে মাথায় বেঁধে নিলাম পাগড়ির মত। বেশ আরাম হল তাতে। হঠাৎ খেয়াল হল ভুল হয়েছে আরও। জলের বোতল তো নিয়ে এসেছি কিন্তু কিছু খাবার নিয়ে আসা উচিত ছিল। ভাবতেই খিদে খিয়ে পেয়ে গেল।

জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ টনটন করতে লাগল। সুতোয় কোন কাঁপন নেই। তবে কি সমুদ্রের মাছ ময়দার টোপ খায় না? তা কি করে হবে, আমি নিজের চোখে প্রাণীটাকে ছুঁড়ে ফেলা ময়দার বল খেতে দেখেছি। কেমন ঝিমুনি আসছিল। মাথায় রোদ লাগছে না কিন্তু একটা মিঠে বাতাস বইছিল। বোধ হয় সেই কারণে ঝিমুনি হল। মাছটাকে ধরতেই হবে। যদি সে টোপ গেলে তাহলে একবারে নৌকোয় তোলার চেষ্টা করব না। সেটা বোকামি হবে। গেলা মাত্র সুতো ছাড়বো। খেলিয়ে খেলিয়ে ওটাকে দুর্বল করতে হবে। এমন দুর্বল যখন আর নড়তে পারবে না। তখন সুতো গুটিয়ে এনে বর্শা ছুঁড়ে ওর প্রাণ বের করতে হবে। তার পর জলের মধ্যে দিয়ে টেনে টেনে তীরের দিকে। ওই প্রাণীর মাংস আমি ছুঁয়েও দেখব না। রাধা খেলে খাবে নইলে বালিতে গর্ত খুঁড়ে পুতে দেব।

হঠাৎ ছিপ কেঁপে উঠল। চমকে উঠে টান দিলাম। কিছু একটা খেয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ শক্তিশালী নয়। সামান্য টানতেই জলের ওপর উঠে এল বিশাল একটা কাঁকড়া। এতবড় কাঁকড়া সাধারণত প্রাগৈতিহাসিক পিরিয়ড নিয়ে তৈরী বিদেশি সিনেমায় দেখা যায়। ওর মুখ থেকে বঁড়শি বের করতে অনেক কসরৎ করতে হল। বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রাণ বের না করা পর্যন্ত তা পারিনি। আমার ভাগ্য ভাল ওটা আমার ছিপের সূতো কামড়ায়নি। সামান্য চাপেই বঁড়শিটাকে হারাতাম আমি।

কাঁকড়াটাকে রেখে দিলাম। এত বড় সামুদ্রিক কাঁকড়া নিশ্চয়ই কেউ না কেউ খায়। বাড়িতে যেদিন কাঁকড়া রান্না হত সেদিন অনেকটা সময় নিয়ে দুপুরের খাওয়া খেতাম। আজকাল আর ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না।

আবার বঁড়শি ফেললাম। সূর্য এখন মাথার ওপরে।

'বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের/ঈষৎ নিভেছে আলো সূর্য নক্ষত্রের।'

কিন্তু কোথায় নিভেছে? চোখ তুলতে পারছি না ওপরে। জলে রোদের প্রতিফলন মোটেই সহনীয় নয়। তেষ্টা পাচ্ছে খুব। হাত বাড়িয়ে বোতলটা টেনে নিয়ে কয়েক ঢোঁক খেলাম। আঃ, কি তৃপ্তি!

ঘন্টাখানেক চলে গেল। আমার টোপ অক্ষত। সূর্য এবার ঢলছে। প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে। ইদানিং, অসুখের পর, খিদেটা যেন বেশীই পায়। কেন যে খাবার সঙ্গে আনি নি। মুখ ফিরিয়ে বহু দূরে আমার বাড়িটাকে আবছায়া দেখলাম। রাধা নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। ফিরে এসে আমাকে এবং নৌকো না দেখে বুঝতেই পেরে গেছে সব। নিশ্চয়ই বেশ রেগে যাবে। ও এখন আমার গার্জেন হিসেবে যা যা করার তাই করছে। এবার ফিরে আসার পর আমি ওকে সেই স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছি বটে কিন্তু দূরত্ব রেখে চলেছি।

কিন্তু এই ভাবে চললে বেশী দিন সেটা রাখা সম্ভব হবে না। শরীর বড্ড শরীরকে টানে।

আমার তো এখন কোন পিছু টান নেই। ছেলেমেয়ে এসে তাদের দখল আইনসম্মত করে নিয়ে গেছে। তাদের মা নিশ্চয়ই সেটাকে সমর্থন করেছেন। সংসারে থাকতে থাকতে আমি যদি দুম করে মরে যেতাম তাহলে ওরা যে সমস্যায় পড়ত এখন আর সেটা থাকছে না। আমার বন্ধু অশোকের সুন্দর পরিবার ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে ওর চমৎকার বোঝাপড়া। মেয়েটা বাবার জন্যে পাগল। হঠাৎ বাথরুমে পড়ে গেল অশোক, নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে যেতে পঁয়তাল্লিশ বছরের শরীরটা নিথর। সেই শোক দেখা যায় না। কি বলে ওদের সান্ত্বনা দেব আমরা? এত নিষ্ঠুরতা শুধু ঈশ্বরকেই মানায়, কেউ কেউ বলেছিল। অশোকের টাকা-পয়সা ব্যাঙ্কে থাকত স্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত ভাবে, তাই সংসার চলছিল। মাস কয়েকের মধ্যে অশোকের স্ত্রী স্বামীর অফিসে চাকরি পেল। এক বছর পর গিয়ে দেখলাম অনেকফুলের মালা পরে অশোকের ছবি হাসছে। এখানে চলে আসার কয়েকদিন আগে গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। অনেক সমস্যার কথা বললেন অশোকের স্ত্রী। মেয়ে প্রেম করছে জানালেন। অশোকের ছবিটা দেখে বুঝলাম আজকাল আর নিয়মিত হাত পড়ে না ওখানে। সময়ের ধূলো বড় নির্মম। অশোক মারা যেতে এদের জন্যে কষ্ট হয়েছিল, এখন অশোকের জন্যে।

অতএব আমি বেঁচে থাকলে যা হবে মরে গেলেও তাই হবে আমার ছেলেমেয়েদের কাছে। শুধু মেয়ের মুখটা মনে করলে এটা ভাবতে একটুও ভাল লাগে না। যা হোক, একবার শেকল ছিঁড়ে যখন বেরিয়ে এসেছি তখন আবার নতুন করে শেকল পরার বিন্দুমাত্র সাধ নেই। রাধা ক্রমশ ধীরে ধীরে সেই দিকেই এগোচ্ছে।

হঠাৎ টান লাগল সুতোয়। সঙ্গে সঙ্গে ছিপ তুলে পাল্টা টান দিতেই বুঝলাম কিছু একটা আটকেছে জলের ভেতর। সেটা এত ভারি যে আমার পক্ষে নড়ানো অসম্ভব। কি করা যায়? হঠাৎ সুতোটা পাক খেয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। মাছটা জলের মধ্যে ছুটছে। আমি সুতো ছাড়তে লাগলাম। হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যখন প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গিয়েছি তখন আবার সেটাকে গোটাতে চেষ্টা করে বুঝলাম সামান্য প্রতিরোধে সুতো ছিঁড়ে যাবে। আর তখনই নৌকোটায় টান লাগল। কিছু বোঝার আগে জলের নিচে সেই মাছ অথবা মাছ জাতীয় প্রাণীর টানে সুতো, সুতোর টানে আমাকে নিয়ে নৌকো ছুটতে লাগল গভীর সমুদ্রের দিকে।

সোঁ সোঁ করে আমার নৌকো ছুটছে। মাছটা আমার অনেক আগে। সুতোটা এখন লাগামের মত কাজ করছে। এক হাতে ছিপ অন্য হাতে নৌকো আঁকড়ে ধরে বসে আছি। পা দুটো ঢুকিয়ে দিয়েছি খাঁজে যাতে ছিটকে বেরিয়ে না যাই। জলের ওপর নৌকা যতই হাল্কা হোক এই মাছের আকৃতি সম্পর্কে কোন কল্পনাই করতে পারছিলাম না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত মালিনীর হত্যাকারীকে আমি ধরতে পেরেছে এবং একে খুন না করা পর্যন্ত আমি থামব না।

দূরত্ব মাপার কথা মনেও আসে নি, আমি শুধু ভাবছি কতক্ষণে প্রাণীটা পরিশ্রান্ত বোধ করবে। যাঁরা মাছ ধরেন তাঁরা নাকি বড় মাছ পেলে খেলান, খেলিয়ে খেলিয়ে দুর্বল করে তবে ডাঙায় তোলেন। আমি এখন খেলাচ্ছি না ও আমাকে, তা জানি না। তবে যেই ও দুর্বল হয়ে পড়বে অমনি সুতো গোটাতে আরম্ভ করব।

হঠাৎ মাছটা দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে গেল কারণ আর টান পড়ছে না নৌকোয়। অথচ সুতোটা আটকানো আছে জলের নিচে। আমি একটু সুতো গোটালাম হুইলে। তাতে নৌকোটাই এগিয়ে গেল সামনে। জলের নিচে যে আছে সে রইল স্থির। কতটা সুতো গোটানো উচিত হবে বুঝতে পারছি না। মাছটা যদি আমাকে পরীক্ষা করতে চায়। ওর প্রাথমিক ভয়ের চোটে এতটা দূর ছুটে এল, এখন পরিস্থিতি বুঝে মুক্তির উপায় খুঁজছে। যদি আক্রমণ করে? যদি সোজা আমার মোটরবোটের নিচে এসে ঢুঁ মারে? আমি আর সুতো গোটাবার চেষ্টা করলাম না। ঘাড় ঘুরিয়ে তীরের দিকে তাকালাম। আশ্চর্য, তীর কোথায়? আমার যে বাড়িটাকে আবছা দেখা যাচ্ছিল সেটাও উধাও। এ আমি কোথায় চলে এলাম? কোন দিক দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। আমি ছিপটাকে দুই হাঁটুর মধ্যে আটকে মোটর বোটের ইঞ্জিন চালু করতে চাইলাম। প্রথমবার মিস ফায়ার হল। দ্বিতীয়বার শব্দ হওয়া মাত্র মাছটা আবার প্রবল বেগে ছুটতে লাগল। আমি ছিপ হাতে নিয়ে বসে আছি। বোট ছুটে চলেছে। যদি মাছটা জলের গভীরে নেমে যায় তাহলে ছিপটাকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কানের কাছে ইঞ্জিনটা শব্দ করছিল, মাঠের ওপর ঘোড়া অথবা বরফের ওপর কুকুর যেমন গাড়ি বা স্লেজ টেনে নিয়ে যায় সেই রকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল। আমি পৃথিবী বিস্মরিত হয়ে শুধু জলের মধ্যে ছুটন্ত প্রাণীটির চলন লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎই খেয়াল হল ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেছে। কোন শব্দ নেই এই মাঝ সমুদ্রে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছটা থেমে গেল। যতক্ষণ না গতি স্তিমিত হল ততক্ষণ বোট এগিয়ে চলেছিল। এমন হতে পারে মাছটা এখন আমার বোটের নিচে। জোরে যদি একটা ধাক্কা দেয় তাহলে বোট শুদ্ধ আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ঈশ্বর এই সব প্রাণীদের বুদ্ধিতে যেহেতু কোন ভাঁজ রাখেন নি তাই ও রকম কিছুই ঘটল না। আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম। মাথায় কাপড় থাকা সত্ত্বেও রোদ শরীরটাকে গরম করে ফেলছিল। এখন নিজেকে পরিশ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। হাত বাড়িয়ে জলের বোতল টেনে নিয়ে কয়েক ঢোঁক খেলাম। কিছু খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লে এই সময় চমৎকার লাগত। এ দুটোর কোনটাই এখন করা সম্ভব নয়।

ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। ওটাকে চালু করে যদি খানিকটা এগিয়ে যাই তাহলে মাছটা কি আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হবে? এতটা ছোটাছুটি করে ব্যাটা নিশ্চয়ই এখন খানিকটা ক্লান্ত হয়েছে। ছিপ সামলে আমি ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা করলাম। বেশ কয়েক বারের চেষ্টা শুধু শব্দেরই জন্ম দিল ইঞ্জিনে প্রাণ এল না।

আর সেই আওয়াজ পেয়ে মাছটা আবার ছুট লাগাল। এবার আড়াআড়ি। আমি

ইঞ্জিন ছেড়ে আবার ছিপ সামলে বসলাম। বোটটা ঘুরল মাছের টানে। কিন্তু একি? মাছটা সোজা না ছুটে জলের ভেতর দিয়ে আবার আমার দিকেই ছুটে আসছে। সরাসরি আক্রমণ করবে নাকি? আমি ভয়ে কাঠ হয়ে রইলাম। কিন্তু সেটা পাশ কাটিয়ে কিছুটা গিয়ে থেমে গেল। এই যাওয়ার পথে ওর লেজের প্রান্তও আমার চোখে পড়ল না। যদি পড়ত তাহলে না হয় আন্দাজ করে বর্শা ছুঁড়ে ঘায়েল করার চেষ্টা করতাম।

হুইল গোটাতে সুতো ছোট হল। মাছটা কাছাকাছি থাকায় সুতো বাড়তি হয়ে গেছে। কিন্তু এরই মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে অনেকটা। মাছটা আবার জলের ভেতর স্থির। আমি উঠলাম। বুকের মধ্যে আর এক ধরণের ভয় তির তির করছিল। আমি ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা করলাম। এখন আওয়াজও হচ্ছে না। হাত রাখলাম, ইঞ্জিন প্রচণ্ড তেতে গেছে। গরম তো এর আগেও হচ্ছিল। কমপ্লেন করেছিলাম, ওরা কথা দিয়েছিল এসে ঠিক করে দিয়ে যাবে। এখন কি হবে? হয়তো ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত ইঞ্জিনটা আর চালু হবে না। ঠাণ্ডা আর কতক্ষণ হবে? এটা তো আজ তেমন চলেই নি।

মনে হচ্ছিল শরীর থেকে সমস্ত শক্তি উবে গেছে। জল তেষ্টা পেল। বোতলটা হাতে নিয়ে নিজেকে সামলালাম। আর আধবোতলও নেই। এটা ফুরিয়ে গেলে আর কিছু থাকবে না। ইঞ্জিন চালু না হলে আমার পক্ষে তীরে ফিরে যাওয়া কি কখনও সম্ভব হবে? আমি মুখ তুলে চারপাশে তাকালাম। একটাও জেলে নৌকো দেখতে পাচ্ছি না। তীর থেকে ওরা যখন জলে নামে তখন কি এদিকে আসে না?

সুতোটা ধরে মৃদু টানলাম। হঠাৎ মনে হল আমি একা নই। আমার যে সঙ্গী জলের নিচে রয়েছে তার বাসস্থান নিশ্চয়ই তীরের কাছাকাছি। ওকে সারাদিন ধরে আমার ব্যালকনিতে দাঁড়ালে জলের নিতে দেখা যেত। অতএব এই সুতোটা ছিঁড়ুক তা আমি চাই না।

মাছটা এতক্ষণ স্থির ছিল, এবার চলতে শুরু করল। পাগলের মত ঘুরতে লাগল ওটা। ওর ঘোরার টানে সুতো জড়িয়ে যাচ্ছে আমার শরীরে। মোটর বোটটাকে মাঝখানে রেখে ও একের পর এক পাক দিয়ে চলেছে আর প্রতিবারই সুতোয় টান পড়ছে। আমার হাত কোমর বুক এখন সুতোর বাঁধনে। ক্রমশ বৃত্ত ছোট হয়ে আসছে। ছিপ এবং তার হুইল এখন কার্যত অকেজো। আমি নিজেই এখন হুইল হয়ে গেছি।

মাঝে কিছুক্ষণের জন্যে মাছটার অদ্ভুত পাগলামি থেমেছিল। ডান হাতটা কোন মতে আলগা করে বর্শাটাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম আর একটু কাছে এলে আমি ছুঁড়ে মারব। প্রতিশোধ নেবার এমন চমৎকার সুযোগ আর আসবে না। মতলবটা বুঝতে পেরেই হয়তো মাছটা আবার পাক খাওয়া শুরু করল। করুক। এতে ও আরও কাছাকাছি আসতে বাধ্য হবে। ঝিমুনি লাগছে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে

মাথা ঘুরে গেল। সমস্ত শরীরে যেন ঝিঁঝি লেগেছে। হঠাৎ খেয়াল হল সূর্য ঢলছে। মাথার ওপর রোদ নেই। জলে অপূর্ব এক আলো। আকাশে রঙের ধুন্ধুমার কাণ্ড। আমার সর্বাঙ্গ এখন দড়িতে ঠাসা। আর মাছটা চলে এসেছে আমার বোটের কাছে। মুখ বাড়ালাম। জলের নিচে একটা গভীর ছায়াকে স্থির হয়ে থাকতে দেখলাম। বর্শাটা—। হায় আমি হাত নাড়তে পারছি না। সুতোর বাঁধন খোলার মত শক্তি অবশিষ্ট নেই আমার। এই সময় ও যদি আবার ছুটতে শুরু করে তাহলে তার টানে জলে পড়ে যাব আমি।

মৃত্যু অবধারিত। মাছটাকে মারতে এসে নিজেই মরে যাচ্ছি। আমি কোনমতে আকাশে চোখ রাখলাম। পৃথিবীর আকাশগুলো চিরকাল একই রকম থাকে ? মাঠ, গাছ, অথবা জল সব ঠিকঠাক। যে ভাবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, আমার পিতামহ দেখে গেছেন সেইভাবেই আমি দেখলাম আর আমার পরে মানুষেরা দেখে যাবে ? এসব ঠিক ঠাক থাকবে শুধু মানুষ পাল্টে যাবে। তবু মানুষের কি অহঙ্কার তার জীবন নিয়ে।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। আমার পিতার মুখ, পিতামহের মুখ এখন বন্ধ চোখের পাতায়। তাঁরা কি সুখী মানুষ ছিলেন ? তাঁদের যদি দুঃখ থাকে তাহলে সেটা কি ধরণের দুঃখ ছিল ? এই ধরণটুকু বদলে যায় এক এক প্রজন্মে, কিন্তু মূলের হেরফের হয় সামান্য। আমরা কেউ কারো ধরণ বুঝতে পারি না।

এখন একটা মৃদু টান আর আমি বোট থেকে জলে পড়ে যাব। সেই টানটুকুর জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি চোখ খুললাম। যে কন্যাসুন্দর আলো এতক্ষণ এই সমুদ্রে ছড়িয়ে ছিল তা উধাও। সূর্য অন্য কোন পৃথিবীতে চলে গেছে। ছায়া আরও ঘন হয়ে জলে মিশে যাচ্ছে। হঠাৎ জলের নিচে একটা শব্দ হল। সুতোটা কাঁপল মাত্র। কোন মতে চোখ মেললাম। ঘন ছায়ার জন্যে জলের নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু একি ? জলের ওপরে লাল রঙ ফুটে উঠল। রক্ত ? চাপ চাপ রক্ত উঠে আসছে। এক একবার সেই শব্দটা বাজছে আর রক্তের বুদবুদ ওপরে উঠছে। বুঝতে সময় লাগল, আমার সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত মাছটা এখন আক্রান্ত। আরও কোন বড় প্রাণীর এক একটা আঘাতে সে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। যে বিশাল মাছটা আমার বঁড়শি খেয়েছিল সে তার চেয়ে অনেক বড় প্রাণীর কাছে অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করছে। শেষ পর্যন্ত রক্ত মাখা জল সরে গেল আমার সামনে থেকে। আক্রমণকারী হঠাৎই জলের কাছাকাছি এসে শরীর নেড়ে একেবারে মিলিয়ে গেল। সেই এক পলকেই তাকে চিনে গেলাম আমি। সেই ছায়া। এতক্ষণ, এই গোটা দিন, এক জীবনের মত দীর্ঘ দিন, যাকে আমি বঁড়শিতে গেঁথে সুতো ছেড়ে গিয়েছি, যার সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে নিঃশেষ করেছি সে আমার আকাঙ্ক্ষিত শত্রু ছিল না। ভুল, একটা ভুল নিয়ে সব শক্তি খরচ করে গিয়েছি আমি। আর সে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে। তার অসীম শক্তির নিদর্শন দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত আমার শিকারকে নিঃশেষ করে আমাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেল।

সুতো ধরে টানলাম। একটুও শক্তির দরকার হল না। আমি নড়ে বসতেই সুতোটা জল থেকে উঠে এল। বঁড়শি নেই। মাছটাও।

কোন মতে হাত শরীর থেকে বাঁধন খুলতে পারলাম। সুতোর ছেঁড়া মুখই সেটা করতে সাহায্য করল। তার পর নৌকোর মধ্যে শরীর এলিয়ে দিলাম। ঈষৎ ঢেউ-এ আমার মোটর বোট ভাসছে। মাথার ওপর একটা দুটো করে অনেক অনেক নক্ষত্র ফুটে উঠল আর সমুদ্রের ওপর লাফ দিয়ে উঠে বসল এক থালা চাঁদ। এরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

এখন আমি কোথায় তা জানি না। এই সমুদ্রের কোন্ প্রান্তে আমার বাস তা এখন জানা সম্ভব নয়। আমার নাম, আমার লেখা, এই আমি এখন অর্থহীন। হাত বাড়িয়ে জলের বোতল তুলে এক ঢোঁক খেলাম। আঃ কি আরাম। মোটর বোটের ইঞ্জিনে হাত রাখলাম। কী ঠাণ্ডা। সব শক্তি একত্রিত করে ফিতেটা ধরে টান দিলাম। শব্দ হল। আঃ, কি মধুর শব্দ। দ্বিতীয়বারে ইঞ্জিন গর্জে উঠল, প্রাণ এল মোটর বোটে। বোট চলছে। আমি কোন্ দিকে চলেছি জানি না। শুধু জানি তেল ফুরিয়ে যাওয়ার আগে, ইঞ্জিন গরম হয়ে ওঠার আগে আমাকে ছুটে যেতে হবে। পৃথিবীর সব পথ সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে এই ভাবে যেতে যেতে কোন মায়াবীর আরশিতে হয়তো দেখা হবে এক রূপসীর সঙ্গে, ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মত কালো। হয়তো রাত নামবে, নক্ষত্ররা ঝরে যাবে, এই শরীর ভেসে ভেসে যাবে অথৈ ঢেউ-এ। কিন্তু একটা স্বপ্ন থেকে যাবে, মিশে থাকবে এই পৃথিবীর শিরায় শিরায়। তাকে বুকে নিয়ে থাকা ছাড়া পৃথিবীটা অর্থহীন হয়ে যাবে।